ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয়

প্রথম খণ্ড

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

দশীয় ওলে সৈতে ৰক যুব আৰু পিচফালে ক তেওঁৰ গাড়ীখন আধুনিক ভাৰতৰ কৃষিৰ প্ৰতীক

[Frank Shuman ৰ সৌজন্যত

ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয়

প্রথম খণ্ড : সাধারণ বিষয়

এল. এস. এস. কুমার
ডীন, সরকারী কৃষি কলেজ, কেরালা

লেঃ কঃ এ. সি. আগরওয়ালা
অধ্যক্ষ (অবসরপ্রাপ্ত), পশু চিকিৎসা কলেজ, রাজস্থান

ডঃ এইচ. আর. আরাকেরি
কৃষি মুখ্য-অধিকর্তা, মহীশূর সরকার

এম. জি. কামাথ
উৎপাদন বিশারদ, খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়, নূতন দিল্লী

বনবিহারী চক্রবর্তী
জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

ডঃ আর্ল. এল. মুর
হাঁস-মুরগী পালন বিষয়ক উপদেষ্টা, কানসাস রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়
ইউ. এস. এ. আই. ডি.'র ভারতস্থ সহযোগী

ডঃ রয়. এল. ডোনাহু
মৃত্তিকা ও সার বিষয়ক পরামর্শদাতা, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, নূতন দিল্লী
প্রাক্তন মৃত্তিকা উপদেষ্টা, কানসাস রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়—ইউ. এস. এ.
আই ডি'র ভারতস্থ সহযোগী

প্রকাশক :

অরুণকুমার পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মূল্য ৫·০০

মুদ্রাকর :

সমীর বসু
হরিহর প্রেস
৯৩।২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

Published by :
SRIBHUMI PUBLISHING CO.
79, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9

This book is a translation of the English book AGRICULTURE IN INDIA, VOL. I (GENERAL) *written by L. S. S. Kumar, Lt.-Col. A. C Aggarwala, Dr. H. R. Arakeri, M. G. Kamath and Dr. Earl N. Moore in collaboration with Dr. Roy L. Donahue and published by Asia Publishing House, Bombay.*

মুখবন্ধ

ভারতে যেখানে কৃষিই কোটি কোটি জনগণের জীবিকার প্রধান অবলম্বন, সেখানে কৃষির প্রচণ্ড সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা খুবই সুখের বিষয়। বিভিন্ন বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক লিখিত এই পুস্তকের খুবই প্রয়োজন ছিল।

বহুমুখী বিদ্যালয়গুলিতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে। উদ্ভিদের গঠন ও তাহার কার্য এবং সাধারণভাবে কৃষি রসায়নতত্ত্ব ছাড়া ভারতের বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের মৃত্তিকা ও ফসল সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কেও এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। গো-মহিষাদি, মেষ ও ছাগল, হাঁস-মুরগী, মাছ, মক্ষিকা-পালন, বন ও বন্য প্রাণী সম্পর্কেও এই পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে।

ভারতে জমির উপর যথেষ্ট চাপ থাকা সত্ত্বেও জমির প্রধান চাহিদাগুলি মিটাইয়া কৃষির আশানুরূপ উন্নতি করা যায়। চাহিদাগুলি হইল : (১) পর্যাপ্ত সেচজল সরবরাহ, (২) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, (৩) জমিতে যথাযথ সার প্রয়োগ, (৪) জোত একত্রীকরণ।

দেশে পর পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমূহ রূপায়ণের ফলে ভারতের কৃষি সম্পর্কে প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি বৎসর ভারতের কৃষকগণ জমি হইতে ৮০ লক্ষ টন বৃক্ষখাদ্য অপসারণ করে, কিন্তু মাত্র ২০ লক্ষ টন জমিকে ফিরাইয়া দেয়। জমির উর্বরতা বজায় রাখিতে হইলে ৬০ লক্ষ টনের এই ফাঁক পূরণ করিতে হইবে।

পরিমিত সার প্রয়োগ ও সবুজ সারের চাষ করিয়া ভারতের যে কোন প্রকার জমির উন্নতি সাধন করা যায়। খাদ্য ও অর্থকরী ফসল উৎপাদনে সারের ভূমিকা সম্পর্কে ভারতের প্রায় সকল কৃষকই অবহিত। সারের চাহিদা অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় স্থির করা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে

৩,৬০,০০০ টনের স্থলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১০,০০,০০০ টন নাইট্রোজেন (N) ৬৭,০০০ টনের স্থলে ৪,০০,১০০ টন ফসফেট P_2O_5 ও ২,০০,০০০ K_2O টন পটাশ (K_2O) ব্যবহার করা হইবে।

পৃথিবীর যে কোন বৃহৎ দেশ অপেক্ষা জল বেশি থাকা সত্ত্বেও ভারতে জলের ঘাটতি একটি সমস্যা বিশেষ। অপ্রচুর সেচ ব্যবস্থাই এজন্য দায়ী। নদী দিয়া যে পরিমাণ জল প্রবাহিত হয় তাহার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সাম্প্রতিক কালে এই জল ক্ষেতে ব্যবহার করার কাজে যথেষ্ট অগ্রগতি হইলেও ইহার আরও উন্নতির অবকাশ আছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ভারতের নদীসমূহের মধ্য দিয়া যে পরিমাণ জল প্রতি বৎসর প্রবাহিত হয় তাহা ভারতের উপর সমভাবে বিস্তৃত করিয়া দিলে সমগ্র দেশ ২০ ইঞ্চি জলের নিচে ডুবিয়া থাকিবে।

ব্যাপকভাবে লিখিত এই অতি প্রয়োজনীয় পুস্তকটির মুখবন্ধ লিখিয়া দিতে আমি অতিশয় আনন্দ বোধ করিতেছি। আমি আশা করি শিক্ষক ও ছাত্রগণ ছাড়া সাধারণ কৃষকগণও এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সবিশেষ উপকৃত হইবেন।

পি. এস. দেশমুখ
ভারত সরকারের প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী
ও
ভারত কৃষক সমাজের সভাপতি

নূতন দিল্লী
১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০

কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন, ভারতীয় ও মার্কিন গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই পুস্তক প্রণয়নে নানা ভাবে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন :

শ্রীভাস দেব, প্রাক্তন আণ্ডার সেক্রেটারী, ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ, নূতন দিল্লী ; শ্রী জে. পি. এল. গুহ, আই. সি. এস., কৃষি সচিব, অন্ধ্র প্রদেশ ; ডঃ জর্জ মণ্টগোমারী, দলপতি, কানসাস রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়-ইউ. এস. এ. আই. ডি.-ভারত দল, নূতন দিল্লী ; শ্রী জে. রঘোথম রেড্ডি, কৃষক, বিধান পরিষদের সভ্য, অন্ধ্র প্রদেশ কৃষক সমাজের সহ সভাপতি, হায়দারাবাদ ; ডঃ ই. আর. টাউয়ার্স, প্রাক্তন দল নায়ক, মাধ্যমিক শিক্ষা সূচী, ওহিও রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়—ইউ. এস. এ. আই. ডি.—ভারত দল, নূতন দিল্লী ; মেরিল. কে. লুথার, উক্ত দলের কৃষি শিক্ষা বিশারদ ; শ্রী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষি উপ অধিকর্তা, পূর্ব অঞ্চল, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ ; এবং কেরালা রাজ্যের ট্রিবান্দ্রাম কৃষি কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ টি. সি. জোসেপ ; উদ্ভিদ শারীরবৃত্তি বিশারদ শ্রী এম. রমানাথ মেনন ও কীটতত্ত্বের লেকচারার শ্রী রেঙ্গা আয়ার।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অধিকার ও মহীশূর সরকার তাঁহাদের দুইজন কর্মচারীকে এই পুস্তক প্রণয়নে অংশ গ্রহণে অনুমতি দিয়াছেন ; এজন্য গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ভারতে কারিগরি সহযোগিতা মিশনের নিম্নলিখিত উপদেষ্টাগণ মূল গ্রন্থের অংশ বিশেষ সযত্নে পরীক্ষা করিয়া গ্রন্থকারগণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন : ডাঃ ই. হিক্সন, প্রাক্তন কৃষিশিক্ষা উপদেষ্টা ; আরমিন আর. গ্রুনওয়াল্ড,

প্রাক্তন মৃত্তিকা উপদেষ্টা; ডঃ. এল. এম. হাম্ফে্, চাষ-বিষয়ক উপদেষ্টা; ডব্লিউ. এস. স্পীয়ার, প্রাক্তন মৃত্তিকা সংরক্ষণ উপদেষ্টা; রবার্ট এইচ. ইঙ্গল্, প্রাক্তন সার উপদেষ্টা; ডা. গুলবার্ট. আর. মুহর, মৃত্তিকা পরীক্ষা উপদেষ্টা; এম. এইচ. টেইলর, মৃত্তিকা সংরক্ষণ উপদেষ্টা ও জর্জ নেইরিম, কৃষি সম্প্রসারণ উপদেষ্টা। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও মূলগ্রন্থের কোন কোন অধ্যায় দেখিয়া দিয়া গ্রন্থকারগণকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন: সৈয়দ এস. হাসমী, অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষি উপ-সচিব; ডাঃ কে. সি. নাইক, ভারতীয় কৃষি শিক্ষা পরিষদের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও শ্রী রায় পৃথ্বিরাজ, অন্ধ্র প্রদেশের প্রাক্তন কৃষি অধিকর্তা।

গ্রন্থকারবৃন্দ

সূচীপত্র

চিত্র তালিকা

চিত্র		পৃষ্ঠা

চিত্র | পৃষ্ঠা

ফটো নং ১।

মাদ্রাজ রাজ্যে কোন জেলা পরিষদের সভাপতি। তাঁহার পেয়ারা বাগানের জন্য তিনি গর্ববোধ করেন এবং জেলার নির্বাচিত কৃষক প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে পরিয়া সুখী। গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা-রূপে পঞ্চায়েত গ্রামীণ ভারতে ক্রমশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

ফটো নং ২।

ভূমি সংস্কার আইন সমূহের ফলে কৃষক পরিবারে অধিকতর নিরাপত্তা আসিয়াছে· এই শিশুর হাসিতে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ফটো নং ৩।

যখন কোন পুণ্য দিবস উপলক্ষে গ্রামবাসীগণ সমবেত হন তখনই পারস্পরিক সুবিধার্থে কৃষি সমবায় গঠন তাঁহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক।
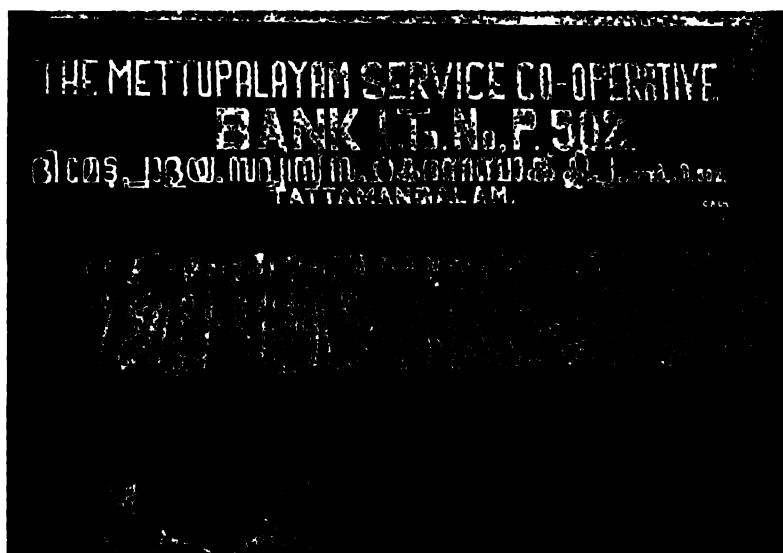
ফটো নং ৪।

উৎপাদনমূলক কাজের জন্য শাখা হতে কৃষকদিগকে ঋণ দানের জন্য একটি ঋণদান সমবায় গঠন

প্রথম অধ্যায়

গ্রামীণ সংস্থা—পঞ্চায়েত (Rural organisation—the Panchayat)

বহু বৎসর পূর্বে, ভারতের গ্রামবাসীদের নিজেদের শাসন-সংস্থা ছিল। ইহার নাম ছিল গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম-সভা (গ্রামীণ সংস্থা)। গ্রামবাসিগণই পঞ্চায়েতের কার্যকরী সমিতির সদস্যদের নির্বাচন করিতেন। সমগ্র গ্রামের উন্নয়নের প্রতি পঞ্চায়েত লক্ষ্য রাখিত। রাস্তা নির্মাণ, বিদ্যালয় পরিচালনা, আক্রমণকারীর কবল হইতে গ্রামকে রক্ষা করা প্রভৃতি বহুবিধ কাজ পঞ্চায়েতের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রামবাসিগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের উপর ইহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইত। কর আদায় ও বিবাদ মীমাংসার ক্ষমতাও পঞ্চায়েতের ছিল। নিরপেক্ষতা, বিচক্ষণতা ও তৎপরতার জন্য পঞ্চায়েতের প্রতি গ্রামের সকলেরই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অটুট ছিল।

বৈদিক যুগ হইতে ভারতবর্ষে এই গ্রামীণ সংস্থার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু কালক্রমে ইহার গুরুত্ব কমিতে থাকে। বৃটিশ রাজত্বে যখন কেন্দ্রীয় শাসন-সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন পঞ্চায়েতের অধিকার ও ক্ষমতা ধীরে ধীরে লোপ পাইল।

জনসাধারণের জন্য পঞ্চায়েতের সমাজকল্যাণমূলক কার্যাদি স্মরণ করিয়া পরবর্তী কালে ইহার পুনঃস্থাপনের প্রচেষ্টা চলে—কিন্তু বিশেষ কোন সাফল্য-লাভ ঘটে না। ১৯৩৫ সালে বিভিন্ন প্রদেশে গ্রাম পঞ্চায়েত আইন পাস হয় এবং ১৯৪৬ সালে পঞ্চায়েত পুনর্গঠনের জন্য নূতন আইন প্রণীত হয়। এভাবে গুরুত্ব ও উৎসাহ দেওয়ার ফলে পুনরায় ধীরে ধীরে পঞ্চায়েতসমূহ গঠিত হইতে থাকে এবং বর্তমানে আমাদের দেশে ৪৯৫,০০০ গ্রামকে লইয়া ১১৭,০০০ টির অধিক পঞ্চায়েত আছে। সমগ্র দেশে যখন এই সংস্থা গড়িয়া উঠিবে তখন আমাদের দেশে প্রায় ২০০,০০০ পঞ্চায়েত গঠিত হইবে।

পঞ্চায়েত সংগঠন (Panchayat System)

পঞ্চায়েত গ্রামে একটি স্বায়ত্তশাসন সংস্থা। সাধারণত গ্রামের (বা কয়েকটি গ্রামের) সকল প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিকে লইয়া গ্রামসভা গঠিত হয়। পঞ্চায়েতের কার্যকরী সংস্থার সদস্যগণ এই সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। এই সভা একজন প্রধান ও একজন উপ-প্রধানকেও নির্বাচন করেন। কয়েকটি রাজ্যে এই দুইজন সদস্য পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং পঞ্চায়েত গ্রামসভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়। গ্রামসভা অর্থাৎ গ্রামের সাধারণ সভ্যগণ বৎসরে এক বা দুইবার একত্র মিলিত হন এবং পঞ্চায়েতের কার্যাবলী তদারক করেন।

কোন কোন রাজ্যে পঞ্চায়েত গঠন-প্রণালী ভিন্নরূপ। পশ্চিমবঙ্গে ১৫০ হইতে ২২০০ লোকসংখ্যা লইয়া একটি গ্রামসভা গঠিত হয়। অঞ্চলের জনসংখ্যা ১০০০ হইতে ১০,০০০ পর্যন্ত হইতে পারে। বিহারে গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক গ্রামবাসীকে লইয়া পঞ্চায়েত গঠিত হয়। এই পঞ্চায়েত একজন মুখ্য (প্রধান) নির্বাচন করেন এবং তিনি নিজের কার্যকরী সমিতির সদস্যদের বাছিয়া ল'ন। আসামে আবার পঞ্চায়েত দুই প্রকার : প্রাথমিক (primary) ও গ্রামীণ (rural)। গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে লইয়া প্রাথমিক পঞ্চায়েত গঠিত হয় এবং তাঁহারা কার্যকরী সমিতির সদস্যদের নির্বাচন করেন। গ্রামীণ পঞ্চায়েত প্রাথমিক পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক গঠিত হয় এবং এ সকল প্রতিনিধি প্রাথমিক পঞ্চায়েতের ২০০জন সভ্য প্রতি একজন করিয়া নির্বাচিত হন। গ্রামীণ পঞ্চায়েতের নির্দেশ অনুসারে প্রাথমিক পঞ্চায়েত কাজ করে।

পঞ্চায়েতের সদস্যসংখ্যাও বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার। ইহা সাধারণত স্থানীয় জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। আবার একটি পঞ্চায়েতের সদস্য-সংখ্যারও সীমা নির্দিষ্ট থাকে। পাঞ্জাবে এই সদস্যসংখ্যা পাঁচ হইতে নয়জন পর্যন্ত হইতে পারে। আবার উত্তর প্রদেশে এই সদস্যসংখ্যা পনর হইতে ত্রিশ পর্যন্ত হইতে পারে, পশ্চিমবঙ্গে এই সদস্যসংখ্যা ন্যূনপক্ষে নয় হইতে অনধিক পনর পর্যন্ত হইতে পারে। পঞ্চায়েত সদস্যদের ন্যূনতম বয়স মধ্যপ্রদেশে পঁচিশ, অন্যান্য রাজ্যে একুশ।

সচরাচর প্রতি তিন বৎসর অন্তর নূতন পঞ্চায়েত গঠিত হয়।

পঞ্চায়েত আইন অনুসারে সরকার কোন্ গ্রাম বা গ্রামসমূহকে লইয়া প্রত্যেক পঞ্চায়েত গঠিত হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেন। অনুরূপভাবে রাজ্য সরকার প্রত্যেক পঞ্চায়েতের জনসংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেন। মাদ্রাজে এই সংখ্যা পাঁচশ এবং আসামে ইহা পঁচিশ হাজার।

পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েতসমূহ নানাপ্রকার সমাজকল্যাণমূলক কাজ করিতে পারে। জনস্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রক্ষণ, গ্রাম প্রতিরক্ষা প্রভৃতি পঞ্চায়েতের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। গ্রামবাসীর শিক্ষা ও মনোরঞ্জন, গ্রামের রাস্তা, পুকুর, কূপ ও বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, বন্যার্ত ও দরিদ্রের ত্রাণ ব্যবস্থা, পশুপালন ও কৃষির উন্নতি, কুটির শিল্পের প্রসার ও সমবায় সমিতি স্থাপন প্রভৃতি কাজও পঞ্চায়েত গ্রহণ করিতে পারে।

পঞ্চায়েত ও রাজ্য সরকার

(Panchayat and the State Government)

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়ণে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পঞ্চায়েত এক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল কাজ করিবার জন্য পঞ্চায়েতের অর্থের প্রয়োজন। এইজন্য পঞ্চায়েতকে ব্যবসা, সম্পত্তি ও ব্যক্তির উপর করধার্যের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। অধিকাংশ রাজ্যে সম্পত্তি, রাজস্ব, জীবিকা, গৃহপালিত পশু ও যানবাহনের উপর পঞ্চায়েত কর ধার্য করে। এই করের হার ও শর্ত রাজ্য সরকার স্থির করিয়া দেন। কোন কোন রাজ্যে জনসাধারণের কাজের জন্য পঞ্চায়েত গ্রামবাসীদের বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারে। প্রয়োজন হইলে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাইবার জন্য সরকার পঞ্চায়েতকে অর্থ-সাহায্য করিয়া থাকেন।

রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতের কার্যাবলী তদারক করিয়া থাকেন। এই জন্য সরকারের পৃথক কর্মচারী থাকে। একজন বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেক্রেটারী বা সম্পাদক প্রতি পঞ্চায়েতের সহিত যুক্ত থাকেন। পঞ্চায়েতগুলি যাহাতে অর্থ বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে না পারে তৎপ্রতি সরকার

সর্বদা লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের সুষ্ঠু পরিচালনায় উৎসাহ প্রদান করেন এবং তাহাদের উন্নয়নে সাহায্য করেন।

পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ

(Panchayat Samitis and Zilla Parishads)

গ্রামীণ সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে হইলে গ্রাম পঞ্চায়েতকে তাহার এলাকার মধ্যে সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র প্রদেশ ও রাজস্থান রাজ্যে এইপ্রকার কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। এই সকল রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে লইয়া **পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ** গঠিত হইয়াছে বা হইতেছে। প্রত্যেক উন্নয়ন সংস্থায় (Development Block) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এ সংস্থাকে আঞ্চলিক পরিষদ বলে। পঞ্চায়েত সংগঠনের জেলা পর্যায়ের সংস্থাকে বলা হয় জেলা পরিষদ।

আদায়ীকৃত কর গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় এবং নিজ নিজ এলাকায় সকলপ্রকার উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব তাহাদের উপর ন্যস্ত থাকে। এ সকল এলাকায় উন্নয়ন সংস্থা পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নির্দেশ অনুসারে কাজ করে। অনুরূপ সংগঠনের জন্য ১৯৬১ সালের মধ্যে মাদ্রাজ, মহীশূর, আসাম ও উড়িষ্যা রাজ্যে আইন প্রণীত হইয়াছে এবং অন্যান্য রাজ্যসমূহেও শীঘ্রই অনুরূপ আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হইতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত বা অনুরূপ গ্রাম-শাসন সংস্থার অস্তিত্ব ছিল। ইহার হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছিল এবং ইহা গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিত।

বৈদেশিক শাসনকালে পঞ্চায়েতের গুরুত্ব ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যায়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে জনসাধারণ যাহাতে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে

অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সেইজন্য সমগ্র দেশে পঞ্চায়েতকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা চলিতেছে। গ্রাম উন্নয়নে যাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেন। সম্প্রতি পঞ্চায়েতসমূহকে লইয়া পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ গঠনের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

প্রশ্ন

১। পঞ্চায়েতকে গ্রাম শাসন-সংস্থা বলা হয় কেন?

২। তোমার গ্রাম-পঞ্চায়েত কি কি প্রকারে গ্রামবাসীদের সাহায্য করে?

৩। রাজ্য সরকার কিভাবে পঞ্চায়েতকে উহার কাজে সহায়তা করে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমি-সংস্কার (Land Reforms)

ভূমিই আমাদের দেশের জনসাধারণের প্রধান সম্বল। দেশের জনসংখ্যার শতকরা সত্তরজন উপার্জনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে জমির উপর নির্ভরশীল। এজন্য কৃষির উন্নতি বলিতে অনেকটা দেশের উন্নতিকেই বুঝায়।

কৃষক জমি হইতে সম্পদ আহরণ করে। যে জমি সে চাষ করে তাহার উন্নয়নের সুযোগ ও সুবিধা তাহার থাকা প্রয়োজন। তবেই কৃষি অগ্রগতি লাভ করিবে এবং ফলন বৃদ্ধি পাইবে।

জমির মালিকানা ব্যবস্থা কৃষির উন্নতির সহিত বিশেষভাবে জড়িত। কাজেই কৃষক নিজেই জমির মালিক না রায়ত, যদি রায়ত হয় কি শর্তে সে জমি চাষ করে, জমির পরিমাণ এবং সেই জমি একত্রীভূত না বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছে প্রভৃতি বিষয়ের উপর কৃষির অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভরশীল।

জমির মালিকানা (Land Ownership)

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের ভূমি-ব্যবস্থা মোটেই কৃষকের অনুকূলে ছিল না। গ্রামবাসীদের শতকরা চারি ভাগ ছিল জমিদার—এদেরই দখলে ছিল অর্ধেক জমি। গ্রামবাসীদের শতকরা ৭৫ জনের দখলে ছিল সমগ্র জমির শতকরা ১৬ ভাগ মাত্র। বহু গ্রামবাসীর কোন জমি ছিল না। তাহারা রায়ত বা কৃষি-শ্রমিক রূপে কাজ করিত।

তৎকালীন প্রচলিত ভূমি-ব্যবস্থায় সমস্ত জমি রাষ্ট্রের মালিকানায় ছিল এবং যাহারা জমি চাষ করিত তাহাদের নিকট হইতে রাষ্ট্র রাজস্ব আদায় করিত।

বৃটিশ রাজত্বে সরকার কৃষকের নিকট হইতে ব্যক্তিগত রাজস্ব আদায় করিতে অসুবিধা বোধ করায় সরকারের তরফে রাজস্ব আদায়ের জন্য

এক শ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। এই সকল প্রতিনিধিদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা থাকিত এবং তাহারা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সরকারকে দিতে বাধ্য থাকিত। ইহাই জমিদারী প্রথা নামে পরিচিত হইল।

ইহা ছাড়া রায়তওয়ারী প্রথা ছিল। এই প্রথায় সরকার রায়তদের (কৃষক) নিকট হইতে সরাসরি খাজনা আদায় করিত।

ক্রমে ক্রমে উভয় ব্যবস্থাতেই দর-পত্তনি (sub-letting) চলিতে লাগিল। যদিও সরকার তাহার প্রতিনিধিদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট হারে খাজনা আদায় করিত, কিন্তু প্রতিনিধিগণ পত্তনিদারদের নিকট হইতে খাজনার পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়াইয়াই চলিল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি সম্প্রসারিত হইল, জমির দামও বাড়িতে লাগিল এবং সরকারের প্রতিনিধিগণ তাহাদের নিম্নস্বত্বভোগীদের খাজনা ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিল। কোন কোন এলাকায় জমির মোট উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য খাজনা হিসাবে আদায় করা হইত। জমিদারগণ এই অর্থের সামান্যতম অংশও জমির উন্নয়নে ব্যয় করিত না।

এই ব্যবস্থায় জমিদারগণ ধনশালী হইতে লাগিল—কৃষক দরিদ্রই রহিল। কৃষক তাহার শ্রম দ্বারা উৎপন্ন ফসলের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র পাইত। ইহা ছাড়া কৃষকের ভূমিস্বত্বের কোন নিরাপত্তা ছিল না। জমিদার যে কোন সময়ে তাহাকে উচ্ছেদ করিয়া সেই জমিতে অন্য কৃষক নিয়োগ করিতে পারিত। এরূপ অবস্থায় জমির প্রতি কৃষকের মমতা খুব কমই থাকে। কৃষকের অবস্থা যত খারাপ হইতে লাগিল জমির ফলনও তত কমিতে লাগিল।

ইহা ছাড়া ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকও ছিল। ১৯৪৭ সালে সমগ্র দেশে তাহাদের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি। বৎসরে ছয় মাস তাহারা কোন কাজ পাইত না। বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইত।

জাতীয় ভূমি-সংস্কার পরিকল্পনা
(The National Land Reform Plan)

কৃষকগণ যাহাতে জমির স্থায়ী মালিকানা পায় এবং জমিদার কর্তৃক ধার্য রাজস্বের হার যাহাতে আয়ত্তে রাখা যায় তজ্জন্য বিভিন্ন সময়ে কোন কোন

অঞ্চলে ভূমি-সংস্কার আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু মাত্র ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে ভারতে ব্যাপকভাবে প্রজাস্বত্ব আইন (tenancy legislation) প্রণয়ন আরম্ভ হয়। ১৯৫০-৫১ সালে যে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাহাতে বলা হয় যে ভূমি-ব্যবস্থা এইভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে যাহাতে কৃষক তাহার শ্রমের ফসল নিজেই ভোগ করিতে পারে এবং জমির উন্নয়নে অর্থনিয়োগ করিতে পারে। ইহার ফলে ভূমি সম্পদের আকর হইয়া উঠিবে এবং সমগ্র দেশ সম্পদশালী হইবে।

এই পরিকল্পনায় ভূমি-সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা হয় :

১। ভূমিরাজস্ব আদায়কারী প্রতিনিধিদের (জমিদার) বিলোপ সাধন।

২। রাজস্বের হার হ্রাস, কৃষকদিগকে জমিতে স্থায়ী স্বত্ব প্রদান, বা ন্যায্য মূল্যের বিনিময়ে তাহাদিগকে জমির মালিকানা প্রদান।

৩। একজন ব্যক্তির কত জমি থাকিতে পারে তাহার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ এবং উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন।

৪। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত জমিগুলি একত্রকরণ এবং জমির পুনর্খণ্ডন নিবারণ।

৫। সমবায় চাষ ও সমবায় গ্রাম পরিচালনার উন্নয়ন।

ভূমি-সংস্কারের ফলাফল (Results of Land Reform)

সরকার ও কৃষকের মধ্যবর্তী রাজস্ব-আদায়কারী প্রতিনিধি বর্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সরকার সরাসরি কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করেন। বহু পতিত জমি ও গোচারণভূমি সরকার বা পঞ্চায়েতের হাতে আসিয়াছে। বহু রাজ্যে বর্তমানে জমিদারগণ সীমিত পরিমাণ জমি মাত্র ব্যক্তিগত চাষের অধীনে রাখিতে পারে এবং তাও, নিজে যদি চাষের তদারক করে বা সেই গ্রামে বা পার্শ্ববর্তী গ্রামে বাস করে বা জমি কর্ষণে ব্যক্তিগত শ্রম দান করে তবেই তাহা রাখিতে পারিবে।

বহু রাজ্যে রাজস্বের উচ্চ হার কমাইয়া উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ বা তারও নিম্ন হার ধার্য হইয়াছে।

কয়েকটি রাজ্যে আইনবলে জমিতে কৃষকের পূর্ণ স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

ফটো নং ৫।
পশু রোগ প্রতিরোধকল্পে ও অসুস্থ পশু চিকিৎসার জন্য কৃষকগণ পশু চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন।

ফটো নং ৬।
গৃহপালিত পশু ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় কৃষি তথ্য প্রচারে গ্রামসেবক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ফটো নং ৭।
মৃত্তিকা ক্ষয়রোধকল্পে খাতের আড়াআড়ি শিলা ও মাটি দ্বারা বাঁধ তৈয়ারি, একটি খামার স্থাপন ও পার্শ্ববর্তী জমি সমূহের উর্বরতা বৃদ্ধিতে এই মৃত্তিকা সংরক্ষণ আধিকারিক কৃষককে সাহায্য করিতেছেন।
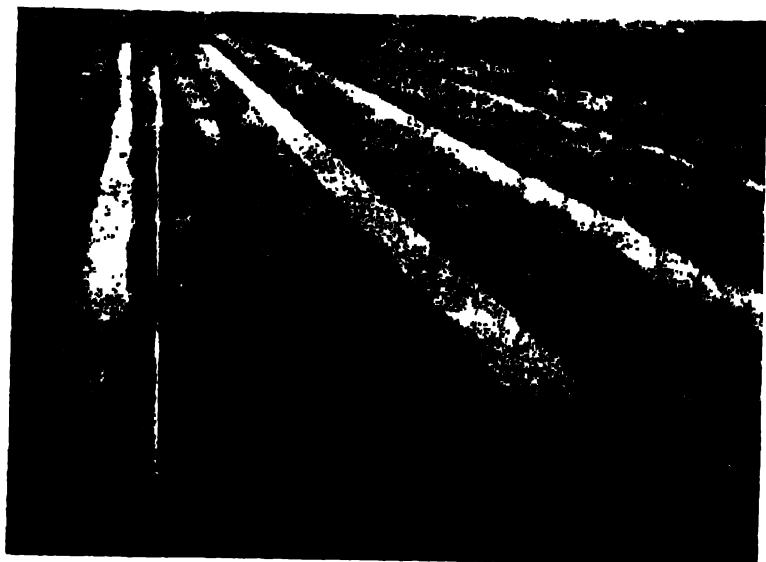
ফটো নং ৮।
বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিবিভাগগুলি কৃষকদের জন্য ফসলের নূতন উচ্চ উৎপাদনশীল জাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করিয়া থাকেন। এ উদ্দেশ্যে স্থাপিত একটি ধান্য কেন্দ্র ফটোতে দেখান হইয়াছে।

ফটো নং ৯।

খাদি বস্ত্রের জন্য সূতা কাটা (এখানে দেখান হইয়াছে) সূচীবিদ্যা, রন্ধনবিদ্যা, উনুন তৈয়ারীর উন্নত পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে গ্রামসেবিকাগণ গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা দেন।
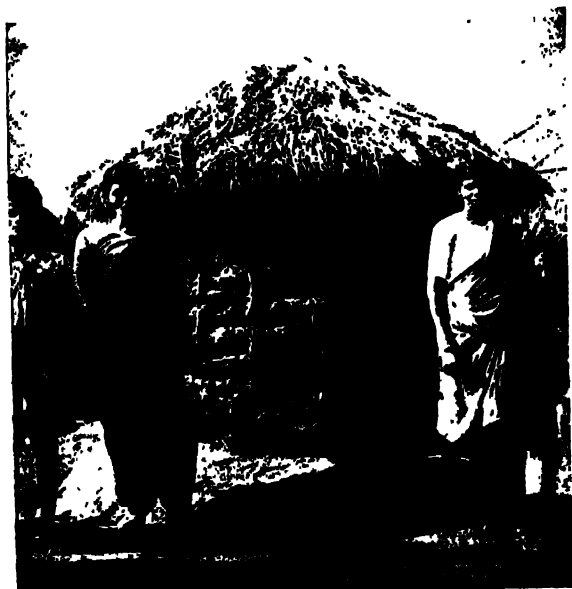
ফটো নং ১০।

ধান কাটার সময়েই তাহা বিক্রয় করা হইবে, না সাময়িকভাবে মরাইতে (ফটোতে দেখান হইয়াছে) ধান রাখিয়া পরে দাম বাড়িলে তাহা বিক্রয় করা হইবে তাহা কৃষককে স্থির করিতে হইবে।

ফটো নং ১১।

ভুট্টার চাষ করা হইবে স্থির করার পর দেশী বীজ (বামে) অথবা সংকর বীজ (ডাইনে) রোপণ করা হইবে তাহা কৃষককে স্থির করিতে হইবে [FRANK SHUMAN মহাশয়ের সৌজন্যে]।

ফটো নং ১২। পরিমিত পরিমাণে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার প্রয়োগ একর প্রতি ফলন ও কৃষি হইতে আয় বৃদ্ধির অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায়। বামে—সার হিসাবে একর প্রতি ২০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন

বহু রাজ্যে সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত ন্যায্য মূল্যের বিনিময়ে কৃষক জমির মালিক হইতে পারে। অনেক রাজ্যে এই মূল্য কিস্তিবন্দি হিসাবে দেওয়া যায়। জমিদারদের নিকট হইতে যে উদ্বৃত্ত জমি অধিকার করা হইয়াছে তাহার জন্যও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে।

ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিককে জমি দেওয়ার জন্য বহু রাজ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির কত জমি থাকিবে তাহার উচ্চসীমা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন রাজ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দখলে কত জমি রাখিতে পারিবে, আবার কোন কোন রাজ্যে ভবিষ্যতে কত জমি ক্রয় করিতে পারিবে তাহার উর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে যে জমি উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহা ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের দেশে সচরাচর দৃষ্ট ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জমিগুলি কৃষি উন্নয়নের বিশেষ পরিপন্থী। এই সকল ছোট ছোট জমিগুলিকে একত্র করিয়া বড় জমিতে পরিণত করা দরকার—যাহা চাষ করা অধিকতর লাভজনক। বর্তমানে যে জমি আছে তাহা যাহাতে আরও ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বিভক্ত না হয় তাহারও ব্যবস্থা করা দরকার। বহু রাজ্যে জমির পুনরায় খণ্ডীকরণ আইন অনুসারে নিষিদ্ধ। অনেক রাজ্যে বিক্ষিপ্ত জোতগুলি একত্রকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ছোট ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের জোত উন্নয়নের উপায় খুবই সীমিত। এই শ্রেণীর কৃষকগণ সমবায় খামার গঠন করিয়া জমির ফলন বাড়াইতে পারে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমবায় খামার গঠনের জন্য সম্প্রতি খুবই উৎসাহ দিতেছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনই এই প্রকার বহু খামার গঠিত হইয়াছে। ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা ও অন্যসূত্রে প্রাপ্ত সকল উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক দ্বারা গঠিত সমবায় খামারসমূহকে বিতরণ করা হইয়াছে। সমগ্র গ্রাম একটি সমাজ হিসাবে গ্রামের সমস্ত জমি লইয়া সমবায়ের মাধ্যমে তাহা চাষ করিতে পারে কিনা সম্প্রতি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে—যাহাতে ব্যক্তি সমাজের এবং সমাজ ব্যক্তির জন্য কাজ করিতে পারে এবং ইহাতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই উপকৃত হইবে।

কেন্দ্রীয় ও সকল রাজ্য সরকার ভূমিসংস্কারের উপর অতিশয় গুরুত্ব

আরোপ করিয়াছেন। ভূমিসংস্কারের ফলে জমিতে কৃষকের স্থায়ী মালিকানা এবং জমির ফলনের উপর তাহার পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতবাসীর পক্ষে জমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া খুব অল্পসংখ্যক কৃষকই যে জমি তাহারা চাষ করিত তাহার মালিক ছিল। জমিদারী ও রায়তওয়ারী প্রথা কৃষকদিগকে শোষণ করিয়াছে। জমির মালিকগণ ফলনের সিংহ ভাগ পাইত এবং কৃষক-প্রজা ও ভূমিহীন কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইত।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর একটি **জাতীয় ভূমি সংস্কার পরিকল্পনা** গৃহীত হয় এবং সকল রাজ্যে ভূমিসংস্কারের কাজ আরম্ভ হয়। রায়তদিগকে জমির স্থায়ী মালিকানা প্রদান করা হইয়াছে। ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিককে জমি দেওয়া হইয়াছে এবং ছোট ছোট জোতগুলিকে একত্রীভূত করা হইয়াছে। সমবায় গঠনে উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে।

প্রশ্ন

১। বৃটিশ শাসনে জমির মালিকানা কিরূপ ব্যবস্থা ছিল? উহা কৃষকদের অনুকূলে ছিল না কেন?

২। জাতীয় ভূমি-সংস্কার পরিকল্পনা কি কি সুপারিশ করিয়াছে?

৩। কি কি ভাবে ভূমি-সংস্কার কৃষকদের সহায়ক হইয়াছে?

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষি সমবায় ও সংগঠন [Farmers' Cooperatives and Organisations]

ভারতে সাধারণ কৃষক তাহার ক্ষুদ্র জোত হইতে অতি সামান্যই উপার্জন করে। কৃষক তাহার জীবনযাত্রা তথা কৃষির মান উন্নয়ন করিতে চাহিলেও অনেকগুলি কারণ তাহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। ক্ষুদ্র জোতে উন্নয়নের সুযোগ খুবই সীমিত। তাহার সংসার ও খামারের চাহিদা পূরণের জন্য কৃষকের ঋণের প্রয়োজন হয়। তাহাকে তাহার আবশ্যক জিনিসগুলি, যথা, বীজ, সার, পশুখাদ্য ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বাজার হইতে উচ্চমূল্যে ক্রয় করিতে হয়। তাহার আর্থিক অবস্থা এমনই যে ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা বিক্রয় করিয়া দিতে হয়—মূল্যবৃদ্ধির সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে না।

অংশত কৃষকের নিরক্ষরতার সুযোগ লইয়া মহাজন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং পাইকার প্রভৃতি সকলেই তাহাকে ঠকায় এবং লাভের এক বৃহৎ অংশ তাহার হাতছাড়া হইয়া যায়। একক কৃষক তাহার দারিদ্র্যের জন্য কিছুতেই এই সকল অসুবিধা দূর করিতে পারে না। সমবায় হইল ইহার একমাত্র সমাধান। কৃষকের একক প্রচেষ্টায় যাহা সম্ভব নয়,—সমবায় গঠন করিয়া অনায়াসে তাহা সম্ভব করা যায়।

কৃষকদের সমবায় এমন একটি সংস্থা যাহাতে কৃষকগণ স্ব-ইচ্ছায় যোগ দেয় এবং সকলের সমান সুযোগ সুবিধার জন্য সাম্য ও পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কাজ করে। এই প্রকার গণতান্ত্রিক সমবায়ে প্রত্যেক সভ্যের সমান ভোটাধিকার থাকে। একজনের শেয়ার যতই থাকুক না কেন, "একজনের একটি ভোট" ইহাই নিয়ম। এই প্রকার সমবায়ের সভ্য যে কোন কৃষক হইতে পারে এবং ইহার সুবিধাগুলিও সকলেই গ্রহণ করিতে পারে। কৃষকদের আবশ্যিক জিনিসগুলি সস্তায় কৃষককে সরবরাহ

এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য সুষ্ঠুভাবে বিতরণের উদ্দেশ্যে সমবায় গঠিত হয়। ব্যবসায়ী সংস্থা বা লিমিটেড কোম্পানীর মত প্রচুর লাভ করা সমবায়ের উদ্দেশ্য নয়।

কৃষি সমবায় একটি ছোট অঞ্চলে, যেমন একটি গ্রাম বা কয়েকটি গ্রামের মধ্যে কাজ করে, ফলে সকল সভ্যই সকলের পরিচিত। ইহার ফলে সকলেই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া সকলের উন্নতির জন্য একসঙ্গে কাজ করিতে পারে। সমবায়ের প্রতিটি সদস্য সীমিত সংখ্যক শেয়ারের অধিক ক্রয় করিতে পারে না। এইভাবে একটি সাম্যভাব গড়িয়া উঠে।

কৃষি সমবায়ে কর্মসম্পাদনই মুখ্য। লাভের কেবলমাত্র এক সামান্য অংশ সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ (dividend) হিসাবে প্রতি বৎসর বন্টন করা হয়। লাভের কিছু অংশ সংরক্ষিত তহবিলে (reserve fund) জমা হয়। ইহা সতর্কতার সহিত নিয়োগ করা হয় এবং সমবায়ের উন্নয়ন বা ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। লাভের এক ক্ষুদ্র অংশ **'সাধারণ সদিচ্ছা তহবিলে'** (Common goodwill fund) জমা হয়। কোন কৃষক বা কৃষক পরিবার দুর্দশাগ্রস্ত হইলে, এই তহবিল হইতে তাহাকে সাহায্য করা হয়। সদস্যগণ যে হারে সমবায়ের সহিত লেনদেন করিয়াছে সেই হারে লাভের অবশিষ্টাংশ সদস্যদের মধ্যে **রিবেট** (rebate) হিসাবে বন্টন করা হয়। এই ধরনের সমবায় পরস্পরের প্রতি সদিচ্ছা পোষণ করিতে ও সদস্যদের মিতব্যয়ী হইতে উৎসাহিত করে। সুষ্ঠুভাবে চালিত হইলে ইহা সদস্যদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সহায়ক।

কৃষি সমবায় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলির যে কোন একটির জন্য গঠন করা যায়:

(১) সুবিধাজনক শর্তে ঋণদান (**ঋণদান সমবায়**);

(২) দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ও বিক্রয় (**দ্রব্যসামগ্রীর সমবায়**);

(৩) কৃষি-পণ্যের বিপণন (**বিপণন সমবায়**);

(৪) জোত একত্রকরণ (**জমি একত্রকরণ সমবায়**);

(৫) সমবায়ের মাধ্যমে চাষ (**চাষ সমবায়**)।

কখনও কখনও দুই বা ততোধিক উদ্দেশ্যমূলক সমবায় এক-উদ্দেশ্যমূলক সমবায় অপেক্ষা সুবিধাজনক। এই প্রকার সমবায়কে **বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায়** (Multipurpose co-operative) বলে।

ভারতবর্ষে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সমবায় আন্দোলন আরম্ভ হয়। বর্তমানে দেশে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সমবায় আছে। ইহাদের সদস্যসংখ্যা দুই কোটি। রিজার্ভ ফাণ্ড ও গচ্ছিত মূলধন হইল একশ' সাতাশি কোটি টাকা। প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গ্রাম এই সমবায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

ঋণদান সমবায় (Credit Cooperative)

চাষের জন্য, ফসল উঠার পূর্ববর্তী কালের খরচ মিটাইবার জন্য, পারিবারিক জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বা বিশেষ অনুষ্ঠানের খরচের জন্য কৃষকের ঋণের প্রয়োজন হয়। একটি সম্পূর্ণ ফসল-ঋতু (crop season) অপেক্ষা করার পর কৃষকদের হাতে নগদ টাকা আসে। কৃষি মরসুমে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ দিয়া ঋণদান সমবায় কৃষকদের চাহিদা মিটাইতে পারে। ব্যক্তিগত জামিনে সমবায় সদস্যদের ঋণ দেওয়া যায়। অনেক ঋণদান সমবায়কে বহু-উদ্দেশ্যমূলক সমবায়ে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে।

দ্রব্যসামগ্রীর সমবায় (Stores Cooperative)

বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ও তাহার সরঞ্জাম, পশুখাদ্য, খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য বহু গৃহস্থালীর দ্রব্যসামগ্রী কৃষকের প্রয়োজন হয়। ছোটখাটো ব্যবসায়ীর নিকট উচ্চহারে এই সকল সামগ্রী তাহাকে ক্রয় করিতে হয়। এই সকল সামগ্রীর পরিমাণ ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। অনেক সময় সকল জিনিস পাওয়াও যায় না।

দ্রব্যসামগ্রীর সমবায় গঠন করিলে এসকল অসুবিধা দূর করা যায়। সকল সদস্যের চাহিদা অনুযায়ী জিনিসপত্র পাইকারী দরে ক্রয় করিয়া সমবায় সদস্যদের নিকট প্রচলিত খুচরা মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। সমবায়ের যাহা লাভ হয় তাহা বৎসরের শেষে সদস্যদের মধ্যে রিবেট হিসাবে বণ্টন করা যায়।

এইভাবে কৃষকগণ তাহাদের ক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ ও উৎকর্ষ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে মিতব্যয়িতাও গড়িয়া উঠে। উচ্চ মূল্যের দরুন স্বল্পবিত্ত কৃষকগণ তাহাদের প্রয়োজনীয় যে সকল যন্ত্রপাতি ক্রয়

করিতে পারে না তাহা এধরনের সমবায় ক্রয় করিয়া স্বল্পহারে কৃষকদের নিকট ভাড়া দিতে পারে।

বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ও তাহার সাজসরঞ্জাম ছাড়াও এই প্রকার সমবায় কৃষকদের অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিস, যথা, কীটনাশক ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, কেরোসিন তৈল, এবং বাড়ীঘর ও চাষের যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে।

বিপণন সমবায় (Marketing Cooperative)

উন্নত ধরনের চাষবাস করিয়া ফলন বাড়াইলেই কৃষকের সকল সমস্যার সমাধান হয় না। সর্বোচ্চ মূল্যে ফসল বিক্রয় করাও দরকার। কিন্তু ফসল উঠার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের জরুরী চাহিদাসমূহ পূরণ করিবার জন্য নগদ টাকা দরকার; যাহার জন্য কৃষক ফসলের মূল্যবৃদ্ধির সময় পর্যন্ত ফসল গুদামজাত করিয়া অপেক্ষা করিতে পারে না।

যেহেতু কৃষক এককভাবে ফসল বিক্রয় করে, সেইহেতু তাহা অল্প পরিমাণে তাহাকে বিক্রয় করিতে হয়, ফলে তৎপ্রতি উত্তম ক্রেতা আকৃষ্ট হয় না। পাইকারগণ তাহার নিকট হইতে ফসল ক্রয় করে এবং লাভের সিংহ ভাগ তাহারাই পায়। বিক্রয়ের সময় ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও দাঁড়ি-পাল্লার ব্যবহার কৃষকের লভ্যাংশ আরও কমাইয়া দেয়। কৃষকও অনেক ক্ষেত্রে অধিক লাভের আশায় উৎকৃষ্ট ফসলের সহিত নিকৃষ্ট ফসল মিশাইয়া দেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ মিশ্রিত ফসলের মূল্য নিকৃষ্ট ফসলের হারেই পাইয়া থাকে।

কৃষকগণ যাহাতে সর্বোচ্চ লাভে তাহাদের ফসল বিক্রয় করিতে পারে তজ্জন্য সরকার অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারী বাজারগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন। অনুরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কৃষকগণ বিপণন সমবায় গঠন করিতে পারেন। এই প্রকার সমবায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে হইলে প্রথমে বাজারের দর উঠানামা প্রভৃতি সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিতে হয় এবং তৎপরে ফসল বিক্রয়ের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা নির্ণয় করিতে হয়। সদস্যগণ তাহাদের ফসল সংরক্ষণের জন্য সমবায়ে রাখিয়া তাহাদের জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কিছু অগ্রিম লইতে পারে। বাজার দর অনুকূলে আসিলে ফসল বিক্রয় করা যায়। যদি এই

ব্যবস্থা সুবিধাজনক মনে না হয় তবে সদস্যগণ কোন এক বিশেষ দিনে ফসল আনিয়া নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। ফসল ঋতুতে সদস্যগণের পক্ষে কিছু অগ্রিম লওয়াও সম্ভব যাহা ফসল বিক্রয় করিয়া পরিশোধযোগ্য।

সদস্যগণ যে সকল ফসল আনিবে তাহা গুদামজাত করিবার জন্য বিপণন সমিতির নিজস্ব গুদাম থাকা আবশ্যক। অবশ্য ফসল তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করিয়া দিলে গুদামের প্রয়োজন নাই। গুদামজাত করিবার সময় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যেন ফসল উত্তমরূপে বস্তাবন্দী থাকে। সরকার প্রতিষ্ঠিত পণ্যাগার নিগমগুলির (Warehousing corporation) গুদামে স্বল্প ভাড়ায় কৃষক নিজে বা সমবায়গুলি ফসল রাখিতে পারে। যেখানে বিপণন সমবায়ের নিজস্ব গুদাম নাই সেখানে সরকারী পণ্যাগার প্রতিষ্ঠিত থাকিলে সমবায় অনায়াসে সেই সুযোগ লইতে পারে।

শহর অঞ্চলে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের চাহিদা অধিক হওয়ায় শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলের কৃষকগণ তাহাদের দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিপণনের জন্য দুগ্ধ সমবায় গঠন করিতে পারে। এইরূপ সমবায় ঐ সকল দ্রব্যের উচ্চমান বজায় রাখিতে পারে। ফলে ক্রেতাগণও উন্নতমান দ্রব্যের জন্য বর্ধিত মূল্য দিতে দ্বিধাবোধ করে না। এ প্রকার সমবায় সুষ্ঠুভাবে গঠন করিলে সদস্যগণ তাহাদের পশুর জন্য সাধারণ গোশালা (common shed), চিকিৎসার ব্যবস্থা, সুবিধাজনক মূল্যে পশুখাদ্য ক্রয় এবং নূতন পশু ক্রয় করিবার জন্য ঋণের ব্যবস্থা করিতে পারে। যেখানে সমবায় শহর হইতে দূরে অবস্থিত এবং ব্যয়সাধ্য সরঞ্জাম ব্যতিরেকে উত্তম অবস্থায় দুগ্ধ চালান দেওয়া সম্ভব নয় সেখানে সমবায় পনির, সর, মাখন, ঘি প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্য চালান দিতে পারে। ভারতের বহু শহর ও নগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে এই প্রকার বহু সমবায় সাফল্যের সহিত কাজ করিতেছে।

যে সকল কৃষক হাঁস মুরগী পালন করে তাহারা হাঁস মুরগীর খাদ্য-মিশ্রণ ও বিক্রয়, হাঁস-মুরগী ও ডিম সংগ্রহ, বিক্রয় ও শ্রেণীবিভাগ (grading) প্রভৃতি কাজের জন্য অনুরূপ সমবায় গঠন করিতে পারে। ফল ও সব্‌জি বা মধু ও মোম এবং অন্যান্য বহু কৃষিজাত পণ্যের জন্যও সমবায় গঠন করা যাইতে পারে।

জোত একত্রকরণ সমবায়
(Land consolidation cooperative)

ভারতে কৃষকের ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ সাধারণতঃ খুবই কম। সেই সকল ক্ষুদ্র জমি আবার প্রায়ই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। ইহার ফলে খামারের সুষ্ঠ পরিচালনায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এক মাঠ হইতে অন্য মাঠে যাইতে কৃষকের প্রচুর সময় ও শক্তির অপচয় হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখণ্ডে চাষের উন্নত প্রণালী অবলম্বনেও বাধার সৃষ্টি হয়। একটি বৃহৎ জমি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করিলে এবং ঐ বিভাগ সুস্পষ্ট করিবার জন্য আইল দিলে আইলের জমিগুলি চাষের কাজে আসে না।

সাম্প্রতিক কালে খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত জোতের অপকারিতার প্রতি সরকার ও কৃষক উভয়েরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। অনেক রাজ্যে আইন করিয়া জমি পুনরায় খণ্ডীকরণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত জোতগুলি একত্র করিয়া একটি খামারে পরিণত করিতে হইলে জমি বিনিময় করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকগণ নিজেরাই এই উদ্দেশ্য লইয়া সমবায় গঠন করিয়াছে। এই প্রকার সমবায়কে **জোত একত্রকরণ সমবায়** (Cooperatives for the consolidation of holdings) বলা হয়। এই সকল সমবায়ে জমির পুনর্বণ্টন ও বিনিময়ে সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠদের নির্দেশ মানিয়া লয়। এই ধরনের সমবায় সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে জমির পুনর্খণ্ডন বন্ধ করিতে পারে। জমির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, কি পরিমাণ জমি বিনিময় করা হইবে তাহার পরিমাণ, জমির সীমানা পুনর্নিধারণ এবং নূতন মালিকের নূতন খামারের স্থান নির্দেশ প্রভৃতিও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাধান করা যায়। এই সমবায় উহার এলাকার মধ্যে ক্ষেত হইতে গ্রামে ফসল পরিবহণের সুবিধার জন্য রাস্তা নির্মাণও করিতে পারে।

চাষ সমবায় (Farming cooperative)

চাষের সকল বিষয়ে সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক হইলে কৃষকগণ **চাষ সমবায়** (Farming cooperative) গঠন করিতে পারে। চাষ সমবায় নিম্নলিখিত চারিপ্রকার হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি সফল হইয়াছে, কোন কোনটি হয় নাই।

১। উন্নততর চাষ সমবায় (A better farming co-operative)
২। যুক্ত চাষ সমবায় (A joint farming co-operative)
৩। ভাড়া চাষ সমবায় (A tenant farming co-operative)
৪। যৌথ চাষ সমবায় (A collective farming co-operative)

উন্নততর চাষ সমবায়

উন্নততর চাষ সমবায়ে উহার এলাকায় চাষের কোন উন্নত পদ্ধতি, যেমন, উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার বা রাসায়নিক সারের প্রয়োগ বা পশুখাদ্যের চাষ প্রভৃতির মধ্যে কোন্‌টি সব চাইতে উপযোগী ও লাভজনক সে বিষয়ে সদস্য-গণ একমত হইয়া কাজ করে। সদস্যগণ যৌথভাবে চাষ বা ফসল কাটা বা যন্ত্রপাতি প্রভৃতিও ব্যবহার করিতে পারে। প্রত্যেক সদস্য অবশ্যই চাষের অপরাপর বিষয়ে নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে। সদস্যদের জমির মালিকানা-স্বত্ব নিজেদেরই থাকে। সমবায়ের সহায়তার জন্য তাহাদের সামান্য মূল্য দিতে হয় এবং বৎসরের শেষে তাহারা লভ্যাংশ (dividend) পাইয়া থাকে।

সেচ নালা নির্মাণ ও সংরক্ষণ, কূপ খনন, গভীর চাষ (deep ploughing) বা খামারের রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি কাজের জন্যও সমবায় গঠন করা যায়। ব্যয় ও শ্রমসাধ্য বলিয়া কৃষক এককভাবে এই সকল কাজ করিতে পারে না। এই প্রকার সমবায়ের সদস্যগণ যৌথভাবে ব্যয়সাধ্য যন্ত্রপাতি, যেমন, ট্রাক্টর ও তাহার সরঞ্জাম, জলসেচন করিবার যন্ত্র, আখমাড়াই কল প্রভৃতি ক্রয় করিতে পারে।

যুক্ত চাষ সমবায়

যুক্ত চাষ সমবায়ে সদস্যগণ তাহাদের ছোট ছোট জোতগুলি একত্র করিয়া চাষ করে যাহাতে চাষ লাভজনক হয় এবং তাহাতে উন্নত পদ্ধতি-সমূহ অবলম্বন করা যায়। প্রত্যেক সদস্য তাহার দৈনিক শ্রমের জন্য মজুরী পায়। ফসল উঠিবার পর তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে সদস্যগণ তাহাদের প্রদত্ত জমির অনুপাতে লভ্যাংশ পায় এবং যে হারে শ্রম দিয়াছে তদনুপাতে আয়ের অংশ পায়। এ প্রকার সমবায় যৌথভাবে বীজ, সার বা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করে এবং জমি উন্নয়নের কাজ গ্রহণ করে।

ভাড়া চাষ সমবায়

ভাড়া চাষ সমবায়ে জমি কবুলতি বা পাট্টায় গ্রহণ করা হয় এবং ছোট ছোট জমিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া সমবায়ের সদস্যদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ভাড়ায় বিতরণ করা হয়। সমবায় কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র জমি চাষ করা হয়। কিন্তু কিভাবে উক্ত পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে সদস্যদিগের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আবশ্যকীয় ঋণ, বীজ ও সার ইত্যাদি সমবায় সরবরাহ করে এবং উৎপন্ন ফসলের বিপণনেও সমবায় সহায়তা করে। প্রত্যেক সদস্য নিজের জমির জন্য সমবায়কে নির্দিষ্ট হারে ভাড়া দেয়; কিন্তু জমির ফলন সম্পূর্ণরূপেই সদস্যের নিজের এবং নিজের সুবিধামত তাহা বিক্রয় করিতে পারে। প্রতি বৎসরের শেষে সদস্য কর্তৃক দেয় ভাড়ার অনুপাতে লভ্যাংশ সদস্যদের মধ্যে বিতরিত হয়।

যৌথ চাষ সমবায়ে

যৌথ চাষ সমবায়েও পাট্টায় জমি লওয়া হয় এবং সমগ্র জমি যৌথ ভাবে চাষ করা হয়। সদস্যগণ একটি নির্দিষ্ট হারে তাহাদের শ্রমের জন্য পারিশ্রমিক পায়। এই প্রকার চাষ ব্যাপকভাবে করা হয় বলিয়া যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ করা সম্ভব হয়; ফলে লাভও বেশি হয়। বৎসরের শেষে সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত শ্রম অনুসারে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়।

বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় (Multipurpose Co-operative)

এক উদ্দেশ্যসাধক বহু সমবায় গঠন যখন কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয় না তখন বহু-উদ্দেশ্যসাধক একটি সমবায় গঠন করাই যুক্তিসঙ্গত। এই প্রকার সমবায়ের মাধ্যমে ঋণ সংগ্রহ, উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রয়োগ, উৎপন্ন ফসলের বিপণন, খামার বা গৃহের আবশ্যক সামগ্রী সংগ্রহ প্রভৃতি বহুবিধ সুবিধা সদস্যগণ গ্রহণ করিতে পারে। এই সমবায়ের এরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত যাহার ফলে কেবল মুষ্টিমেয় সদস্য নয়, পরন্তু সকল সদস্যই উপকৃত হয়।

আজকের ভারতে এই প্রকার অনেক বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় আছে অধিকাংশ সমবায়ই ঋণদানের সহিত সদস্যদের উৎপন্ন ফসলের ক্রয়-বিক্রয়ও করিয়া থাকে।

উন্নত পদ্ধতিতে ফলন বৃদ্ধির জন্য এই সকল সমবায়কে আরও কার্যকরী করিবার প্রয়োজনে সম্প্রতি স্থির করা হইয়াছে যে প্রতি গ্রামে একটি করিয়া সেবা সমবায় (service co-operative) থাকিবে। এই সকল সমবায় কেবল মাত্র কৃষকের প্রয়োজনীয় ঋণই যোগাইবে না, বীজ, সার, রোগ প্রতিরোধক ও কীটনাশক ঔষধ, সিমেণ্ট, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি সংগ্রহেও কৃষককে সাহায্য করিবে। কেবল এ প্রকার সেবা সমবায় গঠন করিয়াই কৃষকদের সকল প্রকার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হইবে।

কৃষক সংস্থা (Farmers' Forum)

গ্রামীণ সমাজ ও কৃষকদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে এবং কৃষির উন্নতির জন্য সরকার বহু কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চায়েত কৃষকের কিছু কিছু সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে। গ্রামীণ সমবায় ফলন বৃদ্ধিতে ও উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে কৃষককে সাহায্য করে।

ইহা সত্ত্বেও এ সকল সংস্থা কৃষকদের সকল চাহিদা পূরণ বা সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। কি ধরনের পরিকল্পনা তাহাদের প্রয়োজন, সে সম্পর্কে তাহাদের মতামত থাকা আবশ্যক। কোন্ পথ অবলম্বন করিলে তাহাদের স্বার্থ রক্ষিত হইবে এবং তাহাদের সব চাইতে বেশী উপকার হইবে সে সম্পর্কে তাহারা যেন সরকারকে অবহিত করিতে পারে।

অনেক দেশে কৃষকগণ একটি সংস্থায় নিজেদের সংঘবদ্ধ করে। এ প্রকার কৃষক সংগঠনে সদস্য কৃষকগণ একত্র হইয়া তাহাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ ও তৎসম্পর্কে কি করা যায় তাহা স্থির করার সুযোগ পায়।

এ প্রকার সংগঠন কৃষিজাত দ্রব্যের দাম ও বিপণন নিয়ন্ত্রণ, কৃষি ব্যবসায়ের প্রসার, সদস্য কৃষকের স্বার্থরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা চালায়। ইহারা কৃষি বিভাগ ও সম্প্রসারণ বিভাগের সহিত সহযোগিতা করিয়া প্রদর্শনী ক্ষেত্র প্রভৃতি স্থাপন ও কৃষকের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করে। কৃষি সমবায় স্থাপনে ইহারা সহায়তা করে। আরও নানাভাবে তাহারা কৃষক সমাজের কল্যাণ সাধনে রত থাকে।

ভারতেও কয়েকটি স্থানে কিছু কৃষক সংঘ গঠিত হইয়াছে কিন্তু ইহাদের কাজের পরিধি খুবই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সম্প্রতি ভারত সরকারের সহযোগিতায়

বিভিন্ন রাজ্যে কৃষক সংস্থা বা **কৃষক সমাজ** (সভা) গঠন করিবার জন্য এক আন্দোলন শুরু হইয়াছে। এই প্রকার সংস্থা গ্রাম, মহকুমা, জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে গঠিত হইতেছে। ভারতের কৃষক সংস্থা বা **'ভারত কৃষক সমাজ'** সমগ্র দেশ জুড়িয়া এই প্রকার সংস্থা গঠন করিতেছে।

কৃষক সংগঠন বা কৃষক সভা সকল কৃষককে একত্র করিয়া তাহাদের সমস্যাগুলি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান, কৃষিপণ্য উৎপাদনকারীদের স্বার্থরক্ষা এবং রাজ্য ও জাতীয় কৃষিনীতিসমূহ নির্ধারণ করিতে পারে। এই সংগঠন কৃষককে তাহার নিজের ও সমাজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় সুযোগ দেয়। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যেই বর্তমানে এই প্রকার সংগঠন স্থাপিত হইয়াছে।

কৃষি যুব সংস্থা (Farm Youth Clubs)

আজকের কৃষক ছেলে ও মেয়ে দেশের ভাবী গ্রামীণ নাগরিক। কৃষির উন্নত প্রণালী তাহাদের শেখা দরকার; সমাজ উন্নয়ন কাজে তাহাদের সহযোগিতা প্রয়োজন এবং এইভাবে একটি অগ্রসরশীল দেশের গুরু দায়িত্ব বহন করিবার জন্য নিজেদের গড়িয়া তোলা আবশ্যক।

আজকের পৃথিবীর বহু দেশে যুব কৃষক সংস্থা (Young Farmers' Clubs) বা কৃষি যুব সংস্থা আগামীকালের প্রগতিশীল কৃষক ও কৃষক-বধূ গড়িয়া তোলে। ভারতেও বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি যুব সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

কৃষি যুব সংস্থা বা যুবক কৃষক সঙ্ঘ বা যুবক মণ্ডল গ্রামের বালকবালিকাদের মধ্যে উচ্চ আদর্শের প্রেরণা যোগায় এবং উন্নত কৃষি প্রণালী, উন্নত জীবনযাপন, সমাজজীবন ও নাগরিকত্ববোধ সম্পর্কে তাহাদের শিক্ষা দেয়।

এই প্রকার সংঘ বালক-বালিকাদের মধ্যে সুস্থ জীবনযাপনের অভ্যাস গঠন, নূতন নূতন হাতের কাজ শিক্ষা এবং অবসর সময় সৎ কাজ ও সৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে প্রেরণা যোগায়। এ সকল সংঘের ছেলেমেয়েরা একজন নেতার সাহায্যে ছোট ছোট কাজ, যেমন হাঁস মুরগীর শাবকপালন বা সব্‌জির চাষ বা কাপড়ে নানা প্রকার নক্‌শার কাজ বা রান্না প্রভৃতি কাজে হাত পাকায়। নেতাগণ বিশেষ ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত। সংঘের সদস্যরা যাহা শিখে

তাহা অপরাপর ছেলেমেয়েদের শিখায় ; ফলে আরও বহু বালক-বালিকা তথা সমগ্র ভারত উপকৃত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

কতকগুলি প্রতিবন্ধকতার জন্য ভারতে কৃষি ও কৃষকদের জীবনযাত্রার মান খুবই নিচু। এককভাবে তাহারা নিজেদের মান উন্নয়ন করিতে পারে না। কিন্তু সমবায়ের মাধ্যমে যৌথভাবে তাহা সম্ভব।

কৃষকদের সমবায় এমন একটি সংস্থা যাহাতে কৃষকগণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যোগদান করে এবং সকলের উন্নতির জন্য একযোগে কাজ করে। ইহা গণ-তান্ত্রিক। প্রত্যেক সদস্য সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং সমবায়ের কাজে প্রত্যেক সদস্যেরই মতামত গ্রহণ করা হয়। সমবায়ে সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানই মুখ্য এবং লভ্যাংশ উপার্জন গৌণ।

ঋণদান, দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়, কৃষিজাত বা উপজাত পণ্যের বিপণন, জোত একত্রকরণ বা সমবায় চাষ প্রভৃতির যে কোন একটি উদ্দেশ্য লইয়া সমবায় গঠন করা যায়। আবার এ সকল উদ্দেশ্যসমূহের কয়েকটিকে লইয়া একটি বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায়ও গঠন করা যায়।

ঋণদান সমবায় ইহার সদস্যদের সহজ কিস্তিতে স্বল্পমেয়াদী ঋণ যোগায়। দ্রব্য-সামগ্রীর সমবায় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে। কৃষি বিপণন সমবায় সদস্যদের উৎপন্ন ফসল ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ে সহায়তা করে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, ডিম ও হাঁস মুরগী এবং খামারজাত অন্যান্য পণ্য বিক্রয়েও বিপণন সমিতি সাহায্য করিতে পারে। জোত একত্রকরণ সমবায় সদস্যদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট জোতগুলি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে একত্র করিতে সহায়তা করে। চাষ সমবায় কৃষকগণের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জমির ফলন বৃদ্ধি তথা নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করে।

সম্প্রতি 'ভারত কৃষক সমাজ' নামে একটি জাতীয় কৃষক সংস্থা গঠিত হইয়াছে। প্রতি রাজ্যে ইহার শাখা আছে। কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।

গ্রামের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের প্রসার ও

তাহাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ভারতের অনেক রাজ্যে কৃষি যুব সংস্থা গঠিত হইয়াছে।

প্রশ্ন

১। কৃষি সমবায় কাহাকে বলে? এককভাবে কৃষক যাহা করিতে পারে না সম্মিলিতভাবে তাহাতে সাফল্য আসে কেন?

২। বিভিন্ন প্রকার কৃষি সমবায়ের নাম বল। তোমার গ্রামের পক্ষে কোন্‌টি উপযোগী?

৩। কৃষকগণ ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না কেন? তোমার মতে ইহার সমাধান কি?

৪। কৃষক সংস্থার উদ্দেশ্য কি?

৫। কৃষি যুব সংস্থার কাজ কি?

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষি কল্যাণমূলক কাজ

[Agricultural Services]

কৃষির উন্নতি কি ভাবে করা যায় সে সম্পর্কে কৃষককে পরামর্শ দেওয়া দরকার। উন্নত বীজ, সার, যন্ত্রপাতি, পশুখাদ্য, রোগ বা কীটপতঙ্গ প্রতিরোধক ঔষধ প্রভৃতি কৃষকের আবশ্যক। খামারের মাটি পরীক্ষা বা রুগ্ন পশুর চিকিৎসার জন্য কৃষক বিশেষজ্ঞের পরামর্শের প্রয়োজন বোধ করে। বাঁধ নির্মাণ বা কূপ খনন বা কোন নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য তাহার ঋণের প্রয়োজন হয়।

রাজ্যের কৃষি বিভাগ, সমাজ উন্নয়ন বিভাগ, পশুপালন ও পশু চিকিৎসা বিভাগ, সেচ বিভাগ, সমবায় বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ হইতে কৃষকের নিকট ঐ সকল সাহায্য আসে। বিভিন্ন রাজ্যে অবশ্য সাহায্যের প্রকার ও কাজের ধারার একটু ইতর-বিশেষ হয়।

তথ্য (Information)

ভারতের অধিকাংশ গ্রামেই জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা রূপায়িত হইতেছে। জাতীয় সম্প্রসারণের কাজ সংস্থা বা ব্লকের (Block) মাধ্যমে হয়। প্রত্যেক জেলা কয়েকটি সমাজ উন্নয়ন সংস্থায় বিভক্ত। প্রতি সংস্থায় একজন করিয়া সংস্থা উন্নয়ন আধিকারিক (Block Development Officer) থাকেন এবং তাঁহার সম্প্রসারণ কর্মিবৃন্দ (Extension staff) গ্রামবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবিরাম সহায়তা করিতেছেন।

প্রতি সংস্থায় কয়েকজন, সাধারণতঃ দশজন করিয়া গ্রাম সেবক বা গ্রাম

পর্যায়ের কর্মী (Village Level Worker) থাকেন। গ্রাম সেবক কৃষককে উন্নত কৃষি প্রণালী সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেন এবং কৃষকের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। উন্নত প্রণালীসমূহ কিভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং তাহাতে কি উপকার হয় তাহা কৃষককে হাতে কলমে দেখাইবার জন্য গ্রাম সেবক তাঁহার এলাকায় কয়েকটি প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন করেন। কৃষক কোন সমস্যার সম্মুখীন হইলে গ্রাম সেবক তাহা সমাধানের চেষ্টা করেন, অন্যথায় তিনি সংস্থার প্রধান কর্মকেন্দ্রের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের (Agricultural Extension Officer) সাহায্য প্রার্থনা করেন।

প্রত্যেক রাজ্যে কৃষি বিভাগের সহিত একটি করিয়া কৃষি তথ্য কেন্দ্র (Agricultural Information Unit) যুক্ত থাকে। এই কেন্দ্র কৃষকদের ব্যবহারের জন্য স্থানীয় ভাষায় কৃষিবিষয়ে নানা প্রচারপত্র ও পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া থাকে। অনেক সময় প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য কৃষক ঐ কেন্দ্রের কৃষি তথ্য আধিকারিকের (Agricultural Information Officer) সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে। সম্প্রতি প্যাকেজ প্রোগ্রাম এলাকায় জেলা পর্যায়েও কৃষি তথ্য কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

কোন জটিল সমস্যার সমাধান নির্দেশে গ্রাম সেবক অসমর্থ হইলে কৃষক কৃষি বিভাগের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সহিত যোগাযোগ করিতে পারে। কোন কোন রাজ্যে এই সকল বিশেষজ্ঞগণ সরকারী কৃষি কলেজের সহিত যুক্ত থাকেন। নিম্নে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও তাঁহাদের কর্তব্য সম্পর্কে একটি তালিকা দেওয়া হইল।

বিশেষজ্ঞ	কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ
১। উদ্যান পালন বিশারদ (Horticulturist)	উদ্যান পালন, ফলের চারা, কলম, সবজির বীজ প্রভৃতি।
২। কৃষি রসায়নবিদ (Agricultural Chemist)	মাটি, মাটির পরীক্ষা, সার, জল, দুধ ও পশুখাদ্য।
৩। কৃষি কীটতত্ত্ববিদ (Agricultural Entomologist)	ফসলের কীটশত্রু ও তাহার প্রতিকার।

ফটো নং ১৩।
কৃষকগণ কর্তৃক স্থাপিত পথিপার্শ্বস্থ বাজারগুলিতে ফসলের ভাল দাম পাওয়া যায়।
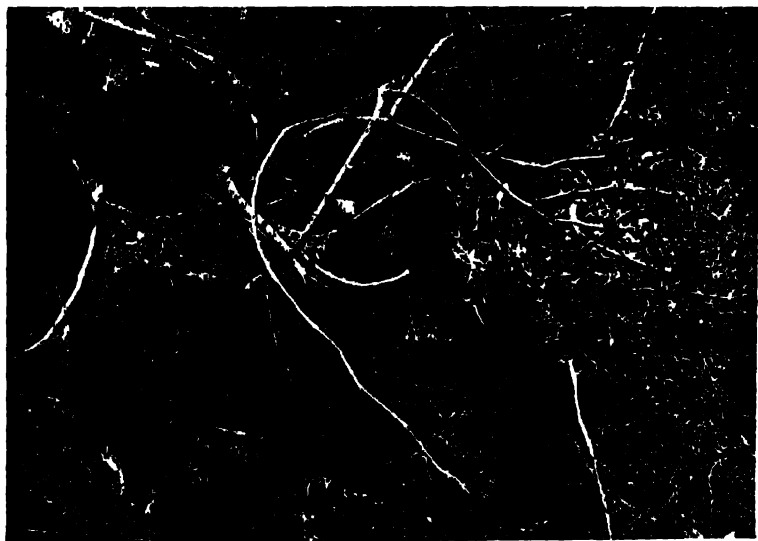
ফটো নং ১৪।
জমিতে পরিত্যক্ত শিলা খণ্ডগুলি সারা জমিতে আগাছা বীজের উৎসরূপে কাজ করে। আগাছা

ফটো নং ১৫।

(বামে ও নীচে) কৃষক তাহার ফসল হইতেই বীজ নির্বাচন করেন (উপরে) এবং পরবর্তী বছরের
জন্য গোলাজাত করিবার পূর্বে রৌদ্রে শুকাইয়া লন (নিচে)।
(ডাইনে) সেগুন বৃক্ষের পুষ্পবিন্যাস রেসীমের একটি উদাহরণ।

বিশেষজ্ঞ	কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ
৪। উদ্ভিদ রোগবিশারদ (Plant Pathologist)	ফসলের রোগ ও তাহার প্রতিকার।
৫। অর্থনৈতিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ (Economic Botanist)	বিভিন্ন ফসল, ঘাস, বীজ পরীক্ষা ও অর্থকরী উদ্ভিদজাতদ্রব্য।
৬। কৃষিবিশারদ (Agronomist)	উন্নত চাষ পদ্ধতি, ফসল উৎপাদন।
৭। কৃষি যন্ত্রবিশারদ (Agricultural Engineer)	যন্ত্রপাতি ও সেচ।
৮। মৃত্তিকা সংরক্ষণ আধিকারিক (Soil Conservation Officer)	মৃত্তিকা সংরক্ষণ।

ইহা ছাড়া বিশেষ ফসল সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিশারদও থাকেন, যেমন ধান্য বিশারদ, তুলা বিশারদ, ইক্ষু বিশারদ ইত্যাদি। ইহারা বিশেষ ফসলের ফলন বৃদ্ধির জন্য গবেষণা করেন এবং কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ দেন।

কৃষিবিভাগ কৃষকদের জমিতেই কয়েকটি প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন করে। কৃষিবিভাগের নির্দেশমত কৃষক ঐ ক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করেন। এইসকল প্রদর্শনী ক্ষেত্রে অন্যান্য কৃষকগণ উন্নত পদ্ধতি ও তাহার উৎকর্ষ সচক্ষে দেখিবার সুযোগ পান।

অনুরূপভাবে প্রত্যেক রাজ্যের পশুপালন বিভাগেও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ থাকেন। হাঁস মুরগী আধিকারিক (Poultry Development Officer), মেষ উন্নয়ন আধিকারিক (Sheep Development Officer), পশু উন্নয়ন আধিকারিক (Livestock Development Officer), দুগ্ধশালা উন্নয়ন আধিকারিক (Dairy Development Officer) প্রভৃতি বিশারদ পশু উন্নয়ন ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ দেন। পরামর্শের জন্য কৃষক পত্রযোগে বা সরাসরি তাহাদের সহিত যোগাযোগ করিতে পারে।

কল্যাণমূলক কাজ ও সরবরাহ (Services and Supplies)

গ্রাম উন্নয়নের সহিত যুক্ত রাজ্য সরকারের সকল বিভাগই কৃষককে কিছু না কিছু সাহায্য করে। নিম্নে প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা হইল।

বীজ ও সার সরবরাহ

গ্রাম সেবক কৃষকের প্রয়োজনীয় উন্নত বীজ, সার, রোগ ও কীটনাশক ঔষধ, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতিসমূহ সরবরাহ করেন। অনেক অঞ্চলে সমবায় বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত বীজ ভাণ্ডার থাকে। কৃষকদিগকে সরবরাহ করিবার জন্য উন্নত জাতের বীজ এ সকল ভাণ্ডারে মজুত করা হয়। এ সকল ভাণ্ডারে সার, যন্ত্রপাতি, রোগ ও কীটনাশক ঔষধ, পশুখাদ্য, যথা, খইল প্রভৃতিও মজুদ করা হয়।

কৃষি বিভাগ গবেষণা কেন্দ্রে, সরকারী খামারে এবং বেসরকারী জমিতেও উন্নত জাতের বীজ পরিবর্ধন করিয়া কৃষকদের সরবরাহ করে। এ সকল বীজ সরকারী বীজ ভাণ্ডারে বা পঞ্জীভুক্ত কৃষকের (registered grower) নিকট পাওয়া যায়। সমবায় ভাণ্ডারের মাধ্যমে সার ও সবুজ সারের বীজ সরবরাহও করা হয়। কৃষক যাহাতে সহজে সার ও বীজ পায় সেজন্য প্রতি মহকুমার সদরে একটি ভাণ্ডার খোলার জন্য কৃষিবিভাগ সমবায় সমিতিসমূহকে সাহায্য করিতেছে। যেখানে এই সুবিধা নাই, সেখানে গ্রাম সেবক সংস্থা উন্নয়ন আধিকারিকের মাধ্যমে বীজ ও সার সরবরাহের ব্যবস্থা করেন।

কৃষকদের নিকট বিতরণ করিবার পূর্বে কৃষিবিভাগের বীজ পরীক্ষণ আধিকারিক বীজের উৎকর্ষ ও অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেন।

যন্ত্রপাতি (Implements)

সমবায় ভাণ্ডার বা গ্রাম সেবকের মাধ্যমে উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। কৃষি বিভাগের ভাণ্ডারগুলিতে কৃষকের জমিতে প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য সযত্নে বাছাই করা যন্ত্রপাতি মজুদ থাকে। সামান্য পরিমাণ ভাড়ার বিনিময়েও এ সকল যন্ত্রপাতি কৃষক ব্যবহার করিতে পারে। আবার অনেক সময় হ্রাসমূল্যেও উন্নত যন্ত্রপাতি বিক্রয় করা হয়।

মৃত্তিকা সংরক্ষণ (Soil Conservation)

মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিভাগ ভূমিক্ষয় নিবারণে কৃষককে সাহায্য করে। কোন কোন রাজ্যে বাঁধ নির্মাণের জন্য বিশেষ কর্মিদল নিয়োগ করা হয়। ইহা ছাড়া, ঋণ ও এককালীন দানের সাহায্যেও কৃষক এ সকল কাজ সম্পন্ন করিয়া উপকৃত হইতে পারে।

গভীর কর্ষণ (Deep Ploughing)

ট্রাক্টরের সাহায্যে গভীর চাষ বা পতিত জমি উদ্ধারের জন্য স্বল্প ভাড়ায় সরকারী ট্রাক্টর পাওয়া যায়।

কূপ খনন (Digging Wells)

জলসেচনের উদ্দেশ্যে কূপ খননে সরকার উৎসাহ দেন। কয়েকটি রাজ্যে কৃষিবিভাগ এ জন্য ঋণ ও সাহায্য (subsidy) দেন। পুরাতন কূপ সংস্কার ও গভীর করার জন্যও অনেক স্থলে অনুরূপ সাহায্য দেওয়া হয়। অনেক রাজ্যে নালা বা ছোট নদীতে তাড়াতাড়ি অস্থায়ী বাঁধ দেওয়ার জন্যও সাহায্য দেওয়া হয়।

শস্য সংরক্ষণ (Plant Protection)

ফসলে ব্যাপক আকারে রোগের আক্রমণ হইলে বা কীটশক্রর প্রাদুর্ভাব ঘটিলে তাহার প্রতিকারের জন্য কৃষিবিভাগ আবশ্যকীয় ঔষধ ও ঔষধ ছিটাইবার বা ছড়াইবার যন্ত্রসহ একদল শস্য সংরক্ষণ কর্মী প্রেরণ করে। এই কাজ বিনামূল্যে করা হয়।

উদ্যানপালক দল (Horticultural Squads)

বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক দল কর্মী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া ফলের বাগান রচনায় ও চারা রোপণে কৃষককে সহায়তা করে। তাহারা জমি জরিপ করিয়া চারা রোপণের পরিকল্পনা করে এবং জমির যেখানে যেখানে চারা রোপণ করা হইবে তাহা চিহ্নিত করিয়া দেয়।

সকল রাজ্যের কৃষি বিভাগই পুরাতন ফলের বাগান পুনরুজ্জীবন ও নূতন বাগানের বেড়া ও কলম ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দিয়া থাকে।

মৃত্তিকা পরীক্ষা (Soil Testing)

জমিতে যে ফসলের চাষ করা হইবে তাহার সারের চাহিদা ও প্রকার নির্ণয়ের জন্য জমির মাটি পরীক্ষা করা দরকার। বিশ্লেষণের জন্য মাটির নমুনা কৃষি বিভাগের কৃষি রসায়নবিদের পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিতে হয়। সম্প্রতি

প্রতি রাজ্যে ন্যূনপক্ষে একটি করিয়া মৃত্তিকা বিশ্লেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। এখানে মাটির নমুনা পরীক্ষা করিয়া সারের প্রয়োগ সম্পর্কে কৃষককে পরামর্শ দেওয়া হয়।

কৃষি রসায়নবিদ বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে সার, সেচজল, পশুখাদ্য প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন।

বন্য পশুর হাত হইতে রক্ষা (Protection from Wild Animals)

জঙ্গলের নিকটবর্তী অঞ্চলে যে সকল বন্য প্রাণী শস্যহানি ঘটায় তাহাদিগকে গুলী করিয়া মারিবার জন্য সরকার বন্দুক-সংঘ (gun-club) গঠনের জন্য উৎসাহ দেন। এই প্রকার সংঘকে আর্থিক সাহায্য করা হয় এবং স্বল্পহারে গুলী সরবরাহ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে সরকার নিয়োজিত শিকারী বন্যপশু হত্যা করিয়া থাকেন।

পশু চিকিৎসা (Treating Farm Animals)

প্রত্যেক রাজ্যে বহু পশু চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে। এ সকল স্থানে বিনামূল্যে পশুদের চিকিৎসা করা হয়। ইহা ছাড়া ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসকগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পশুদের চিকিৎসা করেন এবং টিকা ও ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কৃষকগণ তাঁহাদের পশুর যে কোনো সমস্যা সম্পর্কে ইঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রজনন ষণ্ড (Breeding Bulls)

কোন কোন রাজ্যে প্রজন ষণ্ড পালনের জন্য কৃষককে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। ঐ সকল ষণ্ড হ্রাসমূল্যে সরবরাহ করা হয়।

নির্দিষ্ট গ্রাম ও কৃত্রিম প্রজনন (Key Villages and Artificial Insemination)

গৃহপালিত পশু উন্নয়নের জন্য কৃষককে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সকল রাজ্যেই কতকগুলি গ্রাম বাছিয়া লইয়া সেখানে উন্নত প্রণালীতে পশুর প্রজনন,

আহার, রোগ প্রতিরোধ ও পশুজাত দ্রব্যের বিপণনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফলে কৃষকগণ প্রভূত উপকৃত হইয়াছে। এ সকল কাজের জন্য কোন মূল্য আদায় করা হয় না।

বহু গ্রামে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট জমি সৃষ্টির জন্য এই সকল কেন্দ্র উৎকৃষ্ট বীর্য নিষেকে গাভী ও স্ত্রীমহিষের গর্ভাধানের ব্যবস্থা করে। ইহার জন্যও কোনো মূল্য আদায় করা হয় না।

হাঁস-মুরগী সরবরাহ (Poultry Supplies)

অধিকাংশ রাজ্য হাঁস-মুরগী উন্নয়ন আধিকারিক হাঁস-মুরগী উন্নয়নের কাজ তত্ত্বাবধান করেন। তিনি হাঁসমুরগী পালককে হ্রাসমূল্যে উন্নত জাতের হাঁস-মুরগী ও ফুটাইয়া শাবক বাহির করিবার জন্য ডিম সরবরাহ করেন। অনেক ক্ষেত্রে বিনামূল্যে কৃষকের দেশী মোরগের সহিত উন্নত জাতের মোরগ বিনিময় করা হয়। ইহাতে কৃষক নিজের মুরগীর পালকে সস্তায় উন্নত করিতে পারে। হাঁস-মুরগীর ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ, হাঁস-মুরগীর মাংস ও ডিম বিপণন সম্পর্কেও উক্ত আধিকারিক কৃষককে সাহায্য করিয়া থাকেন।

মেষ উন্নয়ন (Sheep Development)

হাঁসমুরগীর ন্যায় রাজ্যের মেষ উন্নয়ন আধিকারিক কৃষকের মেষ উন্নয়নে সাহায্য করেন। প্রজন মেষ সরবরাহ এবং পশম বিপণনের ব্যবস্থাও তিনি করিয়া থাকেন।

গৃহপালিত পশু উন্নয়ন (Livestock Development)

উন্নত জাতের পশু ও পশুখাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে পশু উন্নয়ন আধিকারিক কৃষককে তাহার পশুর পাল উন্নয়নে সহায়তা করেন। অনুরূপভাবে রাজ্যের দুগ্ধশালা উন্নয়ন আধিকারিক দুগ্ধবতী গাভী পালন, তাহার আহার ও তত্ত্বাবধান এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের বিপণন সম্পর্কে কৃষককে সাহায্য করেন।

সেচ (Irrigation)

অনেক রাজ্যে সবুজ সার বা একই জমিতে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের জন্য স্বল্প মূল্যে সেচ জল সরবরাহ করা হয়। অনেক রাজ্যে ইহা বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

বীজ ক্ষেত্র (Seed Farms)*

স্বল্প উৎপাদনশীল এবং সহজে ভূপতিত ও রোগাক্রান্ত হয়, এই প্রকার পুরাতন জাতের সকল ইক্ষুর পরিবর্তে ভারতে বর্তমানে উন্নত জাতের ইক্ষু চাষ করা হইতেছে। ইহার ফলে গত বার বৎসরে দেশে চিনির উৎপাদন দ্বিগুণ হইয়াছে। অনুরূপভাবে অধিকাংশ তুলার জমিতে বর্তমানে উন্নত জাতের চাষ করা হইতেছে। ইহার ফলে ভারত তাহার তুলার চাহিদায় প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। দুইটি প্রধান খাদ্যশস্য ধান ও গমের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ স্থলে স্থানীয় জাতের পরিবর্তে উন্নত জাতের চাষ চলিতেছে। ফলে গত বার বৎসরে এ দুই শস্যের ফলন শতকরা পঁচিশ হইতে পঁয়ত্রিশ ভাগ বাড়িয়াছে। বর্তমানে সকল খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসল, পশুখাদ্য, ফল, সব্‌জি ও ফুলের উন্নত জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

উদ্ভিদ-প্রজননের (plant breeding) কাজে অনেক সময় লাগে এবং অনেক ক্ষেত্রে যেমন নারিকেলে বিশ বৎসর পর্যন্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। উন্নত জাত সৃষ্টি এই কাজের একটা দিক মাত্র। অন্যদিকে বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে এই বীজ পরিবর্ধন করিয়া বিতরণ করিতে না পারিলে সহজেই উন্নত জাতের উৎকর্ষ হ্রাস পায় এবং বহু বৎসরের পরিশ্রমের অপচয় হয়।

উদ্ভিদ প্রজননবিদের (plant breeder) হাতেই পরিবর্ধন ও বিতরণের কাজ আরম্ভ হয়। তিনি উৎকৃষ্ট গাছ হইতে মিশ্রণহীন, অঙ্কুরোদ্গমশীল, কীটশত্রু ও রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন করেন। ইহাকে **নিউক্লিয়স্‌ (প্রজনন-বিদের) বীজ** [nucleus (breeders') seed] বলা হয়। ভারতে

---

* **M. S. Pawar, Deputy Agricultural Commissioner, Ministry of Food and Agriculture, New Delhi প্রণীত।**

নিউক্লিয়স বীজ সাধারণতঃ সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্ধন করা হয়। নিউক্লিয়স বীজ যে জমিতে চাষ করা হয় সেখানে যাহাতে ঐ জাতের নিকৃষ্ট বীজের মিশ্রণ না ঘটে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। নিউক্লিয়স বীজ হইতে উৎপন্ন ফসল যত্নের সহিত সংগ্রহ করা হয় এবং অন্যান্য অবাঞ্ছিত গাছকে বাছিয়া ফেলা হয়। নিউক্লিয়স বীজের ফসল মাড়াই করিয়া যথা-যথভাবে শুষ্ক করা হয় এবং এমনভাবে গুদামজাত করা হয় যাহাতে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। এই নিউক্লিয়স বীজ অতঃপর দেশের সর্বত্র সরকারী বীজ কৃষিক্ষেত্র গুলিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

নিউক্লিয়স বীজ সরকারী বীজ কৃষিক্ষেত্রগুলিতে পরিবর্ধন করিয়া মূল বীজ বা **ফাউণ্ডেশন বীজ** (foundation seed) তৈয়ার করা হয় এবং সুপরি-কল্পিত নীতিতে **পঞ্জীভুক্ত কৃষকদের** মধ্যে ঐ বীজ বিতরণ করা হয়। এ সকল পঞ্জীভুক্ত কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত বীজ মিশ্রণ হইতে মুক্ত, অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা-সম্পন্ন, কীটশত্রু ও রোগমুক্ত হইলে উন্নত বীজরূপে বিক্রয় করা হয় এই উন্নত বীজ পুনরায় পরিবর্ধন করিয়া অন্যান্য গ্রামবাসীকে বিক্রয় করা হয়।

অনেক ক্ষেত্রে, যেমন ধানের বেলায়, একটি গ্রামে একাধিক জাত চাষ করার প্রয়োজন হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উঁচু জমিতে ঐ জমির উপযোগী জাতের আবশ্যক। নিচু জমির জন্য ভিন্ন জাতের প্রয়োজন। আবার সমুদ্রতটের নিকটবর্তী হইলে লবণ-সহিষ্ণু জাতের আবশ্যক। অথবা একই জমিতে একই বৎসরে দুই বা ততোধিক ফসল যেখানে চাষ করা হয় সেখানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফসলের জন্য বিভিন্ন জাতের প্রয়োজন হয়। আবার একই ঋতুতে কৃষক নিজের জন্য অধিক ফলন দেয় এরূপ মোটা ধানের চাষ করে এবং বিক্রয়ের জন্য সরু ধানের চাষ করে; কেননা সরু ধানে একর প্রতি চালের বেশি দাম পাওয়া যায়। এ সকল চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে প্রতি বৎসর বিভিন্ন জাতের ধানের বীজ সরবরাহ করিতে হয়।

ভারতের পাঁচ লক্ষ গ্রামের প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহ একটি বৃহৎ সমস্যা। সুষ্ঠু গুদামজাত করা, পরিবহণ এবং সময়মত গ্রামে গ্রামে উৎকৃষ্ট বীজ বিতরণ করিতে হইলে রাজ্যের কৃষিবিভাগের গঠন সুষ্ঠু হওয়া দরকার এবং কৃষকগণের স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতাও আবশ্যক। কৃষকদের সহযোগিতা অবশ্যই আছে এবং

তাহা আছে বলিয়াই বীজ পরিবর্ধন ও বিতরণের কাজ সুষ্ঠু ভাবে এবং সত্বর অগ্রসর হইতেছে। উদ্ভিদ প্রজননবিদের নিকট হইতে পর্যাপ্ত বীজ পাওয়া গেলে ভারতের পাঁচ লক্ষ গ্রামেই বীজ সরবরাহ করা হইবে। যথেষ্ট যত্ন সত্ত্বেও কৃষকের বীজ মিশ্রণ-প্রাপ্ত হয়। সেজন্য উচ্চ ফলন বজায় রাখিবার জন্য প্রতি তিন বা চারি বৎসর অন্তর স্থানীয় কৃষি আধিকারিকের নিকট হইতে নূতন বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে।

ঋণ (Credit)

অধিকাংশ রাজ্যে কৃষির কোন কোন উন্নত পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য স্বল্পহার সুদে কৃষককে ঋণ দেওয়া হয় এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া কিস্তিতে ইহা শোধ করা যায়। সরকারী ঋণ, যেমন তক্কভি (taccavi) ঋণ রাজস্ব বিভাগ হইতে পাওয়া যায়। সংস্থা উন্নয়ন আধিকারিক বা কৃষি বিভাগের মাধ্যমে দরখাস্ত করিয়া কৃষকগণ এই ঋণ পাইতে পারেন। অনেক সময় নগদ টাকা ঋণ না দিয়া, টাকার পরিবর্তে সার, বীজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দেওয়া হয়।

ঋণ ছাড়া কৃষির উন্নতির জন্য সরকার আর্থিক সাহায্যও (subsidy) করিয়া থাকেন। অনেক রাজ্যে কূপ খনন, খাল বা নালায় আড়াআড়ি বাঁধ দেওয়া, খামারের বর্জ্য দ্রব্যাদি হইতে কম্পোস্ট বা আবর্জনা সার তৈয়ারি, উন্নত জাতের পশু পালন, সেচের জল উত্তোলন ইত্যাদি কাজের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। সাহায্যের প্রকার ও পরিমাণ রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে ভিন্নতর। ইহা ছাড়া সমবায় বিভাগ কৃষককে আরও নানাপ্রকার ঋণ দিয়া থাকে।

সংক্ষিপ্তসার

উন্নত কৃষি প্রণালী সম্পর্কে নূতন নূতন তথ্য সরবরাহ করা দরকার। উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ সম্পর্কেও কৃষককে সাহায্য করা আবশ্যক। কৃষকের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সাহায্য দরকার। কৃষিক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য কৃষকের ঋণ দরকার।

গ্রাম সেবক, খাদ্য উৎপাদন সহকারী বা কৃষি প্রদর্শকগণ কৃষককে তথ্য সরবরাহ করিয়া থাকেন। কোন বিশেষ পরামর্শের আবশ্যক হইলে কৃষি বিভাগের বিশারদগণ তাহা সরবরাহ করেন। হাঁস-মুরগী, মেষ, গোমহিষাদির উন্নয়ন সম্পর্কে অনুরূপ সাহায্য পশুপালন বিভাগের বিভিন্ন আধিকারিকের নিকট হইতে পাওয়া যায়।

নানাভাবে কৃষককে সাহায্য করা হয়; সার, বীজ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সংস্থা উন্নয়ন আধিকারিকের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়।

মৃত্তিকা সংরক্ষণ, গভীর চাষ, কূপ খনন, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ ইত্যাদি কাজে রাজ্য সরকারের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সাহায্য কৃষক গ্রহণ করিতে পারে। গৃহপালিত পশুর চিকিৎসা পশুপালন ও পশুচিকিৎসা বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

অনেক রাজ্যে কৃষককে স্বল্পহার সুদে ঋণ সরবরাহ করা হয়। অনেক সময় ঋণ নগদ টাকার পরিবর্তে দ্রব্যাদির মাধ্যমে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন

১। কৃষক হিসাবে তোমার সব চাইতে জরুরী প্রয়োজন কি কি বলিয়া মনে হয়? তোমার ফসলের কীটশত্রুর প্রতিকারে তুমি কাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে?

২। পশুপালন ও পশুচিকিৎসা বিভাগ হইতে কৃষককে কি কি সাহায্য করা হয়?

৩। কৃষকের ঋণের প্রয়োজন হয় কেন? তোমার গ্রামে যদি সমবায় সমিতি থাকে, তবে তাহা হইতে তুমি কি কি প্রকার ঋণ পাইতে পার এবং ঐ ঋণের উদ্দেশ্য কি?

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্ভিদের গঠন (Plant Forms)

পৃথিবীতে মানুষ ও পশুর উৎপত্তির সময় হইতেই উদ্ভিদ তাহাদিগকে খাদ্য যোগাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সকল প্রাণীই প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে না। মাংসভোজী প্রাণীরা অপর প্রাণীর মাংস খায়; কিন্তু শেষোক্ত প্রাণীরা খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। কাজেই খাদ্যের জন্য মানুষসহ সকল প্রাণীই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। খাদ্য ছাড়া মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনসমূহ, যেমন বস্ত্র, আশ্রয়, ঔষধ এবং শিল্পের বহু কাঁচামাল প্রভৃতিও উদ্ভিদ মানুষকে সরবরাহ করে।

বাঁচিবার তাগিদে মানুষকে প্রকৃতির সকল সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে হয়। এই প্রচেষ্টায় সে প্রথমে বন্য উদ্ভিদ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিত; পরে স্বীয় পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের বাসগৃহের চতুর্দিকে শস্য উদ্ভিদ জন্মাইয়া খাদ্য সংগ্রহ করিত। কালক্রমে আদিম মানুষ জমি কর্ষণ করিল এবং সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ফসল জন্মাইল। ক্ষুদ্রাকারে উদ্ভিদের গৃহপালিতকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই প্রথা ধীরে ধীরে বৃহদাকারে ফসলের চাষে পরিণত হইল। অনুরূপভাবে মানুষ আদিম শিকারী হইতে পরিবর্তিত হইয়া পশুর প্রভু হইয়া বসিল। পশুকে পালন করিতে হইলে তাহাকে খাদ্য ও আশ্রয় দিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে মানুষকে কেবল নিজের জন্য খাদ্য উৎপাদন করিলেই চলিবে না, তাহার উপর নির্ভরশীল পশুগুলিরও খাদ্য উৎপন্ন করিতে হইবে। পৃথিবীর গৃহপালিত পশু ও লোক সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে, ফলে পশুখাদ্য ও মনুষ্য খাদ্যের চাহিদাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

চাষে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে উদ্ভিদ-বিদ্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। গ্রন্থকারগণ আশা করেন যে পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে উদ্ভিদ-বিদ্যা

সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে এবং এই জ্ঞানের সুপ্রয়োগে পশু ও শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। কেবল এই জ্ঞান প্রয়োগ করিয়াই মানুষ নিজের ও তাহার পশুর খাদ্য সংস্থান করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

উদ্ভিদ বিজ্ঞান (Plant Science)

যে বিজ্ঞানে উদ্ভিদ জীবন সম্পর্কে আলোচনা হয় তাহাকে বলা হয় **উদ্ভিদ-বিদ্যা** (Botany)। উদ্ভিদ-বিদ্যার বিভিন্ন দিক্ আছে, যেমন উদ্ভিদের গঠন (structure) ও অঙ্গসংস্থান, বৃদ্ধি, প্রজনন ও উদ্ভিদ উৎপাদন। শেষোক্তটিকে সাধারণভাবে বলা হয় ফসলের চাষ (crop farming)।

উদ্ভিদ তাহার আকৃতি, গঠন ও কার্য অনুসারে নানা প্রকৃতির হইতে পারে এবং এককোষী অদৃশ্য বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান ব্যাকটিরিয়া হইতে অরণ্যের বহুকোষী প্রকাণ্ড বৃক্ষ পর্যন্ত হইতে পারে। উক্ত দুই চরম পর্যায়ের উদ্ভিদের মধ্যবর্তী হইল শেওলা, ছত্রাক, মস (moss), লাইকেন (lichen), ফার্ন (fern), সাইক্যাড (cycad), সরলবর্গীয় বৃক্ষ (conifer) প্রভৃতি। নানা আকারের, নানা প্রকৃতির ও নানা কাজের উদ্ভিদ আছে। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত প্রায় সকল উদ্ভিদকেই মানুষ একভাবে বা অন্যভাবে কাজে লাগায়। উদ্ভিদের বিভিন্ন ব্যবহার ১নং তালিকায় প্রদত্ত হইল।

১নং তালিকা **কয়েকটি উদ্ভিদ ও তাহাদের ব্যবহার**

ব্যবহার	উদ্ভিদের নাম
খাদ্য	শস্য : চাউল, গম, জোয়ার, বাজরা, ছোলা
	তৈলবীজ : তিসি, চীনাবাদাম, সরিষা
	ফল : কলা, আম, লেবু
	সব্‌জি : আলু, টোম্যাটো, শিম, মটর, বাঁধাকপি, ফুলকপি, কুমড়া
শর্করা	আখ, সুগার বীট (sugar beet), তালগাছ
মশলা	গোলমরিচ, দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, আদা, পুদিনা (mint), জায়ফল (nutmeg)

ব্যবহার	উদ্ভিদের নাম
পানীয়	কফি, চা, কোকো
ভেষজ	সিংকোনা, পেনিসিলিন, আর্‌গট (ergot)
নিদ্রাকারক ঔষধ (narcotic)	তামাক, আফিম
সুগন্ধি দ্রব্য	গোলাপ, জুঁই, ল্যাভেণ্ডার (lavender)
বান তৈল (essential oil)	চন্দন, ইউক্যালিপ্‌টাস্ (eucalyptus), কর্পূর
রং (dye)	নীলগাছ, হেনা (henna), হলুদ
পশুখাদ্য	ঘাস : [গিনি (guinea), সুদান (sudan), এলিফ্যাণ্ট (elephant)]
	শিম্বিগোত্রীয় : [লুসার্ন (lucerne), বারসীম (berseem)]
তন্তু	তুলা. পাট, শণ
জ্বালানি	বাবুল (*Acacia*), ক্যাসুয়ারিনা (casuarina)
কাষ্ঠ (timber)	সেগুন, সাল, মেহগনি, পাইন, রোজ-উড্ (rosewood), আখরোট (walnut)

১নং তালিকায় দেখা যায় যে মানুষ উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থকে ১৩ প্রকারে ব্যবহার করে। এই সকল ব্যবহারগুলি হইল খাদ্য, শর্করা, মশলা, পানীয়, ভেসজ, নিদ্রাকারক ঔষধ, সুগন্ধি দ্রব্য, বান তৈল, রং, পশুখাদ্য, তন্তু, জ্বালানি ও কাষ্ঠ।

সজীব উদ্ভিদ ও তাহার বিভিন্ন অংশ
(The Living Plant and its Parts)

প্রত্যেক উদ্ভিদের দুইটি প্রধান অংশ থাকে **বিটপ** (shoot) যাহা মৃত্তিকার উপরে থাকে এবং **মূল** (root) যাহা মৃত্তিকার নিম্নে থাকে। বিটপ সাধারণতঃ সবুজ বর্ণের হয় এবং কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল—এই সকল অংশ লইয়া গঠিত। মূল সাধারণতঃ বর্ণহীন এবং প্রধান মূল, পার্শ্বীয় বা শাখা মূল ও মূল রোম (rootlets *or* root hairs) (চিত্র নং ১) লইয়া গঠিত। উদ্ভিদ দেহের
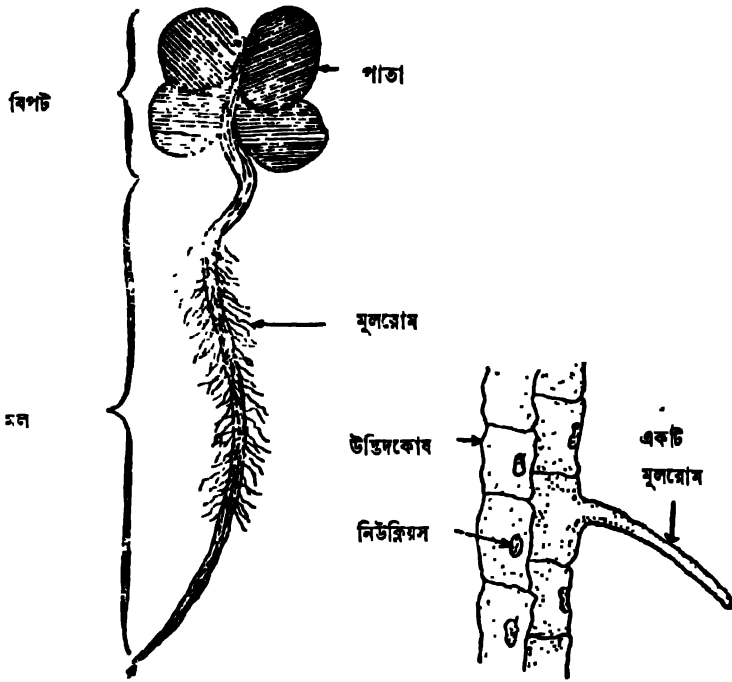
চিত্র নং ১। সরিষা গাছের মূল ও বিটপ (বামে)। মূলের বর্ধমান অংশ (Growing point) ও মূলরোম দেখানো হইয়াছে। (ডাইনে) একটি মূলকে বহুগুণ বর্ধিত করিয়া দেখানো হইয়াছে। ইহাতে উদ্ভিদ কোষ, নিউক্লিয়স ও একটি মূলরোম দেখা যাইতেছে।

[HAMMONDS AND WOODS হইতে পুনরঙ্কিত]

বিভিন্ন অংশের মধ্যে মূল, কাণ্ড ও পত্রকে **বর্ধনশীল অঙ্গ** (vegetative organs) ও ফুল, ফল ও বীজকে বলা হয় **জনন অঙ্গ** (reproductive organs)। বর্ধনশীল অঙ্গ উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্পর্কিত ; আর জনন অঙ্গ অনুকূল অবস্থায় বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে (চিত্র নং ২)।

বিটপের বিভিন্ন অংশের কার্য বিভিন্ন। কাণ্ড ও তাহার শাখাপ্রশাখা দুইটি কার্য করিয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহারা বিটপের অন্যান্য অংশগুলিকে ধারণ করে এবং ইহার ফলে পত্র আলোক ও বায়ুর সংস্পর্শে আসে যাহা উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ ইহারা বিভিন্ন পদার্থকে দ্রব অবস্থায় মূল হইতে
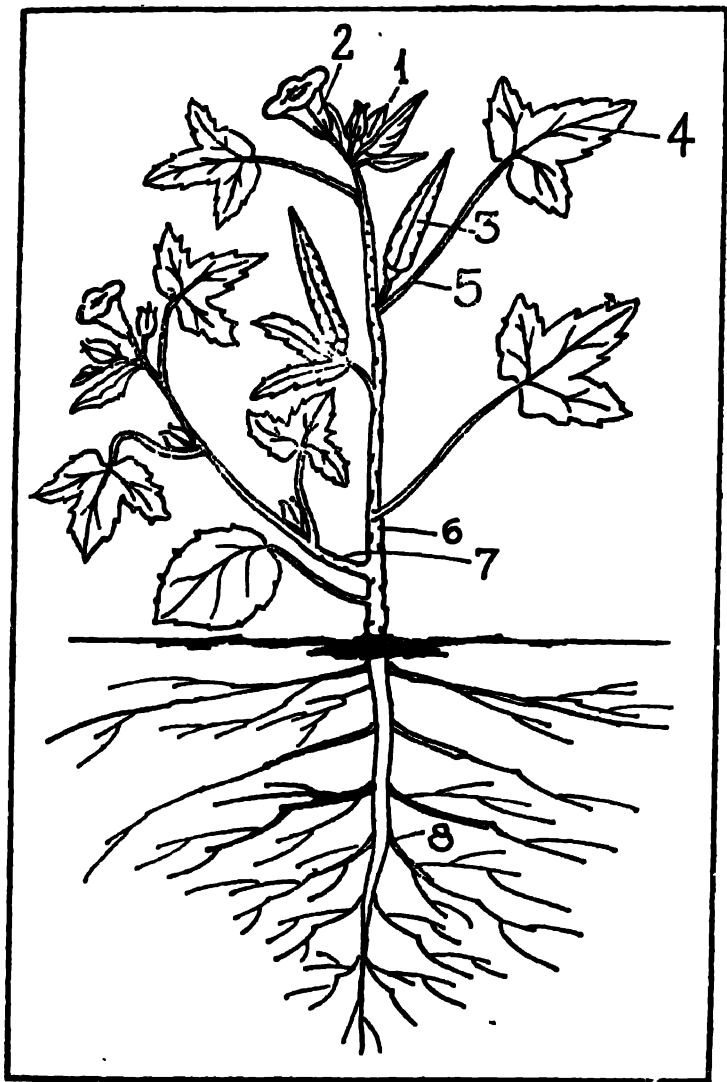
চিত্র নং ২। ঢেঁড়স গাছ ও তাহার বিভিন্ন অংশ। 1. মুকুল (bud), 2. পুষ্প, 3. ফল, 4. পত্র, 5. পত্রের বৃন্ত, 6. কাণ্ড, 7. শাখা, 8. মূল।

[H. R. ARAKERI মহাশয়ের সৌজন্যে]

পত্র ও অন্যান্য অংশে এবং পত্র হইতে পুনরায় মূলে পরিবহণ করিয়া লইয়া যায়। কাজেই ধারণ (support) ও পরিবহণ (conduction) কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখার দুইটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিণতির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রস্তুত পাতার কাজ। ফুলের মধ্যে থাকে জনন অঙ্গ যাহা হইতে ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়। বীজধারণ উদ্ভিদ-জীবনের চরম উদ্দেশ্য, কারণ বীজ হইতে নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

প্রধান মূল ও তাহার অসংখ্য শাখাপ্রশাখাসহ মূলতন্ত্র গাছকে দৃঢ়ভাবে মাটির সহিত আটকাইয়া রাখে। মূলের অসংখ্য শাখা যাহা সর্বশেষে অতি সূক্ষ্ম ও কোমল মূলরোমে বিভক্ত, মৃত্তিকা কণিকার নিবিড় সংস্পর্শে আসে। মৃত্তিকা কণিকার নিবিড় সংস্পর্শে আসিয়া মূলরোম মৃত্তিকার জলে দ্রব পদার্থ সমূহ হইতে বৃক্ষ খাদ্য মৌলসমূহ শোষণ (absorb) করে (চিত্র নং ৩)। কাজেই মাটির সহিত গাছকে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া রাখা ও শোষণ মূলের দুইটি প্রধান কার্য।
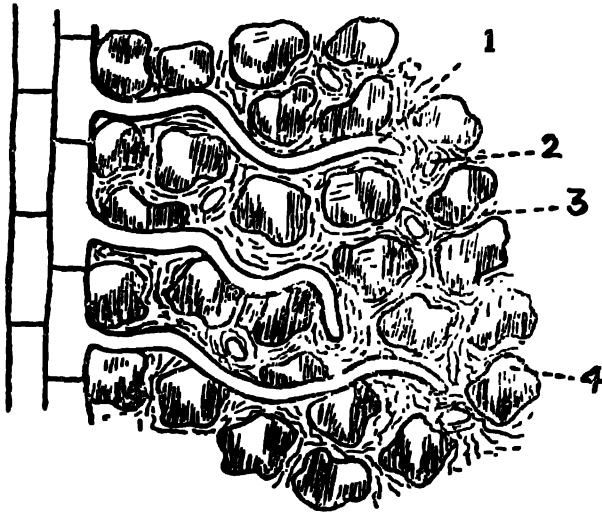
চিত্র নং ৩। মৃত্তিকা কণিকার মধ্যে বর্ধনশীল মূলরোম। 1. মূলরোম, 2. বায়ুরন্ধ্র, 3. জল, 4. মৃৎ কণিকা।

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

বীজ ও তাহার অংশ (Seed and Its Parts)

ফসলের বীজ একটি আবরণে আবৃত থাকে; এই আবরণ হইল খোসা (hull *or* lusk) অথবা শিম্ব (pod) (চিত্র নং ৪)। পরিপক্ক হইবার পর বীজগুলি মুক্ত হয় এবং অনুকূল অবস্থায় নূতন উদ্ভিদ সৃষ্টি করিতে পারে।

চিত্র নং ৪। বীজগুলি কিভাবে লাগিয়া থাকে তাহা শিমের একটি শিম্ব (pod) খুলিয়া দেখানো হইয়াছে।

[MARTIN and LEONARD হইতে পুনরঙ্কিত]

বীজ নিম্নলিখিত অংশগুলি লইয়া গঠিত; (১) **বীজত্বক** (seed coat), (২) **বীজপত্র** (cotyledon) ও (৩) **ভ্রূণ** (germ or embryo)। বীজত্বক বা **বীজ বহিস্ত্বক** (testa) বীজের অব্যক্ত অবস্থায় (dormant *or* resting stage) বীজকে রক্ষা করে। বীজপত্রের মধ্যে ভবিষ্যৎ চারার জন্য খাদ্য সঞ্চিত থাকে। অঙ্কুরোদ্গমের সময় ভ্রূণ এই খাদ্য ব্যবহার করে। অনুকূল অবস্থায় অঙ্কুরিত বীজের ভ্রূণ পরিণত হইয়া চারা সৃষ্টি করে। চারা হইতে পরিণত উদ্ভিদের (mature plant) সৃষ্টি হয়।

ভ্রূণের দুইটি অংশ: **ভ্রূণমুকুল** (plumule) বা অপরিণত প্রাথমিক বিটপ ও **ভ্রূণমূল** (radicle) বা অপরিণত প্রাথমিক মূল। । ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণমূল লইয়া **ভ্রূণাক্ষ** (primary axis of the embryonic plant) গঠিত।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি অনুসারে বীজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: (১) বীজপত্রের সংখ্যা, (২) অঙ্কুরোদ্গমের পর বীজপত্রের অবস্থান, ও (৩) সঞ্চিত খাদ্য কোন্ অংশে সঞ্চিত থাকে।

বীজে একটি বা দুইটি বীজপত্র থাকিতে পারে। একটি বীজপত্র থাকিলে সে উদ্ভিদকে বলা হয় **একবীজপত্রী** (monocotyledon) এবং দুইটি বীজপত্র থাকিলে সে উদ্ভিদকে বলা হয় **দ্বিবীজপত্রী** (dicotyledon) (চিত্র নং ৫)।
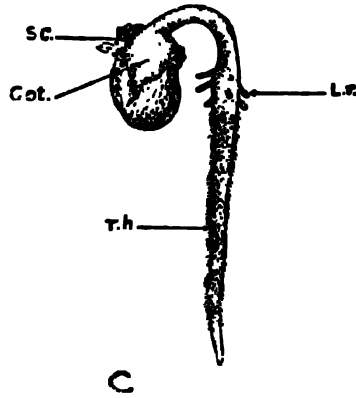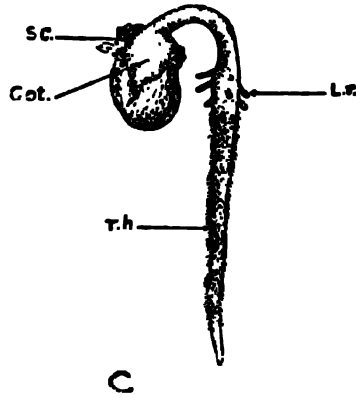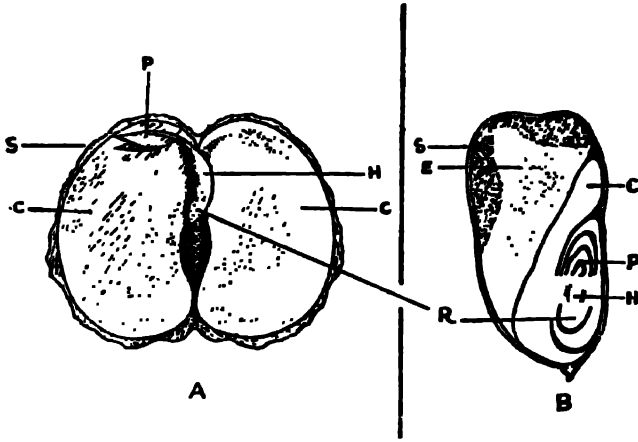
চিত্র নং ৫। বীজের গঠন

A. দ্বিবীজপত্রী বীজ (শিম)

C. বীজপত্র, S. বীজত্বক (বহিস্ত্বক), H. বীজপত্রাবকাণ্ড

P. ভ্রূণমুকুল (বিটপ) } ভ্রূণ
R. ভ্রূণমূল (মূল)

B. একবীজপত্রী বীজ (ভুট্টা)

S. স্কুটেলম E. সস্ত H. বীজপত্রাবকাণ্ড

P. ভ্রূণমুকুল (বিটপ) } ভ্রূণ
R. ভ্রূণমূল (মূল)

C. অঙ্কুরিত শিমবীজ ও তাহার অংশ

S.C. বীজত্বক, Cot. বীজপত্র, L.R. শাখামূল, r.h. মূল রোম

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

বীজের অঙ্কুরোদ্গম (Seed Germination)

শুষ্ক বীজে জীবন অব্যক্ত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। জলে ভিজাইলে বীজ, যেমন শিম বীজ জল শোষণ করে ও ফুলিয়া উঠে। বীজপত্র ফুলিবার ফলে এবং কাঠির ন্যায় ভ্রূণমূল দীর্ঘায়ত (elongated) হওয়ার ফলে কয়েকঘণ্টা পরেই বীজত্বক বিদীর্ণ হইয়া যায়। অব্যক্ত বীজের এইভাবে ব্যক্ত হওয়াকে বলা হয় অঙ্কুরোদ্গম। ভ্রূণমুকুল যাহা বীজপত্রদ্বয়ের মাঝে থাকে, বাড়িতে থাকে এবং বীজ হইতে নির্গত হয়, ব্যাহত (rudimentary) পত্র গঠিত করে এবং তাহা হইতে প্রথম পত্রযুগল বাহির হইয়া আসে। ভ্রূণাক্ষ দীর্ঘায়ত হইয়া প্রধান কাণ্ড গঠন করে। ভ্রূণমূল দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং প্রধান মূল গঠন করে। চারায় বীজপত্রের উপরে যে অংশ দীর্ঘায়ত হইয়া ভ্রূণ-মুকুলকে উপরে তুলে তাহাকে বলা হয় **বীজপত্রাধিকাণ্ড** (epicotyl)। বীজপত্রের নিচে যে অংশ বীজপত্রদ্বয়কে মাটি হইতে টানিয়া মাটির উপরে তুলিয়া আনে, তাহাকে বলা হয় **বীজপত্রাবকাণ্ড** (hypocotyl) (চিত্র নং ৬ ও ৭)।

বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য (১) জল (২) তাপমাত্রা ও (৩) অক্সিজেন —এই তিনটি পদার্থ আবশ্যক।

শুষ্ক বীজ চরম শীতাতপ সহ্য করিতে পারে, তাহাতে ভ্রূণের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা বিনষ্ট হয় না। অধিকাংশ শস্য ও শিম্বিগোত্রীয় উদ্ভিদের বীজ কয়েক বৎসর ধরিয়া গুদামজাত করিয়া রাখিলেও তাহাদের জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। জলের সংস্পর্শে আসিলেই বীজ অঙ্কুরিত হয় ও ভ্রূণ জাগিয়া উঠে।

বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা আবশ্যক। উচ্চ তাপমাত্রায় বৃদ্ধি দ্রুত হয়, কিন্তু তাপমাত্রা খুব বেশি হইলে বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া বীজ মারা যাইতে পারে। শৈত্য বৃদ্ধির গতিকে মন্থর করিয়া দেয় এবং অত্যধিক শৈত্যে বীজের অঙ্কুর আহত হইয়া অঙ্কুরোদ্গম ব্যাহত হইতে পারে।

বীজেরও শ্বাসক্রিয়া আছে, অর্থাৎ অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়িয়া দেয়, যদিও এই প্রক্রিয়া দুর্নিরীক্ষ্য। অক্সিজেনবিহীন বায়ুতে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। একটি ছোট থালায় অগভীর জলে বীজ রাখিলে তাহা অঙ্কুরিত হইবে, কিন্তু একটি বোতলের সকল বায়ু বাহির করিয়া সিদ্ধজলে
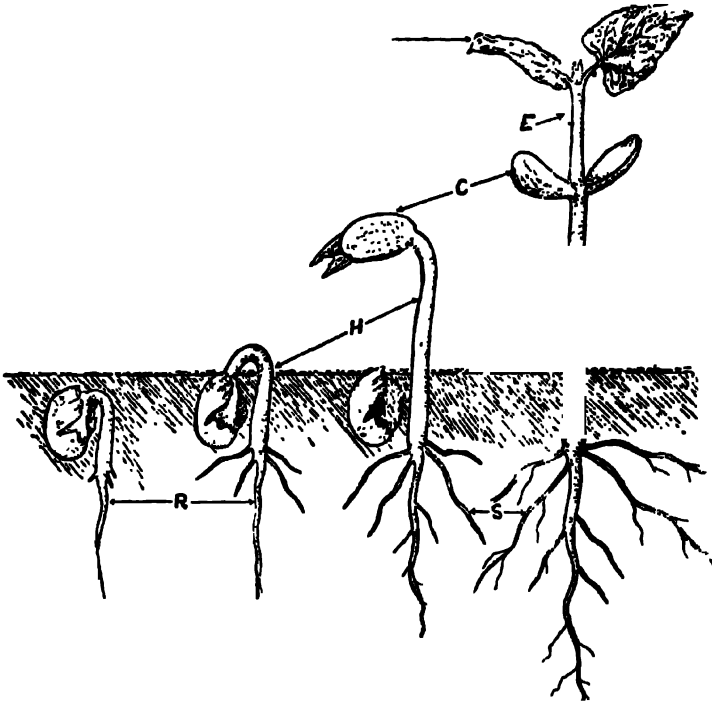
চিত্র নং ৬। শিমগাছের দ্বিবীজপত্রী বীজের অঙ্কুরোদগমের বিভিন্ন অবস্থা।
R. প্রাথমিক মূল (ভ্রূণমূল), H. বীজপত্রাবকাণ্ড, C. বীজপত্র, L. পত্র, S. মাধ্যমিক মূল
E. বীজপত্রাধিকাণ্ড
[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে বীজ রাখিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া দিলে বীজ অঙ্কুরিত হইবে না। (ইহা ক্লাসে পরীক্ষা করিয়া দেখানো যায়।)

বীজ পরীক্ষা (Seed Testing)

বীজ যদি ভাল না হয়, তাহা হইলে ভাল ফসল আশা করা যায় না। উত্তম ফলন সুনিশ্চিত করার জন্য বপনের পূর্বে বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা
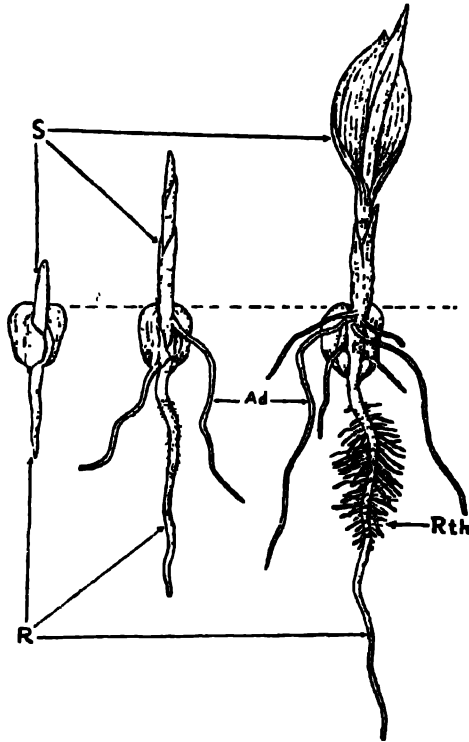
চিত্র নং ৭। ভুট্টাগাছের একবীজপত্রী বীজের অঙ্কুরোদ্গমের বিভিন্ন অবস্থা
S.—বিটপ (ভ্রূণমুকুল), R.—প্রাথমিক মূল (ভ্রূণমূল), Ad.—অস্থানিক মূল
Rth.—মূল রোম [ROY L. DONAHUE মহাশয়ের সৌজন্যে]

করা দরকার। যদি প্রত্যেক কৃষকের পক্ষে বীজ পরীক্ষা করা সম্ভব না হয়, তবে যেসকল বিশ্বাসী বিক্রেতা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিয়া বীজ বিক্রয় করে, কেবলমাত্র তাহাদের নিকট হইতেই বীজ ক্রয় করা উচিত।

নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলি হইতে বীজের উৎকর্ষ নির্ণয় করা যায়; (১) বিশুদ্ধতা (২) অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা, (৩) অঙ্কুরোদ্গমের গতি (৪) ওজন ও (৫) অন্যান্য লক্ষণ সমূহ, যেমন আকারের সমতা, বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্য, গন্ধ প্রভৃতির অভিন্নতা।

বিশুদ্ধতা

বীজের কোন নমুনায় নির্দিষ্ট ধরনের প্রকৃত বীজ ব্যতীত অন্য যে কোন পদার্থ অবিশুদ্ধ বস্তু। খোসা, ভুষি, খড়ের টুকরা, ধূলা, অন্য ফসলের বীজ, আগাছার বীজ প্রভৃতি সাধারণত অবিশুদ্ধ বস্তুর মধ্যে পড়ে। বিশুদ্ধতার শতকরা হার অনুসারে বীজের উৎকর্ষ নির্ভর করে। বিশুদ্ধতার হার নির্ণয়ের জন্য বীজের প্রতিনিধিমূলক একটি নমুনা লইয়া ওজন করা হয়। নমুনা হইতে সকল অবিশুদ্ধ বস্তু পৃথক করা হয় এবং তাহা ওজন করা হয়। ইহা হইতে বিশুদ্ধ বীজের ওজন পাওয়া যায় এবং বিশুদ্ধতার শতকরা হার নির্ণয় করা হয়।

অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা

অঙ্কুরিত হইয়া স্বাভাবিক চারা উৎপন্ন করিবার ক্ষমতাকে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা বলে। বীজের নমুনা বর্ণ, আকার, ঔজ্জ্বল্য, গন্ধ প্রভৃতিতে যতই অভিন্ন হউক না কেন তাহা অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা নির্দেশ করে না। উহা ভ্রূণের নির্দোষ অবস্থার উপর নির্ভর করে। ইহা নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় হইল বীজের কয়েকটি নমুনা বপন করিয়া ফলাফল পরীক্ষা করা। বিশুদ্ধ বীজের একটি নমুনা হইতে প্রতিভাগে ১০০টি করিয়া দুইভাগ বীজ লইয়া মাটির তৈয়ারি পাত্রের মধ্যে মাটিতে বপন করিতে হইবে এবং নিয়মিত জল প্রয়োগ করিতে হইবে। বপনের দিন হইতে দশ দিন ধরিয়া প্রতিদিন কয়টি বীজ অঙ্কুরিত হইল তাহার হিসাব রাখিতে হইবে এবং গণনার পর প্রতিদিন অঙ্কুরিত বীজগুলি সরাইয়া দিতে হইবে। দশ দিনে মোট যে কয়টি বীজ অঙ্কুরিত হইল তাহা হইতে অঙ্কু-রোদ্গমের শতকরা হার হিসাব করা যায়। দুই ভাগ বীজের গড় শতকরা হার হইতে মোট বীজের অঙ্কুরোদ্গমের শতকরা হার সম্পর্কে অধিকতর নির্ভরযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় (ক্লাসে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখানো যায়)।

নিম্নলিখিত কারণগুলি অঙ্কুরোদ্গমের নিম্ন হারের জন্য দায়ী : (১) অপরিণত বীজের উপস্থিতি। এ প্রকার বীজে ভ্রূণ পরিপূর্ণতা লাভ করে না। (২) ভ্রূণের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা বিলোপ। অতি পুরাতন বীজে ইহা ঘটিতে পারে। (৩) আহত ভ্রূণ।

বিশুদ্ধতা ও অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতার শতকরা হার হইতে উৎকৃষ্ট বীজের শতকরা হার নির্ণয় করা যায়। উদাহরণ—

বিশুদ্ধতার শতকরা হার ৯৮

অঙ্কুরোদ্গমের শতকরা হার ৯৪

উৎকৃষ্ট বীজের শতকরা হার=

$$\frac{\text{বিশুদ্ধতার শতকরা হার} \times \text{অঙ্কুরোদ্গমের শতকরা হার}}{১০০}$$

$$=\frac{৯৮ \times ৯৪}{১০০}$$

$$=৯২$$

অঙ্কুরোদ্গমের গতি

বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন একই প্রকার বীজের একই অবস্থায় অঙ্কুরোদ্গমের গতি বিভিন্ন হইতে পারে। বীজত্বকের পার্থক্য, বয়স, পরিপক্কতা বা অন্যান্য নানা কারণে এই পার্থক্য ঘটিতে পারে।

প্রজাতি (species) বিশেষে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময়ের মধ্যে তারতম্য ঘটিতে পারে। কোন প্রজাতির বীজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অঙ্কুরিত হয়, কোন প্রজাতির বীজ কয়েক দিনে অঙ্কুরিত হয়, আবার কোন প্রজাতির বীজ কয়েক মাসেও অঙ্কুরিত হয় না।

অভেদ্য বীজত্বক হেতু বীজের ভিতরে জল প্রবেশে বাধা অঙ্কুরোদ্গমের বিলম্বের কারণ হইতে পারে। বহু শিম্বিগোত্রীয় উদ্ভিদের বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় না এবং ইহাদিগকে 'কঠিন বীজ' (hard seed) বলা হয়। ভিজানোর সঙ্গে সঙ্গে কঠিন বীজ ফুলিয়া উঠে না। গরম জলে ভিজাইয়া বা রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে, যেমন বীজত্বক ঘষিয়া কঠিন বীজকে অঙ্কুরিত করা যায়।

ওজন

অসুস্থ বীজ অপেক্ষা সুস্থ বীজের ওজন বেশি। কুঞ্চিত ও দানাশূন্য বীজের ওজন হাল্কা। সাধারণতঃ জলে ডুবাইয়া সুস্থ ও অসুস্থ বীজ পৃথক

করা যায়। সুস্থ বীজ জলের নিচে ডুবিয়া যায় এবং অসুস্থ বীজ জলের ওপরে ভাসে। বপনের পূর্বে অসুস্থ বীজ পৃথক করিয়া লওয়া দরকার।

অন্যান্য লক্ষণ

অভিন্ন আকৃতি ও গঠন, বর্ণ, ঔজ্জ্বল্য ও তাজা গন্ধ বিশুদ্ধ ও সুস্থ বীজের লক্ষণ। পুরাতন ও রোগাক্রান্ত বীজের ঔজ্জ্বল্য থাকে না, বীজ কুঞ্চিত হইয়া যায় এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। সুস্থ বীজ পুষ্ট হয়, উহার বর্ণ উজ্জ্বল হয় এবং উহা হইতে তাজা গন্ধ পাওয়া যায়। বপনের পূর্বে বীজ বাছাই করার সময় উল্লিখিত লক্ষণগুলি ছাড়াও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে বীজের জাত লক্ষণ-গুলিও (varietal characters) যেন বীজে বজায় থাকে।

মূল (Root)

শিশু উদ্ভিদের ভ্রূণমূল দীর্ঘায়ত হইয়া **প্রধান** (primary) মূল গঠন করে। অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, ভ্রূণমূল অবশ্যই নিচের দিকে বৃদ্ধি পায় ও মাটিতে প্রবেশ করে। প্রাথমিক মূল কিছু লম্বা হইলে তাহা হইতে **শাখামূল** বা **গৌণমূল** (secondary roots) বাহির হয়। এই সকল মূল প্রধান মূলের সহিত সমকোণ করিয়া বা নিচের দিকে বৃদ্ধি পায়। এই সকল মূল হইতে পুনরায় শাখা নির্গত হইয়া মূলের জাল সৃষ্টি করে। মূলের সর্বশেষ প্রশাখা হইতে অসংখ্য রোমের ন্যায় সূক্ষ্ম ও কোমল অঙ্গ সৃষ্টি হয়। ইহাদের বলা হয় মূলরোম (root hairs)। উক্ত অঙ্গসমূহ লইয়া **মূলতন্ত্র** (root system) গঠিত।

মূলরোমগুলি মৃত্তিকা কণিকার নিবিড় সান্নিধ্যে আসে এবং মৃত্তিকা কণার মধ্যে যে জল থাকে তাহা শোষণ (absorb) করে। জল ও তাহাতে দ্রব পদার্থগুলি মূলরোম কর্তৃক শোষিত হইয়া কোষ হইতে কোষান্তরে চলিয়া গিয়া ক্ষুদ্র মূলে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মূলে এবং সর্বশেষে প্রধান মূলে উপনীত হয় এবং তথা হইতে বিশেষ পরিবহণ কলার মাধ্যমে উপর দিকে বাহিত হইয়া কাণ্ডে এবং সর্বশেষে পাতায় উপস্থিত হয়।

মূলাগ্র দীর্ঘায়ত হইয়া মূল বৃদ্ধি পায়; ইহা **মূলত্র** (root cap) নামক

চিত্র নং ৮। মূল তন্ত্রের তুলনা।
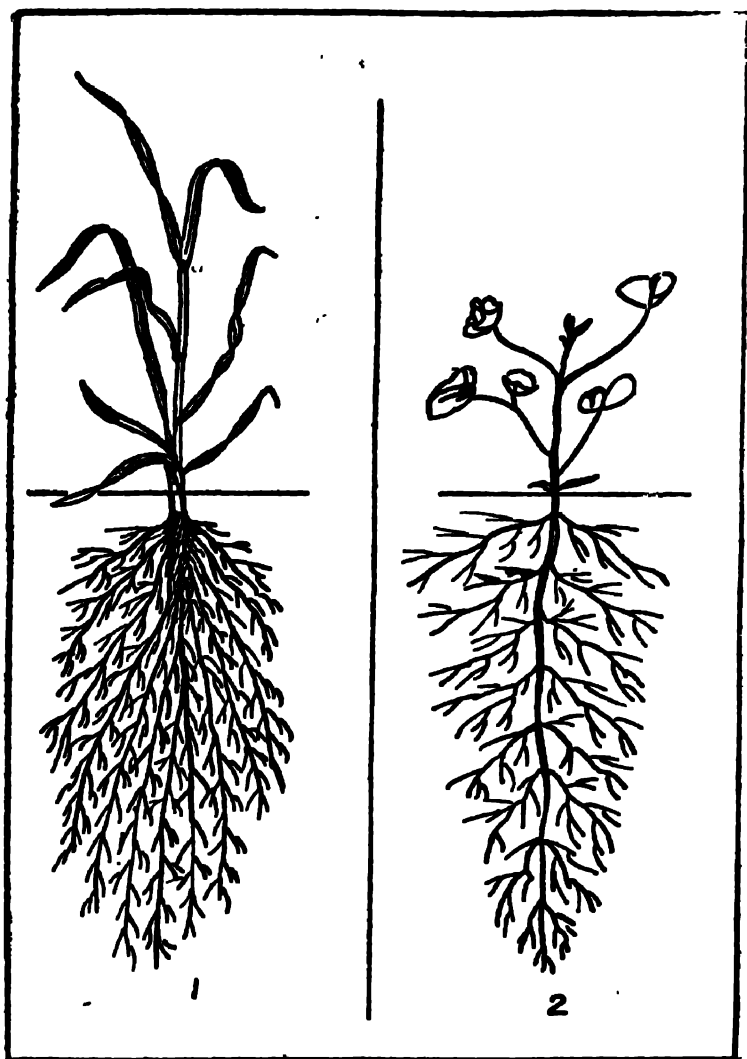
1. তন্তুল শস্য, যথা গম, ধান প্রভৃতি একবীজপত্রী উদ্ভিদের গুচ্ছমূল, 2. লুসার্ণ ও ছোলা ইত্যাদি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান মূল।

[H. R. ARAKERI মহাশয়ের সৌজন্যে]।

একটি আবরণে আবৃত থাকে। এই আবরণ কোমল বর্ধমান মূলাগ্রকে ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করে। অল্পবয়স্ক মূলগুলি মূলাগ্রের নিকটবর্তী থাকে এবং অধিক বয়স্ক মূলগুলি মূলাগ্র হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে থাকে।

শাখামূল (branch *or* lateral) প্রধান মূলের গাত্র হইতে সৃষ্ট হয় না ; ইহা প্রধান মূলের অভ্যন্তরস্থ কলা (tissue) হইতে উৎপন্ন হয়। কোন উদ্ভিদ যেমন, সরিষার পরিণত মূলকে লম্বালম্বি চিড়িয়া ফেলিলে দেখা যাইবে যে শাখামূলগুলি মূলের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়াছে।

দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলে স্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ, যেমন, শিম, চীনাবাদাম, লুসার্ন প্রভৃতি উদ্ভিদের একটি **প্রধান মূল** (tap root) থাকে এবং তাহা হইতে শাখামূলসমূহ নির্গত হয়। একবীজপত্রী উদ্ভিদ, যেমন, গম, ধান ও ভুট্টাতে প্রধান মূলের বৃদ্ধি সহসা বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার স্থলে একই আকারের এক গোছা মূল কাণ্ডের নিম্নভাগ হইতে নির্গত হয়। এই প্রকার মূলকে বলা হয় **গুচ্ছমূল** (fibrous root) (চিত্র নং ৮ ও ৯)।

গাছকে মাটির সহিত দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া রাখা এবং জল ও জলে দ্রব পদার্থ শোষণ করা ছাড়াও সঞ্চয়, ভার ধারণ, আরোহণ, 'শ্বাসক্রিয়া' প্রভৃতি কার্যও বিভিন্ন প্রকার মূলের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে।

অস্থানিক মূল (Adventitious or brace roots)

মূল সচরাচর কাণ্ডের নিম্নভাগ হইতে উৎপন্ন হয় ; কিন্তু ঐ স্থান হইতে নির্গত না হইয়া উদ্ভিদের অন্য অংশ, যেমন কাণ্ড বা পাতা হইতে যে সকল মূল নির্গত হয় তাহাদিগকে বলা হয় **অস্থানিক মূল**। এক বীজপত্রী উদ্ভিদ, যেমন, গম, ভুট্টা, আখ প্রভৃতিতে এই মূল সচরাচর দেখা যায়। শেষোক্ত ফসল দুইটিতে মাটির উপরিস্থিত পর্বগুলি হইতে অস্থানিক মূল নির্গত হয়। এই সকল মূল মাটির ভিতরে প্রবেশ করে এবং উদ্ভিদকে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করে। বৃহৎ অস্থানিক মূল কেয়া গাছ ও সমুদ্রতীরে যেখানে জোয়ার ভাঁটা হেতু জল উঠানামা করে সেই সকল স্থানের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য (চিত্র নং ৯ ও ১০)।

স্ফীত বা কন্দাল মূল (Fleshy or Tuberous Roots)

সময় সময় মূলে ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চিত থাকে। এই সকল মূল স্ফীত
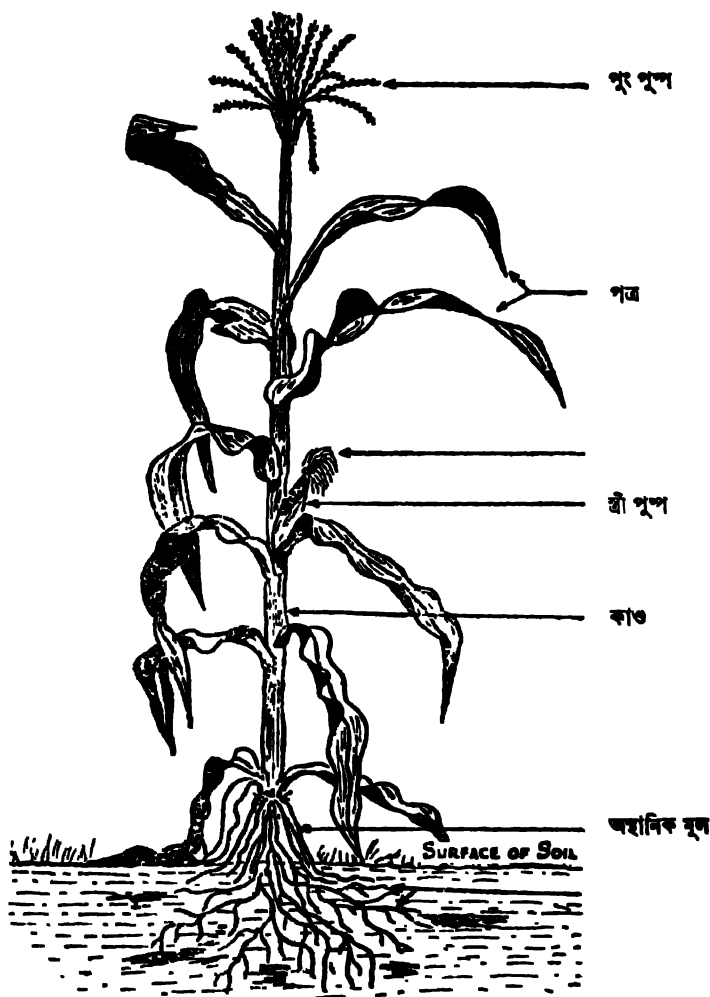
চিত্র নং ৯। একবীজপত্রী উদ্ভিদ, ভুট্টা গাছের অস্থানিক মূল (brace roots) ও প্রধান মূল রূপে গুচ্ছমূল [ROCKEFELLER FOUNDATION-এর সৌজন্যে]।

হইয়া বেশ বড় ও বিভিন্ন আকৃতির হয়। গাজর, মূলা, শালগম, ডালিয়া (dahlia), ট্যাপিওকা (tapioca) প্রভৃতি স্ফীত মূলের উদাহরণ (চিত্র নং ১১)।

আরোহী মূল (Clinging Roots)

এই প্রকার মূল সাধারণতঃ আরোহণকারী উদ্ভিদে (climbing plant) দেখা যায় এবং ঐ সকল উদ্ভিদের কাণ্ডের পর্বসন্ধি হইতে নির্গত হয়। ইহা কোন অবলম্বন, যেমন প্রাচীর, থাম বা বড় উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসিলে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরে এবং উদ্ভিদকে উপরের দিকে উঠিতে সাহায্য করে। গোল
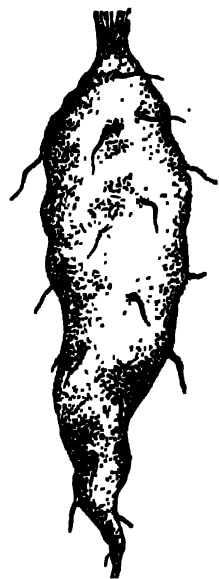
চিত্র নং ১০। কেয়া গাছের অস্থানিক মূল
[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

চিত্র নং ১১। ট্যাপিওকার কন্দাল মূল
[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

মরিচ (*Piper nigrum*) ও পান (*Piper betle*) হইল আরোহী মূল সম্পন্ন উদ্ভিদের উদাহরণ (চিত্র নং ১২)।

ঝুলন্ত মূল (Hanging Roots)

বৃহৎ বৃক্ষের শাখা হইতে এই প্রকার মূল উৎপন্ন হয় এবং মাটির দিকে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অনেক সময় ৩০ হইতে ৪০ ফুট উচ্চ শাখা হইতেও এই মূল উৎপন্ন হয়। মাটি স্পর্শ করিয়া ইহারা মাটির ভিতরে প্রবেশ করে এবং মাটির উপরের অংশ কাণ্ডের আকার ধারণ করিয়া যে শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার ভার ধারণ করে। এই প্রকার মূল বটগাছের বৈশিষ্ট্য। এ প্রকার মূল সৃষ্টির ফলে একটি গাছকে মনে হয় যেন বহু গাছ একস্থানে জন্মিয়াছে কিন্তু আসলে ঐগুলি পরিবর্তিত ঝুলন্ত মূল ছাড়া আর কিছুই নয়।
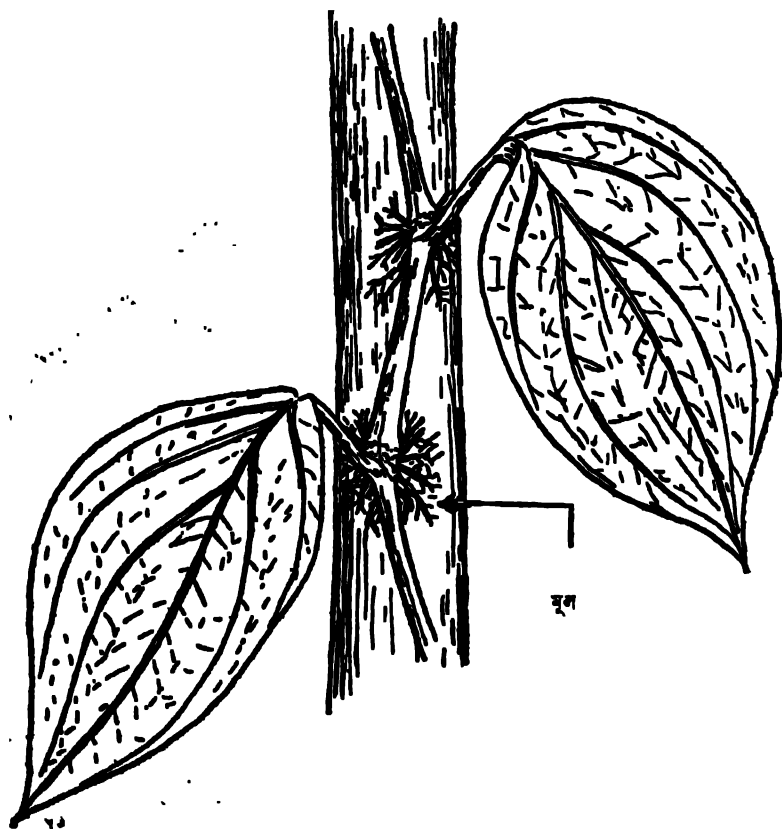
চিত্র নং ১২। পানের আরোহী মূল [L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

'শ্বাস' মূল (Breathing Roots)

শ্বাসমূল সমুদ্রোপকূলে লাবণিক জলাভূমির কিছু উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য মূল নিচে মাটির মধ্যে বৃদ্ধি পায়; কিন্তু এই মূল মাটি হইতে উপরের দিকে আলোক ও বায়ুর মধ্যে বৃদ্ধি পায়। ইহার অগ্রভাগে অসংখ্য ছিদ্র থাকে। উদ্ভিদ ঐ সকল ছিদ্রের সাহায্যে বায়ু গ্রহণ করিয়া শ্বাসকার্য চালায়।

কাণ্ড (Stem)

ভ্রূণমুকুল বা শিশু বিটপ পরিণত হইয়া প্রধান বিটপ তথা কাণ্ড গঠন করে। কাণ্ড পাতা (leaf) ধারণ করে। কাণ্ডের যে স্থানে পাতা সংযুক্ত থাকে তাহা অপেক্ষাকৃত স্থূল হয় এবং তাহাকে **পর্ব** (node or 'joint') বলে। দুইটি পর্বের মধ্যবর্তী অংশকে **পর্বমধ্য** (internode) বলে। উদ্ভিদ পরিণত হইলে ফুল ধারণ করে।

শিশু চারাগাছে প্রধান বিটপের অগ্রভাগে একটি **মুকুল** (bud) থাকে। ইহাতে **বর্ধনশীল অগ্র** (growing point), বহু সংক্ষিপ্ত পর্বমধ্য ও ব্যাপক পত্র থাকে। উদ্ভিদের যখন বৃদ্ধি হয় তখন সংক্ষিপ্ত কাণ্ড দীর্ঘায়িত হয়, অপরিণত পাতা পরিণতি লাভ করে। বর্ধনশীল অগ্র সর্বদাই অপরিণত থাকে এবং অবিরাম কাণ্ডের দৈর্ঘ্য ও পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলে। বর্ধনশীল অগ্র অতিশয় কোমল এবং উহা কয়েকটি পাতায় আবৃত থাকে। ক্ষুদ্রতম পাতাটি বর্ধনশীল অগ্রের নিকটতম স্থানে অবস্থিত থাকে।

মুকুল দুই প্রকার: **অগ্র্যমুকুল** (terminal bud) ও **পার্শ্বীয় মুকুল** (axillary or lateral buds)। কাণ্ড বা বিটপের অগ্রভাগে অগ্র্যমুকুল অবস্থিত থাকে। পার্শ্বীয় মুকুল পাতার কক্ষে অর্থাৎ পাতার নিম্নভাগ ও কাণ্ডের মধ্যে যে কোণের সৃষ্টি হয়, সে স্থানে জন্মায় (চিত্র নং ১৩)।

যে সকল মুকুল হইতে পাতা উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে বলা হয় **পত্রমুকুল** (leaf buds) এবং যে সকল মুকুল হইতে ফুল উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে বলা হয় **পুষ্পমুকুল** (flower buds)। মুকুল স্বাভাবিক স্থানে উৎপন্ন না হইয়া

কাণ্ডের অন্য কোন অংশে বা পাতা বা মূলের কোন অংশ হইতে উৎপন্ন হইলে তাহাকে **অস্থানিক মুকুল** (adventitious bud) বলা হয়।
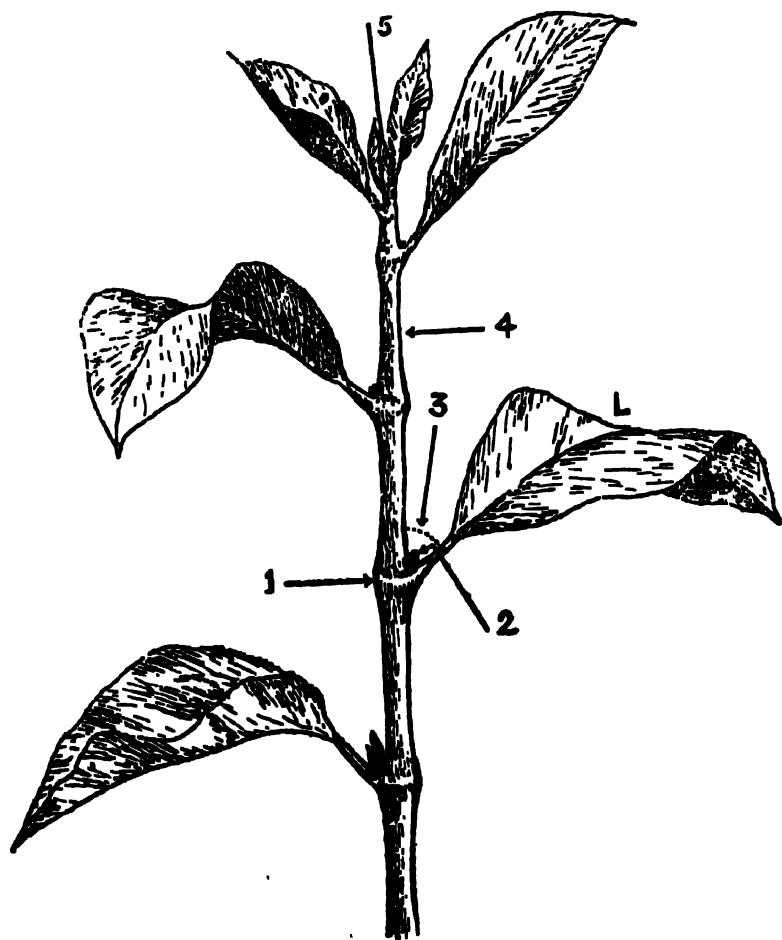
চিত্র নং ১৩। উদ্ভিদ শাখার বিভিন্ন অংশ।

1—পর্ব, 2—কাক্ষিক মুকুল, 3—পত্র কক্ষ, 4—পর্বমধ্য, 5—অগ্রমুকুল, L—পত্র।

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

উদ্ভিদের কাণ্ডকে নিম্নলিখিত শ্রেণীসমূহে বিভক্ত করা হয় :

বায়ব কাণ্ড (Aerial stems)

কোমল (herbacius)
কাষ্ঠল (woody)
রোহিণী (climbing)
ব্রততী (prostrate)
বল্লী (twining)

মৃদ্‌গত কাণ্ড (Underground stems)

রাইজোম (rhizome)
ঊর্ধ্বধাবক (sucker)
স্ফীতকন্দ (tuber)
কর্ম (corm)
কন্দ (bulb)

বায়ব কাণ্ড

মাটির উপরে যে সকল কাণ্ড বর্ধিত হয় তাহাদিগকে বায়ব কাণ্ড বলে।

কোমল কাণ্ড : এই প্রকার কাণ্ড সাধারণতঃ নরম ও সবুজ। যে সকল উদ্ভিদ এক ঋতু বাঁচে (বর্ষজীবী), সেই সকল উদ্ভিদে কোমল কাণ্ড দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরিয়া বাঁচে (বহুবর্ষজীবী), এইরূপ কিছু উদ্ভিদেও কোমল কাণ্ড থাকে। ধান, গম, জোয়ার ও অন্যান্য অধিকাংশ ফসল কোমল কাণ্ড-বিশিষ্ট উদ্ভিদের সাধারণ উদাহরণ।

কাষ্ঠল কাণ্ড : অনেক বৎসর ধরিয়া যে সকল উদ্ভিদ বাঁচে তাহাদের ভিতরে পর্যাপ্ত কাষ্ঠকলা গঠিত হইয়া তাহাদের কাণ্ডকে কাষ্ঠল ও শক্ত করিয়া তুলে। বৃক্ষ (trees) ও গুল্ম (shrubs) কাষ্ঠল কাণ্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদ। যে সকল গাছের একটি প্রধান কাণ্ড বা গুঁড়ি (trunk) থাকে এবং মাটি হইতে কিছু উপর পর্যন্ত ঐ কাণ্ডে কোন শাখা থাকে না তাহাকে বলা হয় বৃক্ষ। গুল্মে কোন নির্দিষ্ট প্রধান কাণ্ড থাকে না ; প্রাথমিক শাখাসমূহ প্রধান কাণ্ডের প্রায় সমান মোটা এবং মাটি ও গাছের সংযোগস্থল বা তাহার নিকটবর্তী কোন স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। কোন কোন উদ্ভিদের উপরের কিছুটা অংশ কোমল এবং নিচের অংশ কাষ্ঠল ও শক্ত হয়। উৎপন্ন হইবার পর কিছুদিন পর্যন্ত সকল কাণ্ডই কোমল থাকে। আম, নিম, সেগুন প্রভৃতি উদ্ভিদ বৃক্ষের উদাহরণ।

রোহিণী কাণ্ড : রোহিণী কাণ্ড সাধারণতঃ দুর্বল হয় এবং আলোক ও বায়ুর সংস্পর্শে আসার জন্য ইহা কোন অবলম্বনকে জড়াইয়া উপরের দিকে

বৃদ্ধি পায়। ইহারা আরোহী মূল, পাতার বৃন্ত (ঈশের মূল), শক্ত কন্টক (গোলাপ) বা **আকর্ষের** (tendril) সাহায্যে উপরে উঠে। আকর্ষ পরিবর্তিত পত্রবিশেষ (আঙ্গুর [গণ *Vitis*]) (চিত্র নং ১৪)।

ব্রততী কাণ্ড : অনেক গাছের দুর্বল কাণ্ড উপরে উঠিতে পারে না;

চিত্র নং ১৪। মটর গাছ, বায়ব রোহিণী কাণ্ডের (আকর্ষ) উদাহরণ।
1. উপপত্র, 2. ফল (শিম), 3. ফুল, 4. আরোহণের জন্য আকর্ষ।

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

ইহারা মাটিতে শুইয়া পড়ে এবং অনুভূমিকভাবে বৃদ্ধি পায়। কুম্মাণ্ড-গোত্রীয় সকল উদ্ভিদ, যেমন শশা, তরমুজ, লাউ প্রভৃতির কাণ্ড ব্রততী কাণ্ডের উদাহরণ।

বল্লী কাণ্ড: কোন কোন উদ্ভিদ সমগ্র কাণ্ডের সাহায্যে অবলম্বনকে জড়াইয়া উপরের দিকে উঠে। ইহাদের কিছু ডানদিকে জড়াইয়া উঠে, কিছু বামদিকে জড়াইয়া উঠে। খামালু (গণ *Dioscorea*) বল্লী কাণ্ডের উদাহরণ।

মৃদ্‌গত কাণ্ড

মৃদগত কাণ্ড মাটির নিচে বৃদ্ধি পায় এবং মূলের ন্যায় দেখিতে হয়। মূলের সহিত ইহাদের প্রভেদ হইল এই যে মৃদগত কাণ্ডের পত্র কক্ষ হইতে মুকুল নির্গত হয়। অবশ্য এই সকল মুকুলের রং বায়ব মুকুলের ন্যায় সবুজ হয় না।

রাইজোম (মূলাকার কাণ্ড) (root stock): মাটির নিচে অনুভূমিক ভাবে রাইজোম বৃদ্ধি পায়। আদা ও হলুদে যেমন দেখা যায়, ইহাদের পর্বমধ্য অতিশয় ছোট ও সংক্ষিপ্ত। শল্ক পত্রের (scale leaves) কক্ষ হইতে বিটপ উৎপন্ন হয় ও মাটির উপরে উঠিয়া আসে। পর্ব হইতে অস্থানিক মূল নির্গত হয়। অগ্র্যমুকুল বা পার্শ্বীয় মুকুল দ্বারা কাণ্ড বর্ধিত হয়। রাইজোমে খাদ্য সঞ্চিত থাকে (চিত্র নং ১৫)।

ঊর্ধ্বধাবক: ঊর্ধ্বধাবক একটি অস্থানিক বিটপ। ইহা মাটির ভিতর হইতে বৃক্ষ ও গুল্মের কাণ্ড বা মূল হইতে উৎপন্ন হয়। অস্থানিক কাণ্ড বা মূল, প্রধান উদ্ভিদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনভাবে বাঁচিতে পারে। ঊর্ধ্বধাবক খাদ্যের জন্য মাতৃ উদ্ভিদের সহিত প্রতিযোগিতা করে; কাজেই প্রয়োজনে না লাগিলে ইহাদিগকে অপসারণ করা আবশ্যক। উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির জন্য ঊর্ধ্বধাবক ব্যবহার করা যায়, যেমন, কলাগাছ।
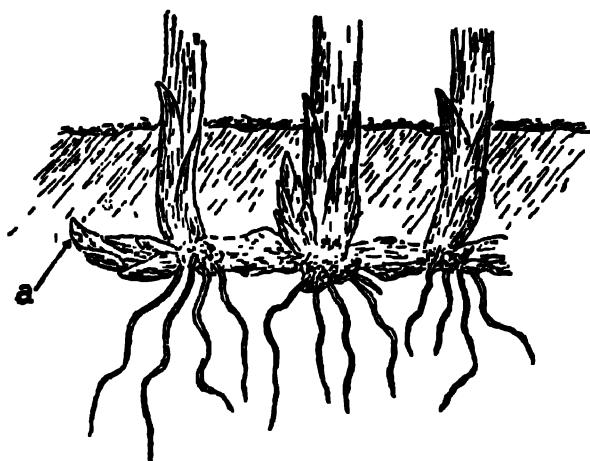
চিত্র নং ১৫। রাইজোম মৃদ্গত কাণ্ডের উদাহরণ। যেমন দুর্বা ঘাসে দেখা যায়।

a—রাইজোমের বর্ধনশীল অগ্র, 1—নবতম বিটপ, 2—সর্বাপেক্ষা বয়স্ক বিটপ, 3—অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বিটপ।

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

স্ফীতকন্দ: ইহা ছোট, মোটা ও স্ফীত মৃদ্গত কাণ্ড; ইহাতে অতি ক্ষুদ্র শল্কপত্র থাকে। ইহাদের মুকুল বা চক্ষু থাকে; এই সকল মুকুল বা চক্ষু পরিণত হইয়া বায়ব কাণ্ড উৎপন্ন করে। আলু স্ফীতকন্দের উৎকৃষ্ট উদাহরণ (চিত্র নং ১৬)।

কর্ম: ইহাও ছোট, মোটা ও স্ফীত কাণ্ড। ইহার গায়ে শল্কপত্র থাকে এবং গাত্র হইতে অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। ইহার অগ্রে একটি বা দুইটি মুকুল থাকে। ওল বড় কর্মের এবং কচু ছোট কর্মের উদাহরণ (চিত্র নং ১৭)।
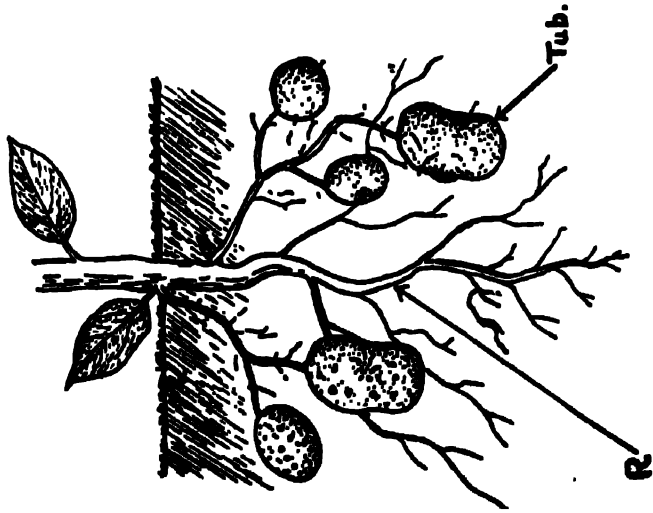
চিত্র নং ১৬। আলু স্ফীত কন্দের একটি উদাহরণ।
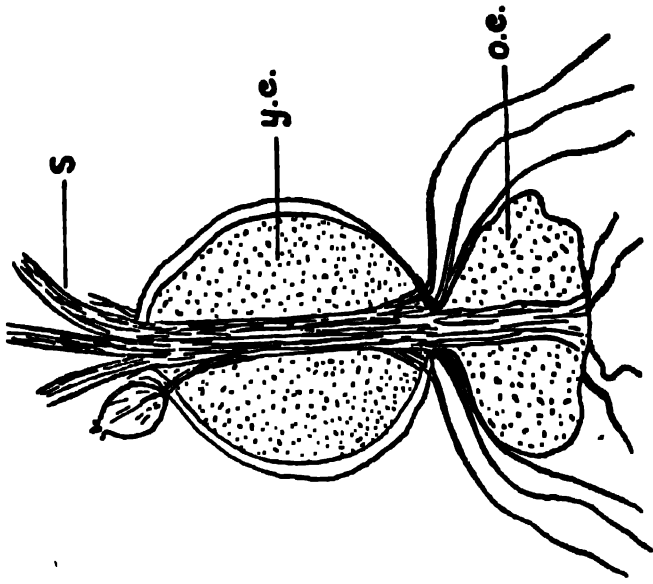
R—মূল, Tub—স্ফীতকন্দ।

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

চিত্র নং ১৭। এলিফ্যাণ্ট ফুট (Elephant foot) কর্মের একটি উদাহরণ (দীর্ঘজীবী)।

o. c.—পুরাতন কর্ম, y. c.—নূতন কর্ম, Sh.—বিটপ

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

কন্দ :—ইহার একটি চ্যাপ্‌টা চাকতির ন্যায় কাণ্ড থাকে। এই কাণ্ড হইতে কতকগুলি রসাল শল্কপত্র উৎপন্ন হইয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করে। খাদ্য সঞ্চিত থাকার জন্য শল্কপত্রগুলি পুরু ও রসাল হয়। এক বা একাধিক পার্শ্বীয় মুকুল সহ অপরিণত অগ্র্যমুকুল শল্কপত্রের মধ্যে আবৃত থাকে।

পিঁয়াজ ও রসুন কন্দের উদাহরণ (চিত্র নং ১৮)।

অধিকাংশ মৃদগত কাণ্ডে খাদ্য সঞ্চিত হয়। ইহা অব্যক্ত মুকুলকে প্রতিকূল অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে সাহায্য করে এবং অনুকূল অবস্থা আসিলেই বর্ধনশীল মুকুলকে খাদ্য যোগাইয়া নূতন উদ্ভিদ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

চিত্র নং ১৮। পিঁয়াজ কন্দের একটি উদাহরণ (দৈর্ঘ্যে উর্ধ্বাধিচ্ছেদ)
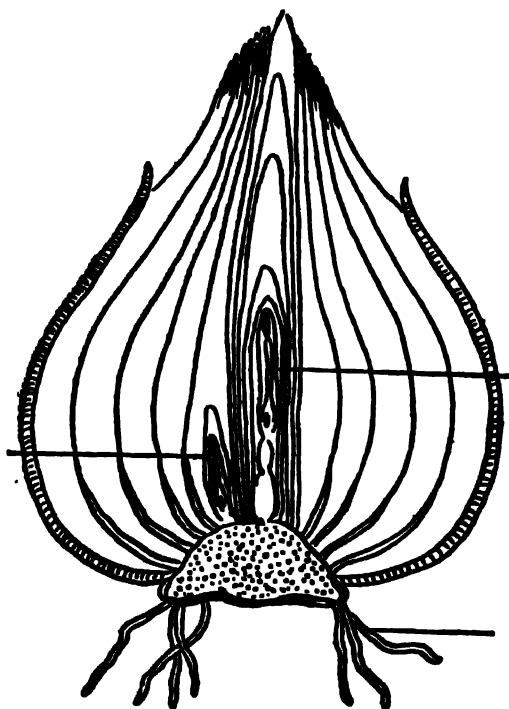
[PATERSON হইতে পুনরঙ্কিত]

পত্র (Leaf)

কাণ্ডের পর্ব হইতে পত্র উৎপন্ন হয় এবং সাধারণতঃ ইহার বর্ণ সবুজ। দণ্ড বা বৃন্ত (petiole) ; চ্যাপটা, চওড়া সবুজ অংশ বা ফলক (blade) ও নিম্ন অংশ যাহার সাহায্যে পত্র কাণ্ডের সহিত সংযুক্ত থাকে বা পত্রমূল (leaf base) লইয়া পত্র গঠিত। পত্রমূলে সাধারণতঃ উপপত্র (stipules) সংযুক্ত থাকে (চিত্র নং ১৯)।

পত্র দণ্ডের সাহায্যে কাণ্ডের সহিত সংযুক্ত থাকে। ফলকে শিরার (veins) জালিকা থাকে এবং শিরাসমূহের মধ্যবর্তী স্থান কোষ দ্বারা ভর্তি থাকে। এসকল কোষের মধ্যে ক্লোরোফিল (chlorophyll) নামক রঞ্জক থাকে।
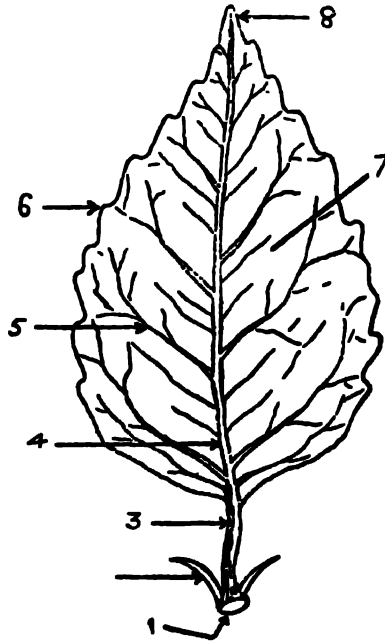
চিত্র নং ১৯। পাতার বিভিন্ন অংশ।

1—পত্রমূল, 2—উপপত্র, 3—বৃন্ত, 4—মধ্যশিরা, 5—শিরা, 6—প্রান্ত, 7—ফলক, 8—অগ্র।

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

উদ্ভিদের পত্র সমান্তরাল শিরাবিশিষ্ট (parallel veined) বা জালিকা শিরা-বিশিষ্ট (net veined) হইতে পারে। তণ্ডুল শস্য, জনার, ইক্ষু, ঘাস প্রভৃতি সকল একবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্র সমান্তরাল শিরাবিশিষ্ট; শিম্বিগোত্রীয়, তুলা, আম, নিম, গোলাপ প্রভৃতি সকল দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্র জালিকা শিরা-বিশিষ্ট (চিত্র নং ২০)। পাতার আকার, আয়তন, অগ্রভাগ, প্রান্ত, পুরুত্ব,
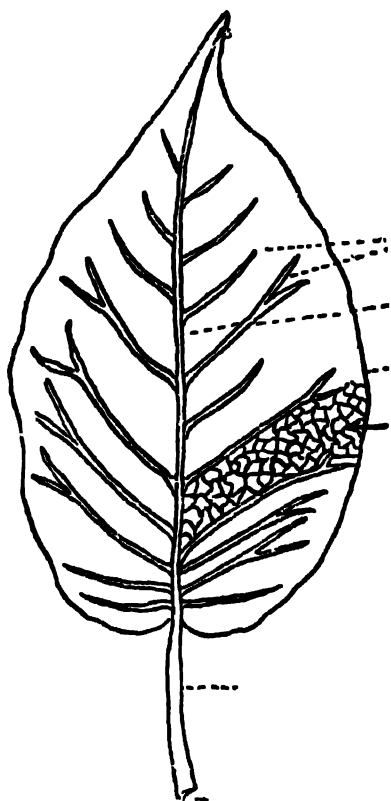
চিত্র নং ২০। বামে জালিকা শিরাবিশিষ্ট পাতা। শিম, তুলা, আম, নিম, গোলাপ প্রভৃতি উদ্ভিদে এই প্রকার শিরাবিন্যাস দেখা যায়। ডাইনে সমান্তরাল শিরাবিশিষ্ট পাতা। ভুট্টা জনার, আখ, ঘাস প্রভৃতি উদ্ভিদে এই প্রকার শিরাবিন্যাস দেখা যায়।

[HAMMONDS and WOODS : হইতে পুনরঙ্কিত]

খসখসে বা মোলায়েম ভাব প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন প্রকার এবং এজন্ত এই সকল বৈশিষ্ট্যগুলিকে উদ্ভিদ সনাক্তকরণে ব্যবহার করা হয়।

রূপান্তরিত পত্রসমূহ হইল: (১) বীজপত্র (cotyledons or seed leaves), (২) পুষ্পাধরপত্র (floral leaves), (৩) পত্রাকর্ষ (leaf tendrils) ও (৪) পত্রকণ্টক (leaf thorns)।

বীজপত্র: উদ্ভিদের ইহারাই প্রথম পত্র। ইহাদের মধ্যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে এবং বীজ অঙ্কুরোদ্গমের সময় বর্ধনশীল ভ্রূণ এই খাদ্য ব্যবহার করে।

পুষ্পাধরপত্র: ইহা পুষ্পের অংশ-বিশেষ এবং সাধারণতঃ উজ্জল ও আকর্ষণীয় বর্ণের হয়।

পত্রকণ্টক: অনেক সময় পত্র কণ্টকে রূপান্তরিত হইয়া উদ্ভিদের রক্ষক রূপে কাজ করে (চিত্র নং ২১)।
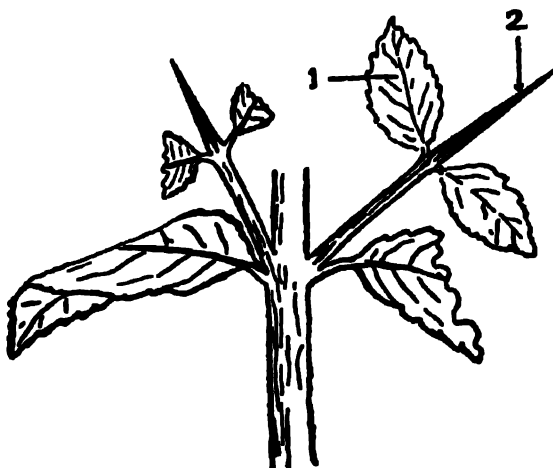
চিত্র নং ২১। পত্র কণ্টকের একটি উদাহরণ। 1—পত্র, 2—পত্রকণ্টক

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

পত্রাকর্ষ: অনেক সময় পত্র বা পত্রক (leaflets) আকর্ষে রূপান্তরিত হইয়া অবলম্বনকে জড়াইয়া বর্ধনশীল কাণ্ডকে খাড়া রাখিতে সহায়তা করে। মটর গাছ পত্রের আকর্ষে রূপান্তরের উদাহরণ (চিত্র নং ২২)।

চিত্র নং ২২। মটর গাছের সূতার ন্যায় রূপান্তরিত পত্র আকর্ষের একটি উদাহরণ।

[MEHTA : হইতে পুনরঙ্কিত।

পুষ্প (Flower)

পুষ্প জনন অঙ্গ ধারণ করে এবং এই অঙ্গ হইতে ফল, ফল হইতে বীজের উৎপত্তি ঘটে। আদর্শ ফুল একটি দণ্ড (stalk) বা বৃন্তের উপর উপস্থিত থাকে এবং বৃন্তটি পুষ্পকে অনুকূল অবস্থায় মেলিয়া ধরে। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগকে **পুষ্পাধার** (receptacle) বলে এবং ইহার উপরেই **বৃত্যংশ** (sepals), **পাপড়ি** (petals), **পুংকেশর** (stamens) ও **গর্ভকেশর** (pistil) আবর্ত বা এক-কেন্দ্রীয় চক্রাকারে (concentric rings) সন্নিবিষ্ট থাকে।

বৃত্যংশগুলি শব্দের ন্যায় ফুলের নিম্নভাগে অবস্থিত সবুজ অংশ বিশেষ এবং সবগুলিকে একত্রে বলা হয় **বৃতি** (calyx)। মুকুল অবস্থায় ইহারা পুষ্পের অন্যান্য অংশগুলিকে রক্ষা করে।

পাপড়িগুলি বৃতির অভ্যন্তরে চক্রাকারে সাজানো থাকে এবং ইহাদের সংখ্যা সর্বদাই বৃত্যংশের সংখ্যার সমান। পাপড়িগুলিকে একত্রে বলা হয় **দলমণ্ডল** (corolla)। পাপড়িগুলি সাধারণত রঙিন হয়। সাধারণভাবে বলা যায়, পাপড়ির রংই ফুলের রং।

পুংকেশরগুলি দলমণ্ডলের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকে এবং ইহাদের সংখ্যা কি প্রকার ফুল তাহার উপর নির্ভর করে। প্রতিটি পুংকেশর দেখিতে সরু দণ্ডের মত হয় এবং এই দণ্ডের অগ্রভাগ গোলাকার বা চ্যাপটা হয়। শেষোক্ত অংশকে বলা হয় **পরাগধানী** (anther)।

পুংকেশরের স্ফীত অগ্রভাগকে বলা হয় পরাগধানী এবং ইহার চারিটি কোটর থাকে ; ইহাদের বলা হয় **পরাগথলী** (pollen-sacs)। ইহাদের ভিতরে **পরাগরেণু** (pollen grains) (পুং অংশ) সৃষ্ট হয়। পরাগরেণুর আকার সাধারণতঃ গোলাকার বা ডিম্বাকার হয়। পরাগধানী পরিণতি লাভ করিলে বিদীর্ণ হইয়া পরাগরেণুকে মুক্ত করে।

গর্ভকেশর বা **গর্ভপত্র** (carpel) পুষ্পের কেন্দ্রে অবস্থিত থাকে। গর্ভকেশরের নিচের সামান্য স্ফীত অংশকে **ডিম্বাশয়** (ovary) বা বীজের বাক্স (seed box) বলা হয় ; ইহার মধ্যে অপরিণত বীজ বা **ডিম্বক** (ovule) থাকে। ইহা পুষ্পের স্ত্রী-অংশ। গর্ভাশয়ের উপরে সরু নলের মত অংশকে **গর্ভদণ্ড** (style) বলে। গর্ভদণ্ডের অগ্রভাগের স্ফীত অংশকে **গর্ভমুণ্ড** (stigma) বলে।

গর্ভকেশরের নিম্নভাগে বাক্সের ন্যায় অংশকে ডিম্বাশয় বলে এবং ইহার মধ্যে অপরিণত বীজ বা ডিম্বক গঠিত হয় (চিত্র নং ২৩)। বীজে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত ডিম্বাশয় ডিম্বককে রক্ষা করে। যথাসময়ে ডিম্বাশয় ফলে পরিণত হয় এবং ইহার মধ্যে পরিণত বীজ থাকে।

একই পুষ্পে পুংকেশর ও গর্ভকেশর উভয় অঙ্গ উপস্থিত থাকিলে পুষ্পকে **উভলিঙ্গ** (bisexual) বলা হয়। যখন কেবল পুংকেশর বা গর্ভকেশর থাকে তখন পুষ্পকে **একলিঙ্গ** (unisexual) বলে। একলিঙ্গ পুষ্প দুই প্রকার :
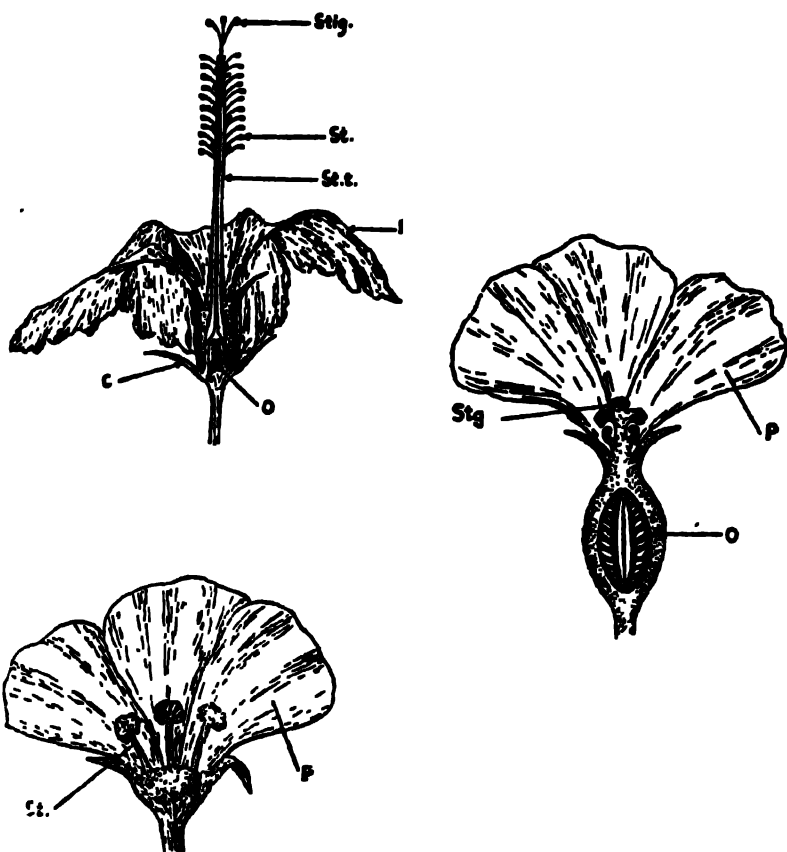
চিত্র নং ২৩। উপরে : জবার উভলিঙ্গ পুষ্পের দীর্ঘচ্ছেদ। Stig –গর্ভমুণ্ড, St—পুংকেশর
St.t.—পুংদণ্ড, P—পাপড়ি, o—ডিম্বকসহ ডিম্বাশয়, c—বৃতি।
নিচে : সহবাসী উদ্ভিদ শশার একলিঙ্গ পুষ্পের দীর্ঘচ্ছেদ।
বামে : পুংপুষ্প। Sk—পুংকেশর, P—পাপড়ি।
ডাইনে : স্ত্রীপুষ্প Stg.—গর্ভমুণ্ড, P—পাপড়ি, o—ডিম্বাশয়।
[L, S, S, KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

পুংপুষ্প (staminate or male flower) ও **স্ত্রীপুষ্প** (pistillate or female flower)। যদি স্ত্রীপুষ্প ও পুংপুষ্প উভয়ে একই উদ্ভিদে বর্তমান থাকে, তবে ঐ উদ্ভিদকে **সহবাসী** (monoecious) বলা হয়; যদি পুংপুষ্প

ও স্ত্রীপুষ্প বিভিন্ন উদ্ভিদে জন্মায় তবে ঐ উদ্ভিদগুলিকে **ভিন্নবাসী** (dioceous) বলে। গম, ধান, জোয়ার, আম, কমলালেবু, আঙ্গুর প্রভৃতি উভলিঙ্গ পুষ্পের উদাহরণ। ভুট্টা একলিঙ্গ পুষ্পের উদাহরণ। শশা, কুমড়া, করলা, চিচিঙ্গা প্রভৃতি সহবাসী উদ্ভিদের উদাহরণ। পেঁপে ও খেজুর গাছ ভিন্নবাসী উদ্ভিদের উদাহরণ (চিত্র নং ২৪)।

পুষ্পবিন্যাস (Inflorescence)

প্রধান কাণ্ডের অন্তে বা পার্শ্বে পাতার কক্ষে ফুল এককভাবে থাকিলে তাহাকে **একক** (solitary) ফুল বলা হয়। ইহারা যদি দলবদ্ধভাবে বিশেষ প্রকার দণ্ডের উপর অবস্থিত থাকে, তবে পুষ্পবিন্যাসের সৃষ্টি হয়। পুষ্পবিন্যাসে **মঞ্জরীপত্র** (bracts) নামক বিশেষ প্রকার পাতার কক্ষে এক এক একটি পুষ্প উৎপন্ন হয়। পুষ্পবিন্যাসের প্রধান দণ্ডকে বলা হয় **পুষ্পদণ্ড** (rachis or peduncle) এবং প্রত্যেক ফুলের বৃন্তকে বলা হয় **পুষ্পবৃন্তিকা** (pedicel)।

পুষ্পবিন্যাস দুই প্রকার : (১) **অনিয়ত** (indefinite or racemose) ; ইহাতে মঞ্জরীদণ্ড অনির্দিষ্টভাবে বাড়িতে থাকে এবং পার্শ্ব শাখায় ফুল উৎপন্ন হয়। (২) **নিয়ত** (definite or cymose) ; ইহার বৃদ্ধি নির্দিষ্ট এবং অগ্রভাগে একটি ফুল থাকে। অন্যান্য ফুল অগ্রভাগের নিচে পুষ্পদণ্ডের পার্শ্বে ফুটে।

অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস

অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসবিশিষ্ট উদ্ভিদসমূহকে নিম্নলিখিত পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

রেসীম (raceme)—পুষ্পদণ্ড দীর্ঘ হয় এবং পুষ্পবৃন্তিকার উপর ফুল হয়।

মঞ্জরী (spike)—পুষ্পদণ্ড দীর্ঘ হয় ; কিন্তু পুষ্পগুলি **বৃন্তহীন** (sessile)। উদাহরণ, গম।

কোরিম্ব (corymb)—পুষ্পদণ্ড দীর্ঘ হয় ; কিন্তু পুষ্পবৃন্তিকাগুলি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের হইয়া ফুলগুলি একই তলে (level) থাকে। সর্বনিম্ন পুষ্পবৃন্তিকা
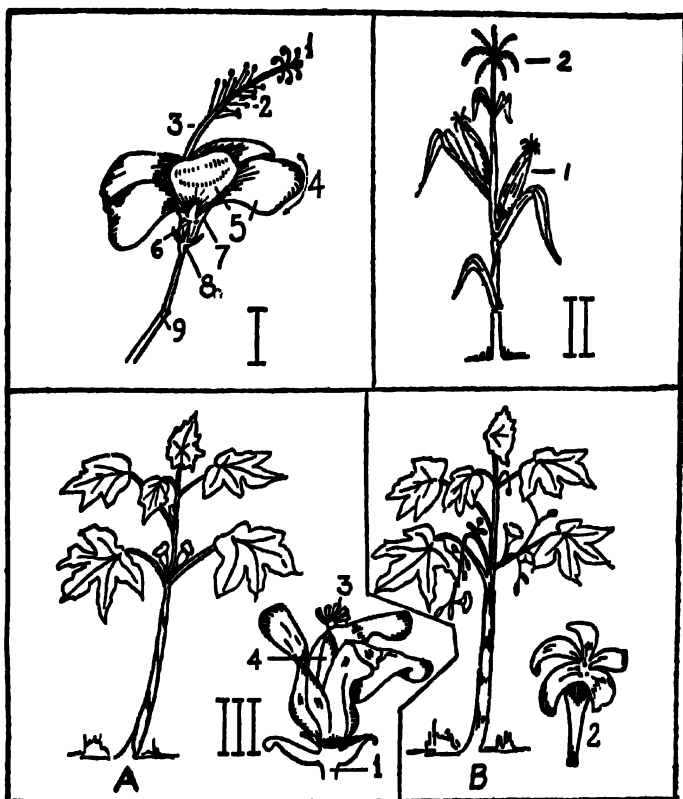
চিত্র নং ২৪। বিভিন্ন প্রকার পুষ্প।

(I) ধান, গম, ডাল শস্য প্রভৃতির উভলিঙ্গ পুষ্প। 1. গর্ভমুণ্ড, 2. পরাগধানী, 3. গর্ভদণ্ড, 4. দলমণ্ডল, 5. পাপড়ি, 6. বৃতি, 7. বৃত্যংশ, 8. পুষ্পাধার, 9. দণ্ড।

(II) সহবাসী উদ্ভিদ ভুট্টার একলিঙ্গ পুষ্প। 1. স্ত্রীপুষ্প (cob or ear) 2. পুংপুষ্প (রেশমী থোবা—tassel)।

(III) ভিন্নবাসী উদ্ভিদ পেঁপের একলিঙ্গ পুষ্প। A. কেবলমাত্র স্ত্রীপুষ্প ধারক পেঁপে গাছ। B. কেবলমাত্র পুংপুষ্প ধারক পেঁপে গাছ।

1. স্ত্রীপুষ্প, 2. পুংপুষ্প, 3. গর্ভমুণ্ড, ও 4. ডিম্বাশয়।

[H. R. ARAKERI মহাশয়ের সৌজন্যে]

দীর্ঘতম হয় এবং তৎপরবর্তী পুষ্পবৃন্তিকাগুলির দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃতভাবে কম হইতে থাকে।

ক্যাপিটিউলম বা হেড (capitulum or head)—পুষ্পদণ্ড এখানে মোটা ও চ্যাপটা ছোট থালার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং ইহার উপরে বৃন্তহীন পুষ্পগুলি সাজানো থাকে। কনিষ্ঠতম ফুল কেন্দ্রে অবস্থিত থাকে এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ফুল প্রান্তের নিকটবর্তী থাকে। উদাহরণ, সূর্যমুখী।

ছত্র (umbel)—পুষ্পদণ্ড ছোট এবং পুষ্পবৃন্তিকাগুলির দৈর্ঘ্য সমান।

নিয়ত পুষ্পবিন্যাস

নিয়ত পুষ্পবিন্যাস **একপার্শ্বীয়** (monochasium) হইতে পারে; ইহাতে প্রধান পুষ্পদণ্ডের একটি মাত্র পার্শ্বশাখা থাকে। অথবা **দ্বিপার্শ্বীয়** (dichasium) হইতে পারে; ইহাতে প্রধান পুষ্পদণ্ডের দুইটি পার্শ্বশাখা থাকে। এই পার্শ্বশাখার প্রত্যেকটির আবার দুইটি উপ-পার্শ্বশাখা থাকে (চিত্র নং ২৫)।

পরাগযোগ ও গর্ভাধান (Pollination and Fertilization)

বীজ উৎপাদনের পূর্বে উদ্ভিদে পরাগযোগ ও গর্ভাধান হয়। পরাগধানীর মধ্যে পরাগরেণু **পুং জনন কোষ** (male germ cell) ও ডিম্বাশয়ের মধ্যে ডিম্বক **স্ত্রী জনন কোষ** (fenmale germ cell) গঠন করে।

পরাগযোগ দুই প্রকার। একই ফুলের পরাগধানী হইতে পরাগরেণু সেই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হইলে তাহাকে বলা হয় **স্ব-পরাগযোগ** (self-pollination)। একই প্রজাতির একটি উদ্ভিদের ফুলের পরাগরেণু অপর একটি উদ্ভিদের গর্ভমুণ্ডে পৌঁছিলে **ইতর-পরাগযোগ** (cross-pollination) ঘটে। কোন কোন উদ্ভিদে পরাগযোগ না ঘটা পর্যন্ত পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় না; ফলে সেই সকল পুষ্পে কেবল স্ব-পরাগযোগই সম্ভব। ধান ও গমে স্ব-পরাগ যোগই নিয়ম। বায়ু, কীটপতঙ্গ, জল, শামুক, পাখি প্রভৃতির মাধ্যমে ফুলে ইতর-পরাগযোগ সংঘটিত হয়।

বায়ুপরাগী (wind pollinated) ফুলগুলি সাধারণতঃ ছোট হয় এবং ইহাদের বর্ণ ও গন্ধ স্বল্প পরিমাণে থাকে বা মোটেই থাকে না। এই সকল পুষ্পের পরাগরেণু শুষ্ক হয় এবং প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। গর্ভমুণ্ড পক্ষল হয় এবং পরাগরেণু ধরিবার উপযোগী হইয়া গঠিত হয়।
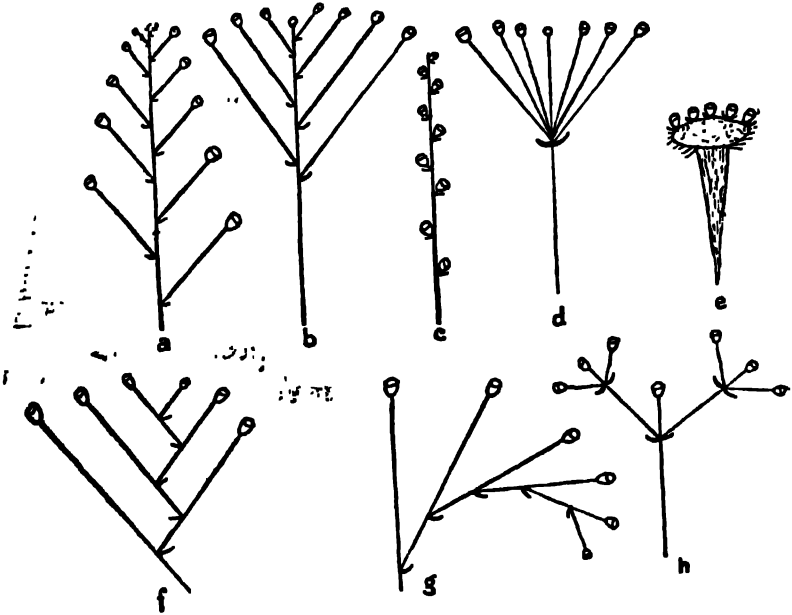
চিত্র নং ২৫। বিভিন্ন প্রকার পুষ্পবিন্যাস

অনিয়ত (উপরে):

a=রেসীম, b=কোরিম্ব, c=মঞ্জরী, d=ছত্র, e=ক্যাপিটিউলম।

নিয়ত (নিচে):

f=বৃশ্চিকাকার (scorpoid) }
g=শুণ্ডাকার (helicoid) } (একপার্শ্বীয়)

h=দ্বিপার্শ্বীয়।

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

পতঙ্গপরাগী (insect pollinated) ফুলগুলি সাধারণতঃ উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট ও গন্ধযুক্ত হয়। ইহাদের পাপড়ির নিম্নভাগে সাধারণতঃ মধুগ্রন্থি থাকে, ইহা হইতে মিষ্ট রস ক্ষরিত হয়। পরাগ আঠাল হয়; গর্ভমুণ্ডও এক প্রকার

আঠাল রস ক্ষরণ করে। এই রসে পরাগরেণু আটকাইয়া যায় ও অঙ্কুরিত হয়। মধুর সন্ধানে এক ফুল হইতে অন্য ফুলে যাইবার সময় অজানিতভাবে পতঙ্গগুলি পরাগরেণু স্থানান্তরিত করিয়া ইতর-পরাগযোগ ঘটায়। মৌমাছি, প্রজাপতি, মাছি, গুবরে পোকা, বোলতা প্রভৃতি পতঙ্গ ইতর-পরাগযোগে সাহায্য করে।
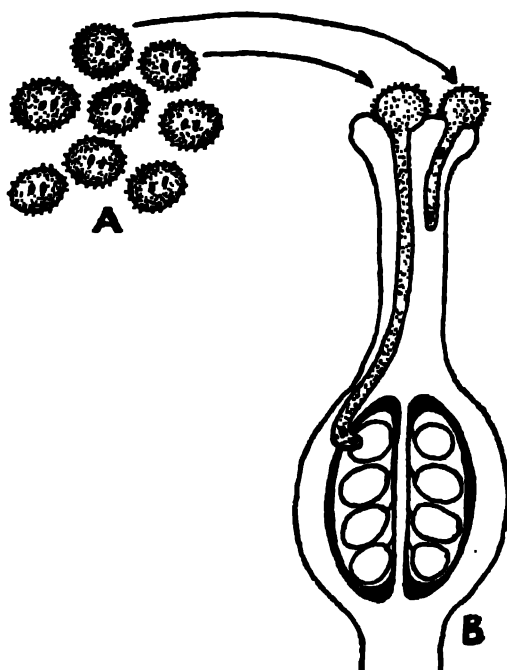
চিত্র নং ২৬। পুষ্পের গর্ভাধান প্রক্রিয়া।

A—পরাগ রেণু। (পুং কেশ)

B—স্ত্রী অংশের গর্ভমুণ্ডের ভিতর দিয়া পরাগ নলিকা (pollen tubes) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়া ডিম্বাশয়ে পৌঁছে। এখানেই গর্ভাধান প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় এবং ইহারই ফলে বীজ গঠিত হয়। প্রতিটি ডিম্বকের সহিত একটি পরাগরেণু মিলিত হইয়া বীজ গঠন করে।

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

গর্ভমুণ্ডে পৌঁছিবার পর পরাগরেণু অঙ্কুরিত হয় এবং একটি ছোট নল উৎপন্ন করে। এই নল গর্ভদণ্ড ও ডিম্বাশয়ের ভিতর দিয়া ডিম্বকে পৌঁছিয়া পুংজনন কোষ মুক্ত করে। ডিম্বকস্থ ভ্রূণস্থলীর (embryo sac) ভিতরে স্ত্রী জনন কোষ পরিণতি লাভ করে। পুং ও স্ত্রী জনন কোষ উভয়ে নিকটবর্তী হইলে পরস্পর মিলিত হয় এবং এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় গর্ভাধান। পুং জননকোষ কর্তৃক স্ত্রী জনন কোষের গর্ভাধানের ফলে **জাইগোট** (zygote) বা নিষিক্ত ডিম্ব গঠিত হয়। গর্ভাধানের উদ্দীপনায় ডিম্বক হইতে বীজ এবং ডিম্বাশয় হইতে ফল গঠিত হইতে সাহায্য করে (চিত্র নং ২৬)।

ফল (Fruit)

পরিণত ডিম্বাশয় হইল ফল এবং পরিণত ডিম্বক হইল বীজ। ডিম্বাশয়ের পরিপক্ব আবরণ ফলের **ফলত্বক** (pericarp) গঠন করে এবং ইহা ফল ও অভ্যন্তরস্থ বীজকে রক্ষা করে।

ফুলের বিভিন্ন রূপান্তরিত অংশ ভক্ষণীয় হইলেই আমরা ফল শব্দ প্রয়োগ করি। পরিপক্ব ডিম্বাশয় হইতে যাহা গঠিত হয় তাহাই হইল **প্রকৃত ফল** (true fruit), যেমন, টোম্যাটো, শসা, আম, আঙ্গুর প্রভৃতি। অন্যান্য অংশ হইতে যে সকল ভক্ষণীয় অংশ গঠিত হয় তাহাদিগকে **অপ্রকৃত ফল** (false fruit) বলে। আপেল, নাশপাতি, কাজুবাদাম প্রভৃতির ক্ষেত্রে পুষ্পাধারই তথাকথিত ফল গঠন করে (চিত্র নং ২৭)। ডুমুর, তুঁতফল, আনারস ও কাঁঠাল পুষ্পবিন্যাস হইতে গঠিত অপ্রকৃত ফল।

ফল **একক** (single) বা **গুচ্ছিত** (aggregate) হইতে পারে। আম একক ফল, কিন্তু আতা ও কাঁঠাল গুচ্ছিত ফল।

ফলকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) **নীরস** (dry) ও **সরস** (fleshy)। নীরস ফলকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (ক) **অবিদারী** (indehiscent), (খ) **বিদারী** (dehiscent) ও (গ) **ভেদক** (schizocarp)

অবিদারী নীরস ফল

এই শ্রেণীর ফলের ফলত্বক নীরস ও শক্ত হয় এবং কখনও ফাটে না। ফলত্বক পচিয়া গেলে বীজ মুক্ত হয়।

অবিদারী নীরস ফল নাট (nut), অ্যাকীন (achene), ক্যারিওপসিস (caryopsis) ও সামারা (samara)—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

নাট—শক্ত ও কাষ্ঠল ফলত্বকযুক্ত এক-বীজবিশিষ্ট ফল (কাজুবাদাম) (চিত্র নং ২৭)।
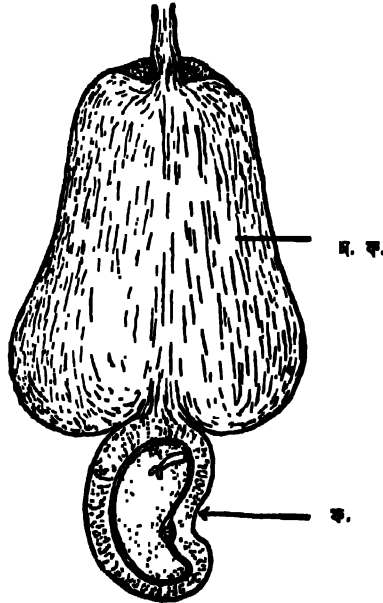
চিত্র নং ২৭। অ. ক. চিহ্নিত বৃহৎ স্ফীত অংশ কাজুবাদামের অপ্রকৃত ফল (পুষ্পাধার)। প্রকৃত ফল নিচে হয় এবং ক. চিহ্নিত (দীর্ঘচ্ছেদ) প্রকৃত ফল অবিদারী নীরস ফলের (নাট) একটি উদাহরণ [L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]।

অ্যাকীন—চামড়ার ন্যায় ফলত্বকযুক্ত এক-বীজবিশিষ্ট ফল। ফলত্বক ও বীজত্বক সম্পূর্ণ পৃথক থাকে (গোলাপ, সূর্যমুখী) (চিত্র নং ২৮)।

ক্যারিওপ্‌সিস—ইহা অ্যাকীনের মত, তবে ফলত্বক ও বীজত্বক যুক্ত থাকে (গম, ধান, ঘাসের বীজ) (চিত্র নং ২৯)।

চিত্র নং ২৮। A : সূর্যমুখীর ক্যাপিটিউলমের একটি রেখাচিত্রে তিনটি অ্যাকীন (এক বীজ বিশিষ্ট ফল)। পুষ্পাধার ও মঞ্জরী পত্রাবরণের (bracts of Involucre) পত্র দেখান হইয়াছে। ভারতের সমতল অঞ্চলে সূর্যমুখী যত্রতত্র দেখা যায়।

B : বাটারকাপ (buttercup) উদ্ভিদের একটি অ্যাকীনের (এক বীজবিশিষ্ট ফল) দীর্ঘচ্ছেদের রেখাচিত্র। উত্তর ভারতের শীত-প্রধান অঞ্চলে বাটারকাপ জন্মায়।

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

চিত্র নং ২৯। ধানের বীজ ক্যারিওপসিসের একটি উদাহরণ।

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]।

চিত্র নং ৩০। মটরের শিম, শিম্বিগোত্রীয় বিদারী নীরস ফলের একটি উদাহরণ। [PATERSON : হইতে পুনরঙ্কিত]।

চিত্র নং ৩১। বিদারী নীরস ফল, ফলিকলের উদাহরণ (ক্যালাট্রোপিস-প্রজাতি)।
[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

সামারা—ইহা পক্ষল অ্যাকীন বিশেষ। ফলত্বক চওড়া হইয়া পক্ষের মত হয় (মাধবীলতা) (চিত্র নং ৩৯)।

বিদারী নীরস ফল

বিদারী নীরস ফলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; (১) **শিম্ব** (legume), (২) **ফলিকল** (follicle) ও **ক্যাপসিউল** (capsule)।

শিম্ব—ইহা একটি মাত্র গর্ভপত্র হইতে জন্মে; ফল পাকিলে দুই সন্ধি বিদীর্ণ হয় (শিম, মটর) (চিত্র নং ৩০)।

ফলিকল—ইহাও একটিমাত্র গর্ভপত্র হইতে উৎপন্ন হয়; পাকিলে কেবল পুরঃসন্ধিতে বিদীর্ণ হয় [ক্যালাট্রোপিস (calatropis), ষ্টারকিউলিয়া (sterculia)] (চিত্র নং ৩১)।

ক্যাপসিউল—ইহা দুইটি বা ততোধিক যুক্তগর্ভপত্র হইতে জন্মে; ফল পাকিলে ফলত্বক নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে বা ছিদ্রের মাধ্যমে নানাভাবে বিদীর্ণ হয় (তুলা, জবা) (চিত্র নং ৩২)।

চিত্র নং ৩২। বিদারী নীরস ফল ক্যাপসিউলের উদাহরণ। বামে: জবা। ডাইনে: তুলার গুটি (boll)।

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

ভেদক ফল

ইহা যুক্ত গর্ভপত্র বিশিষ্ট গুচ্ছিত ফল। পাকিলে গর্ভপত্রগুলি পরস্পর পৃথক হইয়া যায়; কিন্তু বীজ মুক্ত করিবার জন্য বিদীর্ণ হয় না [ধনে, জপ-পিতরি (Abutilon), জিরেনিয়াম (Geranium)]।

সরস ফল

ড্রুপ (drupe)—ইহা একটি সরস ফল; কঠিন অন্তস্ত্বকের মধ্যে বীজ থাকে (আম, নারিকেল, বাদাম) (চিত্র নং ৭৩)।
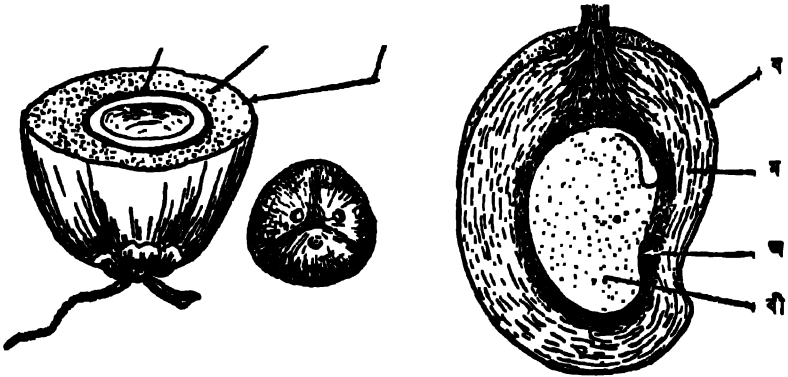
চিত্র নং ৭৩। নারিকেল ও আম ড্রুপের উদাহরণ।

বামে : নারিকেল (প্রস্থচ্ছেদ)। ব—বহিস্ত্বক (epicarp) (outerskin)। ম—মধ্যস্ত্বক (mesocarp) তন্তুময় (fibrous)। অ—অন্তস্ত্বক (endocarp) কঠিন।

মন্তব্য : কেন্দ্রের ছোট চিত্রে নারিকেল বীজের উপরের অংশ দেখানো হইয়াছে; গোলাকার ছিদ্র তিনটির যে কোন একটি দিয়া বিটপ বাহিরে আসে।

ডাইনে : আম (দীর্ঘচ্ছেদ)। ব—বহিস্ত্বক, ম—মধ্যস্ত্বক (সরস)। অ—অন্তস্ত্বক (কঠিন) বী—বীজ।

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

পোম (pome)—পুষ্পাধার স্ফীত ও রসাল হইয়া অপ্রকৃত ফল গঠন করে; গর্ভপত্র কেন্দ্রস্থলে থাকে (আপেল, নাশপাতি) (চিত্র নং ৩৪)।

বেরি (berry)—সরস শাঁসের ভিতরে কয়েকটি বা অনেকগুলি বীজ থাকে (আঙুর, টোম্যাটো, কলা) (চিত্র নং ৩৫)।
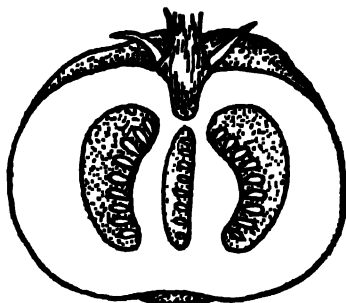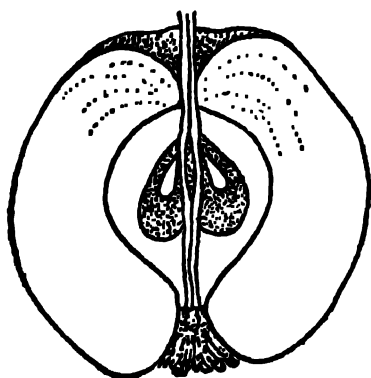
চিত্র নং ৩৪। আপেল (দীর্ঘচ্ছেদ) হইল পোমের একটি উদাহরণ।
[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]।

চিত্র নং ৩৫। টোম্যাটো (দীর্ঘচ্ছেদ) হইল বেরির উদাহরণ।
[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]
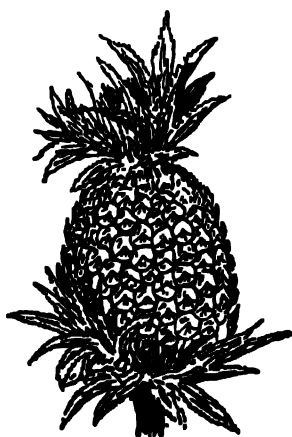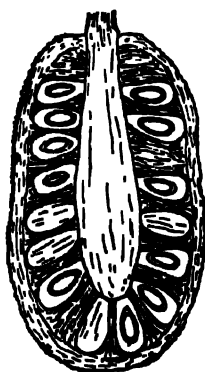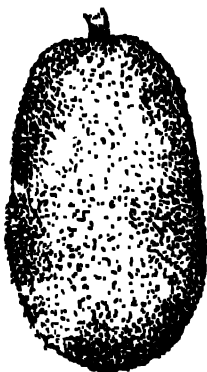
চিত্র নং ৩৬। কাঁঠাল ও আনারস গুচ্ছিত ফলের উদাহরণ।
বাঁয়ে: কাঁঠাল ফল (সমগ্র ফল), মধ্যে: কাঁঠাল ফলের দীর্ঘচ্ছেদ; ডাইনে: আনারস।
[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

গুচ্ছিত ফল—একই পুষ্পাধারের উপর এক গুচ্ছ ডিম্বাশয় হইতে উৎপন্ন হয়; পাকিবার পর ফলগুলি পৃথক হইয়া থাকে বা একত্র হইয়া যায়। ষ্ট্রবেরি (strawberry) একটি সরস ফল; ইহাতে পুষ্পাধার স্ফীত হইয়া সরস হয়। আনারস, তুঁতফল ও কাঁঠাল ফলে পৃথক কয়েকটি ফুলের ডিম্বাশয় একত্র হইয়া একটি যৌগিক (multiple) ফল গঠন করে (চিত্র নং ৩৬)।

বীজের বিস্তার (Seed Dispersal)

প্রধানত বায়ু, জল, জীবজন্তু ও শুঁটির সজোরে বিদারণ প্রভৃতির সাহায্যে ফল ও বীজ বিস্তার লাভ করে। কোন কোন নীরস ফল সজোরে ফাটিয়া যায় এবং বীজ দূরে নিক্ষিপ্ত হয় (চিত্র নং ৩৭)। কোন কোন ফলে পাখনার মত অংশ থাকে; বাতাসের সাহায্যে ইহারা বহুদূর বিস্তার লাভ করে (চিত্র নং ৩৮ ও ৩৯)। কোন কোন ফলের মধ্যত্বকের মধ্যে বায়ু আবদ্ধ থাকার ফলে ইহারা জলে ভাসে এবং ভাসমান অবস্থায় বহুদূরে চলিয়া যায়। কয়েক প্রকার ফলে আবার কাঁটা বা অঙ্কুশ থাকে; মানুষের পোশাকে বা পশুর লোমে আটকাইয়া ইহারা বহুদূরে স্থানান্তরিত হয় ও পরে ঝরিয়া পড়ে। পশু ও পাখি সরস ফল খায়; কিন্তু বীজ হজম হয় না, পাখি ও পশুর মলের সহিত উহারা সম্পূর্ণ অবিকৃত ও অঙ্কুরোদ্গমশীল অবস্থায় বাহির হইয়া আসে।
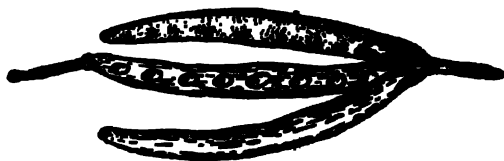
চিত্র নং ৩৭। সরিষার শুঁটি পাকিবার পর সজোরে বিদীর্ণ হয় ও বীজ বেশ কয়েক ফুট দূরে ছড়াইয়া পড়ে।

[L. S.S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]
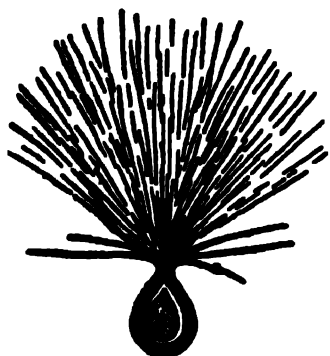
চিত্র নং ৩৮। বায়ুর সাহায্যে বিস্তৃত হইবার জন্য কোন কোন বীজে পালকের ন্যায় অংশ বিশেষ গঠিত হয় (ক্যালাট্রোপিস)

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

চিত্র নং ৩৯। বায়ুর সহায়তায় বিস্তার লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন বীজের বীজত্বক চ্যাপটা হইয়া পাখনার মত হয় (শর্জন)।

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

সংক্ষিপ্তসার

খাদ্যের প্রাথমিক উৎস হইল উদ্ভিদ ; কাজেই সকল সজীব প্রাণীর নিকটই উদ্ভিদের ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদ মানুষকে বস্ত্র, আশ্রয়, ঔষধ এবং শিল্প ও বাণিজ্যের কাঁচামালও সরবরাহ করে। মানুষ তাহার প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক উদ্ভিদসমূহের মধ্য হইতে সযত্নে বাছাই করিয়া দরকারী উদ্ভিদগুলিকে উন্নত করিয়াছে।

যে বিজ্ঞান উদ্ভিদ সম্পর্কে আলোচনা করে তাহার নাম **উদ্ভিদবিদ্যা** (botany)। উদ্ভিদের আকৃতি, গঠন ও কার্য সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞানকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। উদ্ভিদ সরলতম এক-কোষী ব্যাকটিরিয়া হইতে জটিল বহুকোষ সমন্বিত বৃহৎ বৃক্ষ পর্যন্ত হইতে পারে। এই দুই চরম পর্যায়ের উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্ন আচরণের বিভিন্ন প্রকার বহু উদ্ভিদ আছে।

উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের কার্যসমূহ হইল, মূল মাটি হইতে জল ও খাদ্য পদার্থ শোষণ করে এবং উদ্ভিদকে মাটির সহিত দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া রাখে, কাণ্ড বায়ব অংশসমূহ ধারণ করে এবং জল ও তাহাতে দ্রব পোষক পদার্থকে পাতায় বহন করিয়া লইয়া যায় ; উদ্ভিদের বর্ধমান অংশগুলির জন্য পাতায় খাদ্য তৈয়ারি হয় ; এবং ফুল হইতে বীজ ধারণকারী ফল উৎপন্ন হয়। ফল হইতে নূতন উদ্ভিদের জন্ম হয়। অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভিদ বীজরূপেই জীবন আরম্ভ করে এবং বীজরূপেই তার জীবনের অন্ত ঘটে।

উদ্ভিদ দেহ অসংখ্য কোষে বিভক্ত এবং কোষগুলিই হইল উদ্ভিদের কার্য ও গঠনের চরম একক। একই প্রকার গঠনবিশিষ্ট ও একই প্রকার কার্য করে এইরূপ অনেকগুলি কোষ লইয়া একটি কলা গঠিত হয়। বিভিন্ন কলা এক সঙ্গে উদ্ভিদদেহ গঠন করে।

বহু বিভিন্ন অংশ দ্বারা বীজ গঠিত ; ইহাদের মধ্যে ভ্রূণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উহাই হইল উদ্ভিদের সূক্ষ্ম সংস্করণ এবং অনুকূল অবস্থায় পরিণতি লাভ করিয়া উদ্ভিদ গঠন করে। বায়ু, জল ও তাপমাত্রা অঙ্কুরোদ্গমকে প্রভাবিত করে। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য ঐ তিনটির প্রত্যেকটিই ন্যূনতম পরিমাণে আবশ্যক।

কৃষিকার্যে বিশুদ্ধ, সুস্থ ও টাটকা বীজের প্রয়োজন। বীজ পরীক্ষা করিয়া এ সকল গুণ আছে কিনা তাহা জানা যায়।

ভার গ্রহণ, আরোহণ, সঞ্চয় ও শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্ত মূল পরিবর্তিত হয়, আরোহণ ও খাদ্যসম্ভার সঞ্চয়ের জন্ত কাণ্ড রূপান্তরিত হয়; রক্ষণ ও আরোহণে সাহায্যের জন্ত পত্র রূপান্তরিত হয়। পরাগযোগ ও গর্ভাধানে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ফুল প্রতিযোজিত (adapted) হয়। বিস্তার ও বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ফল ও বীজ প্রতিযোজিত হয়।

পরাগযোগ ও গর্ভাধানের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদের ফল ও বীজ গঠিত হয়।

প্রশ্ন

১। উদ্ভিদ মানুষের কি কি প্রয়োজনে লাগে ?

২। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ রূপান্তরিত হইয়া কি কি গঠন করে এবং কেন ?

৩। বীজ পরীক্ষার গুরুত্ব কি ? উত্তম বীজের বৈশিষ্ট্য কি কি ?

৪। মূল, কাণ্ড, পত্র, পুষ্প, ফল ও বীজের মুখ্য কার্য কি কি ?

৫। পরাগযোগ কাহাকে বলে ? বিভিন্ন প্রকার পরাগযোগের উল্লেখ কর। কি করিয়া এ সকল পরাগযোগ সংঘটিত হয় ?

৬। গর্ভাধান কি ? ইহার প্রয়োজনীয়তা কি ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

উদ্ভিদ জীবন (Plant Life)

উদ্ভিদ একটি কর্মচঞ্চল জীব এবং ইহার মধ্যে অবিরাম নানাপ্রকার কার্য সংঘটিত হইতেছে। এ সকল কার্য উদ্ভিদের বৃদ্ধি, পরিণতি ও জনন সম্পর্কিত এবং **সজীব প্রোটোপ্লাজমের** (living protoplasm) উপর নির্ভরশীল। প্রোটোপ্লাজমকে "জীবনের মূল ভিত্তি" (the physical basis of life) বলিয়া অভিহিত করা হয়। বায়ু, জল, আলোক, তাপমাত্রা ও মাটির সহিত প্রোটোপ্লাজমের সক্রিয়তা উদ্ভিদে প্রাণ বজায় রাখার জন্য দায়ী। এই সকল অপরিহার্য কর্মতৎপরতা বন্ধ হইয়া গেলে উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটে (চিত্র নং ৪০ ও ৪১)।

শোষণ (Absorption)

উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় পোষক মৌল মূলের মাধ্যমে তরল অবস্থায় শোষণ করে এবং গ্যাসীয় ও তরল অবস্থায় পাতার মধ্য দিয়া শোষণ করে।

বর্ধিষ্ণু উদ্ভিদ বায়ু হইতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পায় এবং জল হইতে হাইড্রোজেন গ্রহণ করে। নাইট্রোজেন, ফসফোরাস, পটাশিয়ম, ক্যালসিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম, সালফার, আইরণ এবং অন্যান্য মৌল উদ্ভিদ মৃত্তিকার জল হইতে গ্রহণ করে এবং **অস্‌মোসিস** (osmosis) প্রক্রিয়ায় মূলরোমের সাহায্যে শোষণ করে।

কোষ যখন জলে পূর্ণ হয়, তখন কোষপ্রাচীর প্রসারিত হয় এবং কোষকে **রসস্ফীত** (turgid) বলা হয়। এই রসস্ফীতির ফলেই উদ্ভিদের সরস অংশ, যেমন পত্র, পুষ্প, কোমল বিটপ প্রভৃতি তাহাদের আকৃতি ও গঠন বজায় রাখিতে পারে। উদ্ভিদ হইতে জল অতিরিক্ত পরিমাণে বহিষ্কৃত হইলে কোষ সমূহের রসস্ফীতি হ্রাস পায়; ফলে পত্র, পুষ্প ও বিটপ শুকাইয়া নেতাইয়া

সজীব উদ্ভিদকে একটি বৃহৎ অস্‌মোটিক্‌ চাপ (osmotic pressure) তন্ত্ররূপে মনে করা যায় এবং উদ্ভিদের অসংখ্য কোষসমষ্টির প্রত্যেকটি এই তন্ত্রের একক-বিশেষ। যে সকল অংশ, যেমন মূল, কাণ্ড, শাখা ও পত্র প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্ভিদ তরল পদার্থ শোষণ করে, সেই সকল অংশের কোষের সেলু-লোজ (cellulose) দ্বারা গঠিত কোষ প্রাচীর ভেদ্য ঝিল্লীরূপে (as a perme-

চিত্র নং ৪০। সবুজ পত্রের সজীব কোষ (বহুগুণ বর্ধিত)।
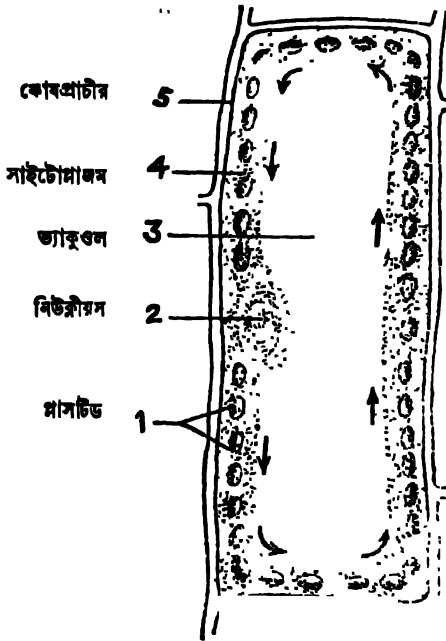
কোষপ্রাচীর (cell wall)—ইহা কোষকে রক্ষা করে,
সাইটোপ্লাজম (cytoplasm)—কোষের থকথকে সজীব পদার্থ;
ভ্যাকুওল (vacuole)—কোষের সাইটোপ্লাজমের ভিতরে রন্ধ্র বিশেষ;
নিউক্লীয়স (nucleus)—কোষের প্রাণকেন্দ্র;
প্লাসটিড (plastid) সবুজ পদার্থ, ইহা খাদ্য তৈয়ারি করে।
সজীব কোষের পদার্থগুলি যে অবিরত আবর্তিত হইতেছে তাহা তীরচিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে।

[MILLER : হইতে পুনরঙ্কিত।]
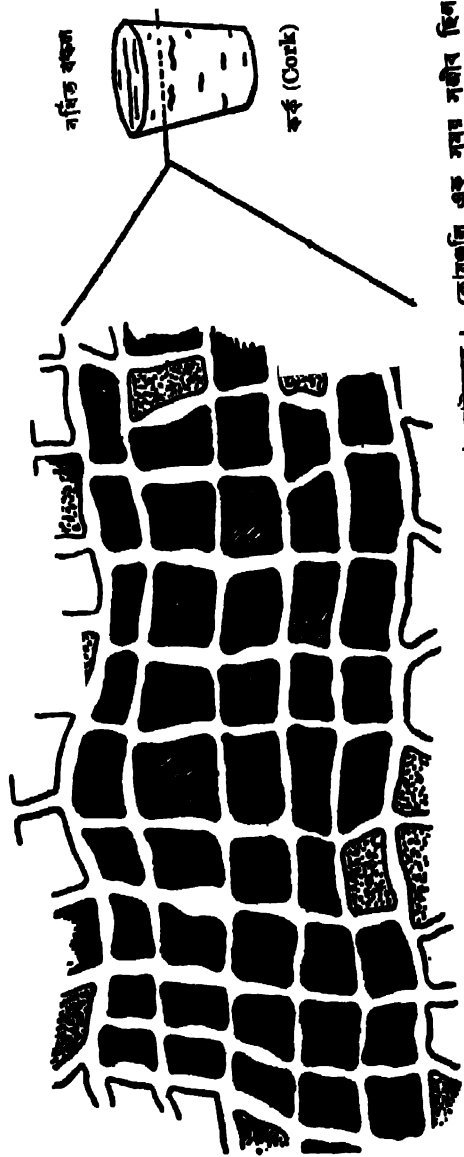
চিত্র নং ৫১। ১০০ গুণ বর্ধিত কর্কের (cork) মৃত কোষগুলি শূ ন্যায় দেখা যাইতেছে। কোষগুলি এক সময় সজীব ছিল; কিন্তু বর্তমানে মৃত। এক প্রকা ওক গাছের ব ইতে কর্ক উৎপন্ন হয়। সকল উদ্ভিদের বকলকে বহুগুণ বর্ধিত করিলে ঐরূপ দেখায়। ১৬৬৫ খ্রী ইংলণ্ডে বার্ট হুক (Robert Hooke) সর্বপ্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে কর্কের কোষ নিরীক্ষণ করেন।

[SMITH : হইতে পুনর্মুদ্রিত]

able membrane) কাজ করে এবং জল ও তাহাতে দ্রব পোষক (nutrient) লবণ তাহার মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ ও বাহিরে নির্গত হইতে পারে। কিন্তু এই সকল কোষের কোসপ্রাচীরে সজীব প্রোটোপ্লাজমের ঝিল্লীরূপ অতিরিক্ত একটি পর্দা থাকে যাহার ভেদক ক্ষমতা নির্বাচনমূলক (selective permeability)। প্রোটোপ্লাজমের এই ঝিল্লী উদ্ভিদের মধ্যে কোষ হইতে কোষান্তরে এবং মাটি হইতে উদ্ভিদের মূলে জল ও দ্রব পোষক লবণের প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। এই সজীব ঝিল্লীই মূলের কোষ হইতে পোষক রসকে মাটিতে ব্যাপনে (diffusion) বাধাদান করে।

উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ গঠন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে বাড়ীর দেওয়ালে যেমন একটির পর একটি ইট সাজানো থাকে, উদ্ভিদ দেহও একটির উপর একটি কোষ স্থাপিত হইয়া অসংখ্য কোষ লইয়া গঠিত হয়। যেহেতু প্রত্যেক কোষ তাহার পার্শ্ববর্তী কোষ হইতে ভেদ্য কোষপ্রাচীর দ্বারা পৃথক থাকে, সেইহেতু অস্‌মোসিস্ প্রক্রিয়ায় পোষক রস কোষ হইতে কোষান্তরে চলিয়া যায়। কোষ-মধ্যস্থ **কোষরস** (cell sap) নামক তরল পদার্থের গাঢ়ীভবন (concentration) জল ও পোষক দ্রব্যের চলন নিয়ন্ত্রণ করে। (চিত্র নং ৪২)

চতুর্দিকস্থ মৃত্তিকার জল অপেক্ষা উদ্ভিদ মূলের কোষরস অপেক্ষাকৃত গাঢ় থাকে ; কাজেই মাটি হইতে জল সহজেই মূলের কোষে প্রবেশ করে। উদ্ভিদের মধ্যে মূল হইতে উপরের দিকে পাতার কোষরসের গাঢ়ীভবন অপেক্ষাকৃত ভাবে বেশি থাকে। এই ক্রমবর্ধমান গাঢ়ীভবনের উপস্থিতির ফলে মূল হইতে বেশ কিছু দূরত্বে অবস্থিত পাতায় সেই রস শোষিত হয়।

বাষ্পমোচন (Transpiration)

বর্ধিষ্ণু উদ্ভিদের পাতা হইতে জলের বহির্গমনকে বাষ্পমোচন বলে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে একটি ভুট্টা গাছ হইতে তাহার জীবনকালে তাহার ওজনের ২০০ গুণ জল বাহির হইয়া যায়। উদ্ভিদকে খাড়া রাখিতে জলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অধিক পরিমাণে জল বাহির হইয়া গেলে উদ্ভিদ শুকাইয়া নেতাইয়া (wilt) পড়ে। গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ায় এবং তাহার সঙ্গে বাতাস থাকিলে উদ্ভিদ সাধারণতঃ নেতাইয়া পড়ে ; কারণ এরূপ আবহাওয়ায় মূল দ্বারা শোষণ অপেক্ষা বাষ্পমোচন বেশি হয়। কোষে জলের
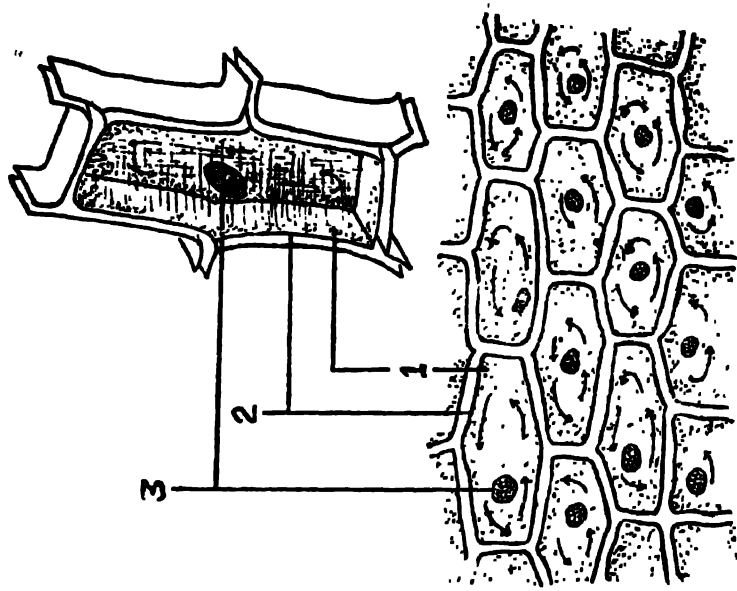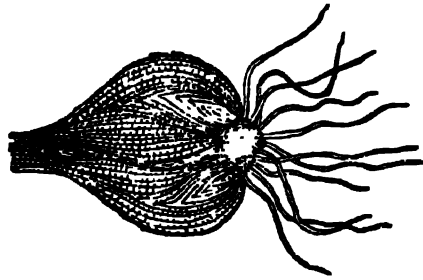
চিত্র নং   বামে : পিঁয়াজের দীর্ঘচ্ছেদ :

ডাইনে : বহুগুণ   পিঁয়াজের খোসার কোষ-সমষ্টি। 1. : প্রোটোপ্লাজম, 2. কোষপ্রাচীর, 3. নিউক্লীয়াস। ডান দিকে আকৃতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে ডাইনে উপরে পিঁয়াজের খোসার একটি অঙ্কন করা কোষ হইয়াছে।

কোষের সকল বস্তু অবিরাম চলমান অবস্থায় থাকে। এই চলনের ফলে উদ্ভিদের রসের অসমোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ হইতে ... সঞ্চারিত হয়।

...AND KUMAR হইতে

অভাব পুনরায় পূর্ণ হইলে, উদ্ভিদের নেতানো অংশ তাহার রসস্ফীতি ও স্বাভাবিক আকৃতি ফিরিয়া পায়।

যান্ত্রিক কারণে বা অন্যান্য কারণে মূলের ক্ষতি হইলে, মাটির তাপমাত্রা হ্রাস পাইলে এবং মাটিতে বায়ু চলাচল সুষ্ঠুভাবে না হইলে শোষণ ব্যাহত হইতে পারে। মাটিতে বায়ু চলাচল অপ্রচুর হইলে দাঁড়ানো জলযুক্ত জমিতেও উদ্ভিদ নেতাইয়া পড়ে।

উদ্ভিদ হইতে কি হারে জল বাহির হইয়া যায়, তাহা কোষপ্রাচীরের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কর্ক (cork), কিউটিন (cutin) বা কিউটিকল (cuticle) দ্বারা সুরক্ষিত উদ্ভিদগাত্র হইতে বাষ্পমোচন হেতু নগণ্য পরিমাণ জল মাত্র বাহির হইয়া যায়। উদ্ভিদের সুকোমল বর্ধিষ্ণু অংশসমূহ হইতে বাষ্পমোচন হেতু জল বেশ দ্রুত হারেই বাহির হইয়া যায়। উদ্ভিদের পাতার পত্ররন্ধ্র (stomato) দিয়া বাষ্পমোচন হেতু সর্বাধিক পরিমাণ জল নির্গত হইয়া যায়। প্রতিটি পত্ররন্ধ্রের নিচে একটি করিয়া বাতাবকাশ (air cavity) থাকে, শিথিলভাবে সাজানো কয়েকটি কোষ এই বাতাবকাশকে ঘিরিয়া রাখে। জল এই বাতাবকাশে আসে, অতঃপর পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়া বাষ্পাকারে বাহিরের বায়ুতে চলিয়া যায়। পত্ররন্ধ্রের দুইটি রক্ষীকোষ (guard cells) থাকে, সজীব প্রোটোপ্লাজম পত্ররন্ধ্রের মুখ উন্মুক্ত ও বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। রক্ষীকোষ দুইটি অতিমাত্রায় রসস্ফীত হইলে পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত হয় এবং বাষ্পমোচন খুবই দ্রুত হয়। রক্ষীকোষের রসস্ফীতি যখন ন্যূনতম তখন পত্ররন্ধ্র বন্ধ হইয়া যায় এবং বাষ্পমোচনও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। (চিত্র নং ৪৩ ও ৪৪)

রক্ষীকোষের রসস্ফীতি এবং সেই হেতু বাষ্পমোচনের পরিমাণ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বাহ্যিক কারণসমূহের উপর নির্ভর করে :

১। আলোকের তীব্রতা (intensity of light)

২। বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা (humidity of the atmosphere)

৩। মৃত্তিকা ও বায়ুর উষ্ণতা (temperature of the soil and air)

৪। বায়ুপ্রবাহ (movement of air)

৫। মৃত্তিকার জলের পরিমাণ (water content of the soil-soil moisture)

আলোকের তীব্রতা—অন্ধকারে বাষ্পমোচন অতিশয় সামান্য পরিমাণে হয়; ব্যপ্তালোকে (in diffused light) ইহা হ্রাস পায় এবং উজ্জ্বল আলোকে বৃদ্ধি পায়।

বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা—উদ্ভিদের নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডল জলীয় বাষ্পে সংপৃক্ত (saturated) থাকিলে বাষ্পমোচনের পরিমাণ খুবই কমিয়া যায়; শুষ্ক বায়ুমণ্ডলে ইহা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

উষ্ণতা—তাপমাত্রা বাড়িলে বাষ্পমোচন বৃদ্ধি পায়। বেলা যত বাড়িতে থাকে, উষ্ণতাও বাড়িতে থাকে এবং উদ্ভিদের বাষ্পমোচনও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বায়ু প্রবাহ—উদ্ভিদের নিকটবর্তী জলীয় বাষ্প দ্বারা সংপৃক্ত বায়ু বাতাস কর্তৃক তাড়িত হইয়া দূরে চলিয়া যায়; ফলে বাষ্পমোচন বৃদ্ধি পায়।
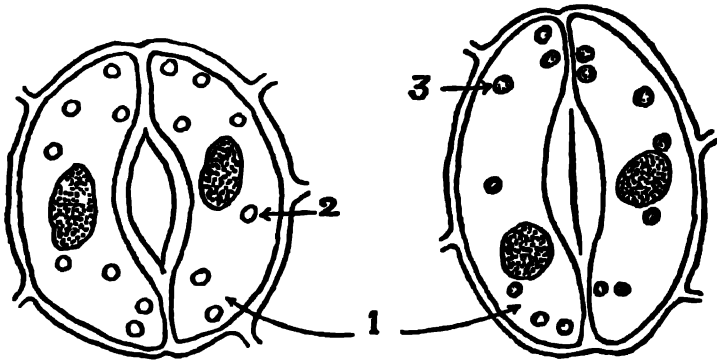
পত্ররন্ধ্র—দিনে পত্ররন্ধ্র—রাত্রিবেলা

চিত্র নং ৪৩। 1. রক্ষীকোষ, 2. শর্করা, 3, শ্বেতসার।

উদ্ভিদের সকল পাতার নিম্নতলে সাধারণতঃ পত্ররন্ধ্র থাকে এবং শ্বাসক্রিয়া, বাষ্পমোচন ও সালোক সংশ্লেষ কালে উহারা বায়ুর (অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড) প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে।

বামে: দিনের বেলায় পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে এবং সালোকসংশ্লেষ কালে উৎপন্ন শর্করা রক্ষীকোষের ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে দেখা যাইতেছে।

ডাইনে: রাত্রি কালে পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকে এবং রক্ষীকোষের ক্লোরোপ্লাস্টের শর্করা শ্বেতসারে পরিবর্তিত হইয়েছে। [WEAVER: হইতে গৃহীত]।

মৃত্তিকার জল—মাটিতে জলের পরিমাণ কম থাকিলে, বাষ্পমোচনের পরিমাণও হ্রাস পায়।

চিত্র নং ৪৪। বহুগুণ বর্ধিত পত্রের নিম্নতল।
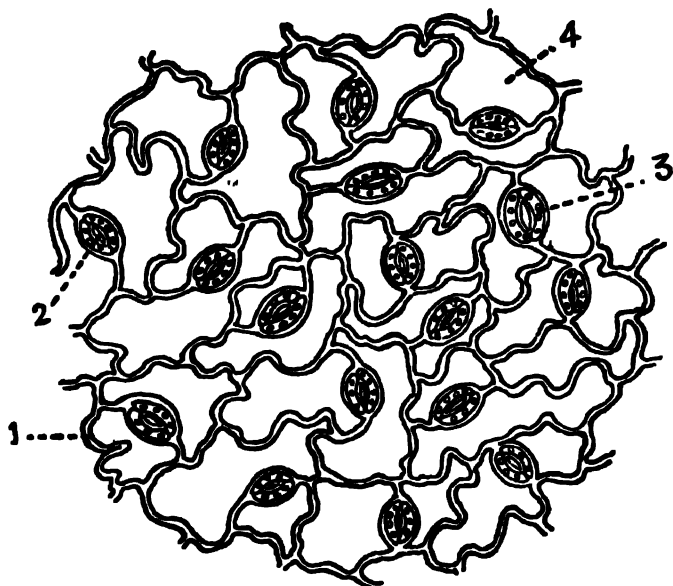
1—কোষপ্রাচীর। 2—পত্ররন্ধ্র (stoma, বহুবচনে stomata), 3—পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষ, 4—ত্বক (epidermis)

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]।

সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis)

ক্লোরোপ্লাস্ট (chloroplast) বা সবুজ রঞ্জক পদার্থ বিশিষ্ট অংশসমূহ দ্বারা আলোকের উপস্থিতিতে খাদ্য সংশ্লেষণকে সালোকসংশ্লেষ বলে। এ সকল ক্লোরোপ্লাস্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের অণুকে ভাঙিয়া শর্করা, শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থে পুনর্গঠিত করে।

উদ্ভিদ কর্তৃক খাদ্য সংশ্লেষণের জন্য আলোক, জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মাটি হইতে পোষক মৌলসমূহ আবশ্যক (চিত্র নং ৪৫)।
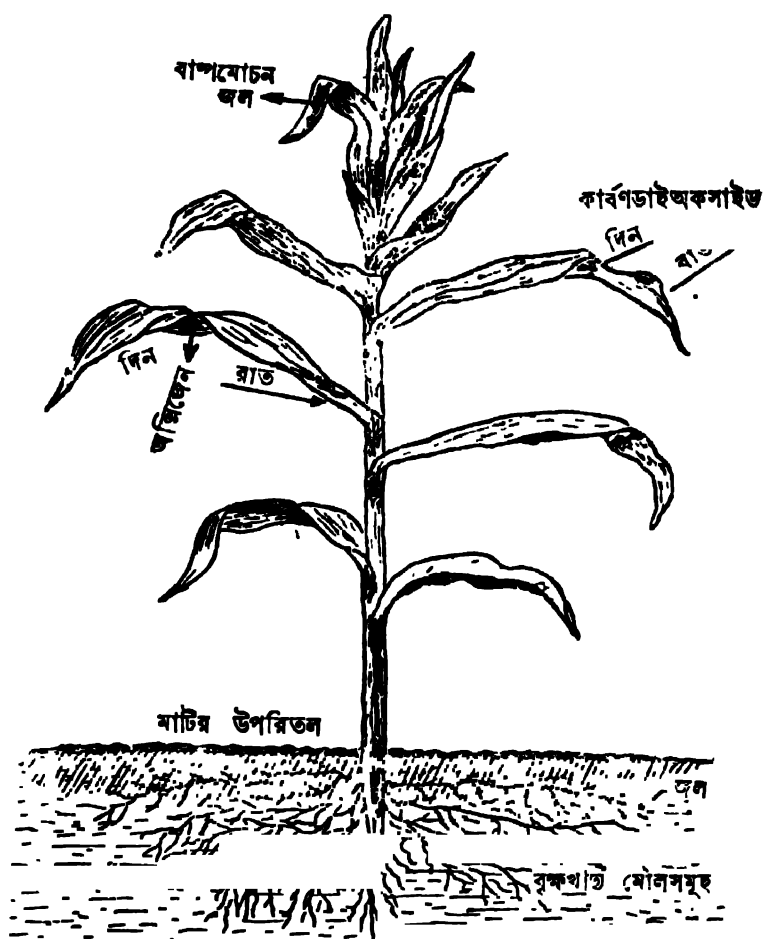
চিত্র নং ৪৫। দিনের বেলায় যখন সূর্য উঠে, মাটি হইতে জল ও পোষক মৌলসমূহ মূলের ভিতর দিয়া উপ'র পাতায় গিয়া পৌঁছে। সূর্যালোক হইতে শক্তি, মাটি হইতে জল ও মৌলসমূহ, বায়ু হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করিয়া সবুজ ক্লোরোফিল খাদ্য, যেমন শর্করা তৈয়ারি করে এবং বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সালোকসংশ্লেষ। রাত্রিকালে উদ্ভিদ তাহার বৃদ্ধির জন্য কিছু শর্করা ব্যবহার করে, অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়িয়া দেয়—এই প্রক্রিয়াকে শ্বাসক্রিয়া (respiration) বলে।

[HAMMONDS and WOODS : হইতে গৃহীত]

সজীব উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের জন্য নিম্নলিখিত বস্তুসমূহ অপরিহার্য :

(১) চারিপার্শ্বস্থ বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতি (carbon dioxide in surrounding air)

(২) পত্রের কলায় ক্লোরোফিল (chlorophyll in the tissues of leaves)

(৩) পর্যাপ্ত আলোক (sufficient light)

(৪) সন্তোষজনক তাপমাত্রা (satisfactory temperature)

(৫) জল (water)

(৫) বৃক্ষখাদ্য মৌল (plant food elements)

কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)—কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলস্থ একটি গ্যাস। প্রতি দশ হাজার ভাগ বায়ুতে তিনভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড—এই অনুপাতে ইহা বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত থাকে। পত্রের কোষমধ্যবর্তী রন্ধ্রের (intercellular space) মধ্যে পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়া বায়ু ব্যাপিত (diffuse) হয়। বায়ুর CO_2 পাতার কোষের আর্দ্র কোষপ্রাচীরে দ্রবীভূত হয় এবং এই ভাবে উদ্ভিদের ভিতরে প্রবেশলাভ করে।

ক্লোরোফিল—কোষের ক্লোরোপ্লাস্টস্থ সবুজ রঞ্জক পদার্থকে ক্লোরোফিল বলে। ইহা ছাড়া কমলা রংএর **ক্যারোটিন** (carotin) ও হরিদ্রা বর্ণের **জ্যান্থোফিল** (xanthophyll) নামক আরও দুইটি রঞ্জক (pigment) থাকে। ক্লোরোফিল না থাকিলে উদ্ভিদকে পাণ্ডুরোগগ্রস্ত (chlorotic) বলা হয়। লৌহের (iron) অপ্রাচুর্যে যদি এই অবস্থা হয় তবে মাটিতে সামান্য পরিমাণ আইরণ সালফেট প্রয়োগ করিলে বা ইহার দ্রবণ পাতার উপর ছিটাইয়া দিলে এই দোষ সংশোধন করা যায়। একটি বা দুইটি তারকাটা উদ্ভিদের কাণ্ডে ঢুকাইয়া রাখিলে বা নিকটবর্তী মাটিতে কিছু বাতিল লৌহা ঢুকাইয়া দিলে উদ্ভিদের সবুজ বর্ণ ফিরাইয়া আনা যায়।

আলোক—আলোকের অনুপস্থিতিতে উদ্ভিদে ক্লোরোফিল গঠিত হয় না। মাটির অন্ধকার হইতে শিশু চারা নির্গত হইবার সময় তাহাদের রং থাকে ফ্যাকাশে হলদে এবং কিছুদিন পরে ক্লোরোফিল গঠনের ফলে তাহা সবুজ বর্ণ ধারণ করে। উদ্ভিদকে অন্ধকারে রাখিয়া দিলে তাহারা সবুজ বর্ণ হারায় এবং সাদাটে হলদে বর্ণ ধারণ করে। এই উদ্ভিদকে সূর্যালোকে রাখিয়া দিলে

সবুজ রঞ্জক আবার গঠিত হইতে থাকে। সালোকসংশ্লেষের জন্য কোন কোন উদ্ভিদের সরাসরি সূর্যালোক আবশ্যক হয়। আবার কিছু উদ্ভিদ, যেমন ছায়া-পছন্দকারী (shade-loving) উদ্ভিদের কেবল মাত্র ব্যাপ্ত সূর্যালোক প্রয়োজন হয়।

তাপমাত্রা—উষ্ণ অঞ্চলের উদ্ভিদে, ৫° সে. এর. কাছাকাছি তাপমাত্রায় খুব অল্প পরিমাণে সালোকসংশ্লেষ হয়; ইহার উপরে তাপমাত্রা যত বাড়িতে থাকে সালোকসংশ্লেষও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ৩০° সে. তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষের হার সর্বোচ্চ হয়। তাপমাত্রা আরও বাড়িতে থাকিলে, সালোকসংশ্লেষও কমিতে থাকে এবং ৫৫° সে. তাপমাত্রায় ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

জল—সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়ায় জল হাইড্রোজেন সরবরাহ করে এবং মাটি হইতে শোষিত সকল পোষক লবণের দ্রাবকরূপে কাজ করে।

বৃক্ষখাদ্য মৌল—সালোকসংশ্লেষ করিবার জন্য সকল ফসলেরই মাটি হইতে পোষক মৌলসমূহ, যেমন নাইট্রোজেন ও ফসফোরসের প্রয়োজন হয়।

শ্বাসক্রিয়া (Respiration)

সকল সজীব জীবের ন্যায় উদ্ভিদও অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া ও কার্বনডাই-অক্সাইড ত্যাগ করিয়া শ্বাস নেয়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মৃত্তিকার উপরিস্থিত অংশ শ্বাসক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন বায়ু হইতে সংগ্রহ করে। মাটিতে বর্ধিষ্ণু সজীব মূলেরও অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। মাটিতে বায়ু চলাচলের পথ সুগম না হইলে মূলের বৃদ্ধি হ্রাস পায়, ফলে ফসলের ফলনও হ্রাস পায়।

সজীব প্রোটোপ্লাজমের উপস্থিতিতে শ্বাসক্রিয়া চলিতে থাকে; উদ্ভিদের প্রতিটি কোষে এই ক্রিয়া চলিতে থাকে। কোষমধ্যবর্তী রন্ধ্রের মধ্য দিয়া বায়ুমণ্ডলস্থ অক্সিজেন উদ্ভিদের অভ্যন্তরে কোষে গিয়া পৌঁছে। এ সকল রন্ধ্র পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকে; ফলে সমগ্র উদ্ভিদে এই রন্ধ্র অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে।

শ্বাসক্রিয়া একটি শারীরবৃত্তিক (physiological) ক্রিয়া এবং সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। শ্বাসক্রিয়ায় সঞ্চিত খাদ্য পদার্থ ভাঙিয়া যায় ও জারিত (oxidised) হয়, ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল গঠিত হয় এবং তাপ বা

শক্তি মুক্ত হয়। সালোকসংশ্লেষে সূর্যালোকের তাপশক্তি বিশোষণ করিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল সংশ্লেষিত হইয়া শর্করা গঠিত হয় ও অক্সিজেন মুক্ত হয়।

শ্বাসক্রিয়া একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং দিবারাত্র সকল সময়েই চলিতে থাকে; সালোকসংশ্লেষ কেবলমাত্র সূর্যালোকের উপস্থিতিতেই সম্ভব। শ্বাসক্রিয়ায় বৃদ্ধি ও জননের জন্য সঞ্চিত খাদ্য পদার্থ ব্যবহৃত হয়। শ্বাসক্রিয়া কালে উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্যের সঞ্চিত শক্তি সক্রিয় শক্তিতে পরিবর্তিত হয়; এবং সালোকসংশ্লেষে সূর্যালোকের শক্তি পরিবর্তিত হইয়া সংশ্লেষিত খাদ্য পদার্থ, যেমন শর্করারূপে স্থৈতিক শক্তি হিসাবে সঞ্চিত হয়।

উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন হারে শ্বাসক্রিয়া ঘটে। পুরাতন অংশ অপেক্ষা সক্রিয়ভাবে বর্ধিষ্ণু এবং তরুণ অংশসমূহে শ্বাসক্রিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুত হয়। কাজেই কাণ্ড, পাতা, ফল ও অব্যক্ত অংশ, যেমন কন্দ, স্ফীতকন্দ ও কর্ম অপেক্ষা তরুণ বর্ধিষ্ণু মুকুল, বর্ধিষ্ণু মূল ও অঙ্কুরমান বীজে শ্বাসক্রিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুত হয়। উদ্ভিদের শুষ্কতম বীজ, আপাতদৃষ্টিতে যাহাকে দেখিয়া প্রাণহীন মনে হয় তাহাতেও অতি সামান্য পরিমাণে শ্বাসক্রিয়া চলে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ও তাপ-মুক্ত হয়।

শ্বাসক্রিয়া একটি **বিনাশমূলক** (destructive) প্রক্রিয়া এবং কার্বোহাইড্রেট (শর্করা ও শ্বেতসার) ও স্নেহপদার্থ ধ্বংসের ফলে উদ্ভিদের শুষ্ক ওজন হ্রাস পায়। সালোকসংশ্লেষ একটি **গঠনমূলক** (constructive) প্রক্রিয়া এবং সংশ্লেষিত খাদ্য পদার্থ সঞ্চয়ের ফলে উদ্ভিদের শুষ্ক ওজন (dry weight) বৃদ্ধি পায়। (চিত্র নং ৪৫)।

উদ্ভিদের বংশবিস্তার (Propagation of Plants)

জনন সকল সজীব জীবের বৈশিষ্ট্য। নিম্নলিখিত প্রকারে উদ্ভিদের জনন হয় বা উদ্ভিদ বংশবিস্তার করে।

(১) **অযৌন জনন (Asexual reproduction)**

(২) **যৌন জনন (Sexual reproduction)**

(৩) **অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction)**

অযৌন জনন

অযৌন জননে, উদ্ভিদে অযৌন বা বর্ধিষ্ণু অংশ হইতে রেণু (spore) নামক এক বিশেষ অংশ উৎপন্ন হয়; কোন প্রকার যৌন প্রক্রিয়া ব্যতিরেকেই ইহা উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক ও শেওলা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে এ প্রকার জনন লক্ষ্য করা যায়।

যৌন জনন

পরাগযোগ ও গর্ভাধানের পর পুং ও স্ত্রীজননকোষ মিলিত হইয়া যৌন জনন হয়; ফলে প্রকৃত ফল গঠিত হয়। ফলের অভ্যন্তরে বীজ থাকে।

অঙ্গজ জনন

অঙ্গজ জননে, উদ্ভিদের একটি বর্ধমান অংশ পৃথক হইয়া নূতন উদ্ভিদ গঠন করে।

যে সকল উদ্ভিদ স্ফীতকন্দ, রাইজোম, কর্ম ও কন্দ উৎপন্ন করে, সে সকল উদ্ভিদে অঙ্গজ জনন স্বাভাবিক ভাবেই হয় (চিত্র নং ৪৬ ও ৪৭)।
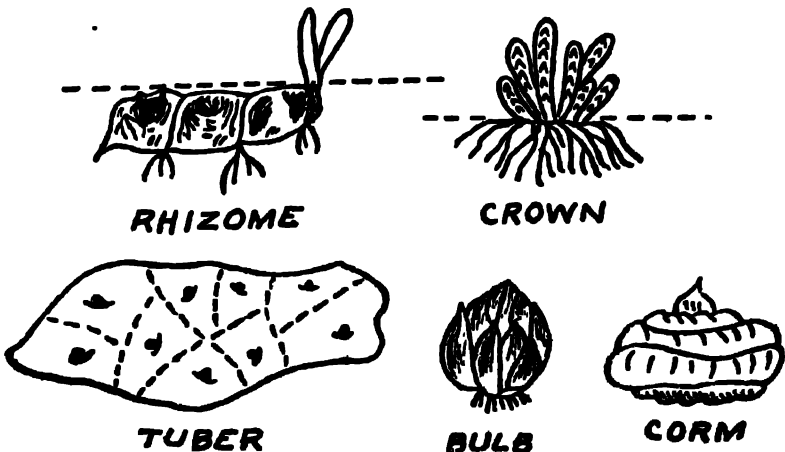
চিত্র নং ৪৬। রাইজোম, ক্রাউন (crown), স্ফীতকন্দ (Tuber), কন্দ (Bulb) ও কর্ম দ্বারা স্বাভাবিকভাবে অঙ্গজ জনন হয়।

[HALL: হইতে পুনরঙ্কিত]

চিত্র নং ৬৭। স্ট্রবেরি গাছ মৃত্তিকার উপরিস্থিত রাইজোম দ্বারা স্বাভাবিকভাবে জনন হয়।

[PATTERSON : হইতে পুনরঙ্কিত]
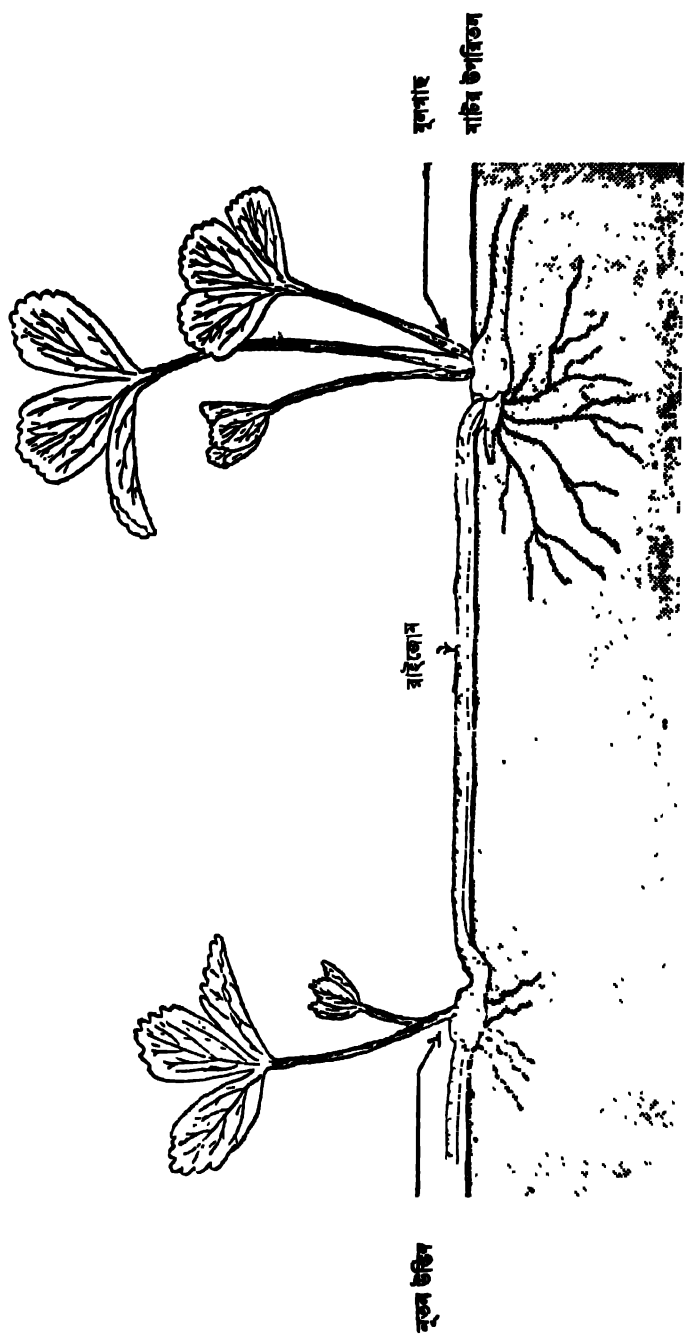
আলু গাছে বিশেষ প্রকার কাণ্ডের অগ্রভাগে মাটির নিচে স্ফীতকন্দ গঠিত হয়। মাটির নিচে ইহারা অব্যক্ত অবস্থায় থাকে এবং পরবর্তী ঋতুতে ইহাদের প্রত্যেকটি হইতে এক বা একাধিক উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। আদা ও হলুদে রাইজোমের পুরাতন অংশ মরিয়া যায় এবং নূতন পার্শ্ব শাখা হইতে নূতন উদ্ভিদ জন্ম লাভ করে এবং এই ভাবে একটি হইতে কয়েকটি পৃথক উদ্ভিদের জন্ম হইয়া বংশ বৃদ্ধি হয়।

কোন কোন উদ্ভিদে কন্দ বা কর্ম দ্বারা জনন হয়। উদ্ভিদ যখন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কন্দ বা কর্মও পরিণতি লাভ করে এবং তাহাদের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য রক্ষিত খাদ্য সঞ্চিত হয়। একই সঙ্গে কন্দ বা কর্মের উপর মুকুল গঠিত হয়। নূতন মুকুল যখন বৃদ্ধি পাইতে থাকে সমস্ত সঞ্চিত খাদ্য ঐ বৃদ্ধির জন্য ব্যয় হয় এবং পুরাতন কন্দ বা কর্ম নিঃশেষিত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। নূতন উদ্ভিদ হইতে আবার কন্দ বা কর্ম গঠিত হয়।

কোন কোন উদ্ভিদে পাতার কোন অংশ হইতে উৎপন্ন মুকুল নূতন উদ্ভিদ-রূপে স্বাধীনভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে, যেমন পাথরকুচি, হিমসাগর ও কোন কোন ফার্ন (fern)। পুষ্পবিন্যাসের কাছাকাছি উৎপন্ন বিশেষ প্রকার মুকুল বা **বুলবিলের** (bulbil) সাহায্যেও অঙ্গজ জনন হয়, যেমন সিসাল (sisal), চুপড়ি আলু ইত্যাদি।

কৃষিকার্য ও উদ্যানপালনে কৃত্রিম অঙ্গজ জনন প্রায়ই অনুসরণ করা হয়। অঙ্গজ জনন কোন কোন উদ্ভিদে খুবই সফল হয়, কোন কোন উদ্ভিদে হয় না। **শাখাকলম** (cutting), **দাবাকলম** (layering) **চোককলম** (budding) ও **কলম** (graft) কৃত্রিম অঙ্গজ জননের কয়েকটি পদ্ধতি।

শাখাকলম: শাখাকলমের সাহায্যে বংশবৃদ্ধিতে কাণ্ড, মূল বা পত্র হইতে একটা অংশ কাটিয়া লইয়া পুনরায় রোপণ করা হয়। কাণ্ডের শাখা-কলম সাধারণতঃ ৮–১০ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং তাহাতে কয়েকটি পর্ব থাকে। মূল উৎপাদনের জন্য একটি বা দুইটি পর্বসহ শাখাকলমের কিছু অংশ মাটিতে প্রোথিত করা হয়। মাটির উপরিস্থিত পর্বসমূহ হইতে মুকুল বাহির হয় এবং এই মুকুল হইতে বিটপ উৎপন্ন হয়। উষ্ণ ও আর্দ্র মাটিতে শাখাকলম রোপণ করিতে হইবে। তীব্র সূর্যালোক, অতিরিক্ত গরম ও শুষ্কতার ফলে শাখাকলম-গুলি যাহাতে শুকাইয়া না যায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সবুজ কোমল অংশ বা শক্ত কাষ্ঠল অংশ হইতে শাখাকলম সংগ্রহ করিতে হইবে; কাণ্ডের পরিণত অংশ হইতে শাখাকলম কাটিতে হইবে। সরস উদ্ভিদের বেলায় কোমল কাণ্ডের টুকরা হইতে সহজেই মূল উৎপন্ন হয়। শক্ত কাষ্ঠল শাখাকলমে মূল উৎপাদন অতিশয় শ্রমসাধ্য (চিত্র নং ৪৮)।

দাবা-কলম—কোন গাছের শাখাকে বাঁকাইয়া মাটির ভিতর প্রবেশ করানোর পদ্ধতিকে দাবা-কলম বলে। বাঁকানো অংশ হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয়। মূল উৎপন্ন হইবার পর দাবা-কলমকে কাটিয়া মাতৃ উদ্ভিদ হইতে পৃথক করা হয় এবং কলম স্বাধীনভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দাবা-কলমে মূল গঠন ত্বরান্বিত করার জন্য মাটির ভিতরে যে অংশ প্রবেশ করানো হইবে তাহার একটি পর্বে জিহ্বার আকারে একটি অংশ কাটিতে হইবে অথবা ১ ইঞ্চি পরিমাণ ত্বক মুড়াইয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে (চিত্র নং ৪৯ ও ৫০)।

চোক-কলম—কোন গাছের অপরিণত বা অব্যক্ত মুকুল তুলিয়া লইয়া অপর একটি গাছের কাণ্ডের বল্কলে সামান্য ফাঁক করিয়া তাহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া চোক-কলম তৈয়ারি করা হয়। যে গাছ হইতে মুকুল সংগ্রহ করা হয় তাহাকে **সাইয়ন** (scion) এবং যে গাছে মুকুল ঢুকাইয়া দেওয়া হয় তাহাকে **স্টক** (stock) বলে। কয়েক দিনের যত্নের পর সন্নিবিষ্ট মুকুল স্টকের সহিত সম্পূর্ণরূপে জোড়া লাগিয়া যায় এবং একই উদ্ভিদরূপে আচরণ করে। স্টকের মূল বর্ধিষ্ণু বিটপকে জল ও পোষক দ্রব্য সরবরাহ করে; পরিবর্তে বিটপের পাতায় তৈয়ারি খাদ্য পদার্থ স্টককে আরও নূতন মূলবৃদ্ধিতে উদ্দীপ্ত করে। সাধারণত এই প্রকার চোক-কলমকে শীল্ড **চোক-কলম** (shield budding) বলে।

যে শাখা হইতে মুকুল সংগৃহীত হইবে এবং যে শাখায় উহা সন্নিবেশিত করা হইবে উভয়েরই বয়স কম হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং চলতি ঋতুতে উৎপন্ন শাখা হওয়া উচিত; নতুবা উভয়ের মিলন সফল হয় না। নির্বাচিত মুকুলটি ঢাল বা শীল্ডের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট বল্কল সহ তুলিতে হইবে; এ সঙ্গে মাতৃ-উদ্ভিদের কিছু কাঠও উঠিয়া আসে; উহা ছাড়াইয়া লইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। যে পাতার কক্ষে মুকুলটি জন্মে তাহার বৃন্তের কিছু অংশ মুকুলের সঙ্গে রাখিতে হইবে। স্টকে তীক্ষ্ণ ছুরির সাহায্যে একটি T চিহ্ন আঁকিয়া ঐ স্থানের বল্কল আলগা করিয়া মুকুলটি তাহার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া মুকুলের মুখটি
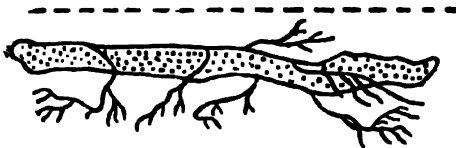
ROOT CUTTING

মূলের শাখাকলম
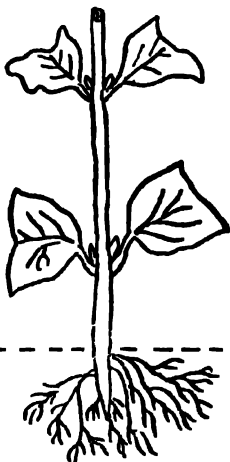
STEM CUTTING

কাণ্ডের শাখাকলম
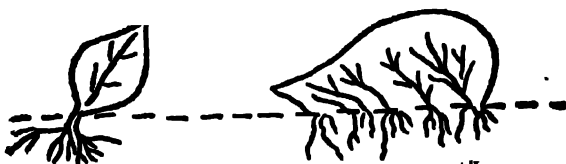
LEAF CUTTINGS

পত্র কলম

চিত্র নং ৪৮। উদ্ভিদ বিশেষে মূল, কাণ্ড বা পত্র হইতে সংগৃহীত শাখা কলম দ্বারা অঙ্গজ জনন।

[HALL : হইতে পুনরঙ্কিত]।

বাহিরে রাখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে ঐ স্থানটি কলাগাছের ফেঁসা বা অনুরূপ তন্তুদ্বারা বাঁধিয়া দিতে হইবে। কয়েক সপ্তাহ পরে মুকুলটি বসিয়া গিয়া পাতা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে ঐ বাঁধন খুলিয়া দিতে হইবে। ৫১ নং চিত্রে এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর দেখানো হইয়াছে।
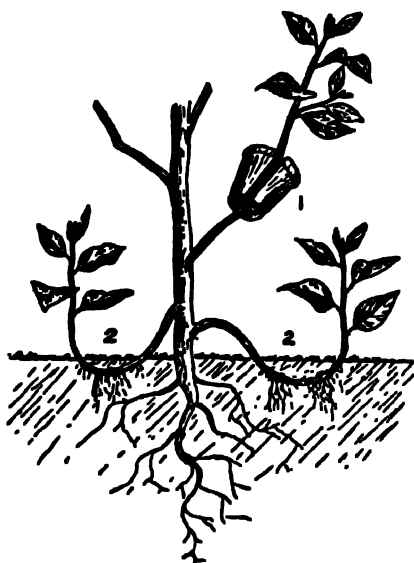
চিত্র নং ৪৯। দাবা-কলমের দুইটি উদাহরণ। 1. একটি পাত্রে মাটি পূর্ণ করিয়া শাখায় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। 2. শাখার একটি অংশ মাটিতে প্রবেশ করানো হইয়াছে।

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

কলম—একটি উদ্ভিদের (সাইয়ন) শাখার একটি ছোট অংশ অপর একটি উদ্ভিদের (স্টক) কাণ্ডে সন্নিবিষ্ট করিয়া কলম তৈয়ারী করা হয়। কলমেও সাইয়ন ও স্টকের সম্পর্ক চোক-কলমের ন্যায়। চোক-কলম কাণ্ডের কেবল কোমল (অ-কাষ্ঠল) অংশেই সম্ভব ; কিন্তু কলম কাণ্ডের কেবল কাষ্ঠল অংশেই সম্ভব। কলম সাধারণত চারি প্রকার : (১) **জিব-কলম** (tongue-graft), (২) **গোঁজ-কলম** (wedge-graft), (৩) **গদি-কলম** (saddle-graft) ও (৪) **গুঁড়ি-কলম** [rind (crown) graft]। প্রথমোক্ত তিনটিতে সাইয়ন ও

স্টকের বয়স ও বেধ (thickness) কাছাকাছি হওয়া দরকার, কিন্তু গুঁড়িকলমে সাইয়ন ও স্টকের বয়সও বেধ বিভিন্ন হইলেও চলে।

জিব-কলমে স্টকে ২-৩ ইঞ্চি লম্বা 'দ'-আকৃতি-বিশিষ্ট খাঁজ কাটিতে হইবে এবং সাইয়নেও অনুরূপভাবে কিন্তু বিপরীতমুখী খাঁজ কাটিতে হইবে যাহাতে উভয়ের জোড়া নিবিড়ভাবে মিলিয়া যায়। সংযোগস্থল মস বা কাদা দ্বারা আবৃত করিয়া শক্ত করিয়া পাট বা শন দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। অতঃপর

চিত্র নং ৫০। দাবা-কলমের পরিবর্তিত সংস্করণ। গাছের শাখা চাঁছিয়া বা মুড়াইয়া কিছু ত্বক তুলিয়া ফেলিয়া সেই ক্ষতস্থানকে মস্ (moss) দ্বারা আবৃত করিয়া প্লাষ্টিক চাদর দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্লাষ্টিকের ভিতর দিয়া মূল নির্গত হওয়ার পর শাখাটিকে মূলের নিম্নভাগে কাটিয়া লইয়া রোপণ করা হয়।

[NAIK : হইতে পুনরঙ্কিত]।

ঐ স্থানে মোম মাখানো কাপড় দিয়া জড়াইয়া জল ও বায়ুরোধক করিতে হইবে। সাইয়নের মুকুলগুলি হইতে ৬-৮ইঞ্চি দীর্ঘ শাখা সৃষ্টি হইলে ঐ আবরণ সরাইয়া ফেলিতে হইবে এবং কলমকে বাঁশ বা অনুরূপ কিছু দিয়া ঠেশ দিয়া] রাখিতে হইবে (চিত্র নং ৫২ ও ৫৩)।
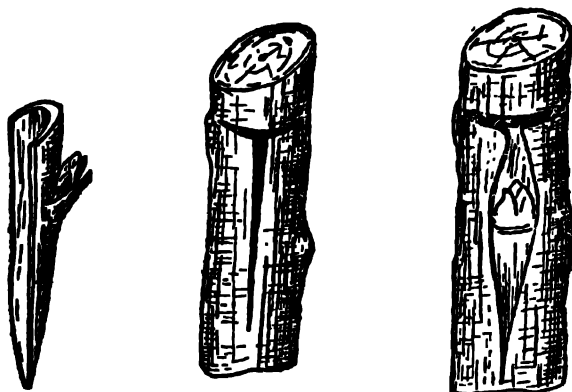
চিত্র নং ৫১। শীল্ড চোক-কলম তৈয়ার করিবার বিভিন্ন পর্যায়। বামে: উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ হইতে সংগৃহীত মুকুল, মধ্যে: নিকৃষ্ট সমজাতীয় উদ্ভিদের ষ্টক। ডাইনে: যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট মুকুল।

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]

3 4
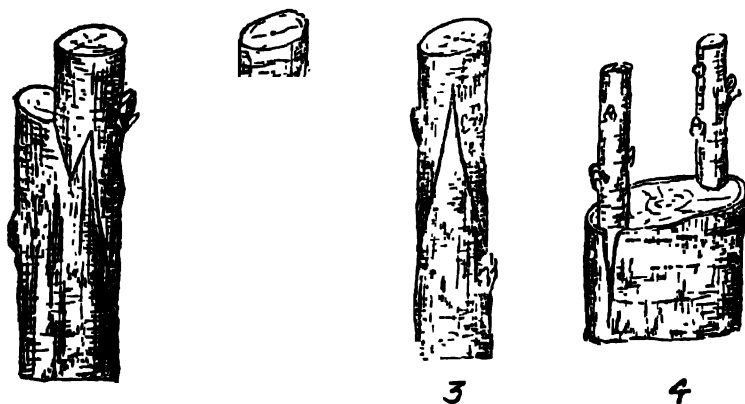
চিত্র নং ৫২। বিভিন্ন প্রকার কলম।

1. জিব-কলম, 2. গোঁজ কলম 3. গদি-কলম 4. গুঁড়ি-কলম

[L. S. S. KUMAR মহাশয়ের সৌজন্যে]।
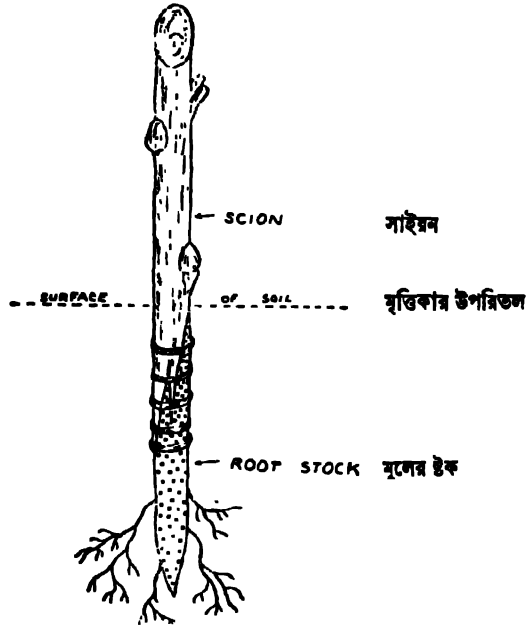
চিত্র নং ৫৩। অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু সমজাতীয় উদ্ভিদের কাষ্ঠল শাখার জিব-কলম। কোন কোন কাষ্ঠল উদ্ভিদের অঙ্গজ জনন সাধারণত এই প্রকার কলমের সাহায্যে হয় [HALL : হইতে পুনর্মুদ্রিত]।

কন্দ, স্ফীতকন্দ, কর্ম, শাখা-কলম, দাবা-কলম, চোক-কলম ও কলম হইতে গঠিত উদ্ভিদের অঙ্গ সংস্থান ও শারীরবৃত্তিক বৈশিষ্ট্য সমূহ মাতৃ উদ্ভিদ হইতে প্রাপ্ত। এই সুবিধার জন্য মাতৃ উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট গুণগুলি বজায় রাখার প্রয়াসে উদ্যানপালক ও কৃষিবিদগণ যথাসম্ভব অঙ্গজ জননের সাহায্যে উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি করেন।

যে সকল ফলের গাছ বীজ হইতে উৎপন্ন হয় তাহাদের কোন কোন উদ্ভিদের বংশধরে মাতৃ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিবর্তিত হইতে দেখা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে উৎকর্ষ হ্রাস পায়। কাজেই বীজের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি ঘটিলে মাতৃ উদ্ভিদের বহু উৎকৃষ্ট গুণ নষ্ট হইয়া যায়। এ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কলমের মাধ্যমে অঙ্গজ জননের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। অঙ্গজ জননের আর

একটি সুবিধা এই যে পরিণত উদ্ভিদ সৃষ্টি করিতে অনেক কম সময় লাগে। সাধারণত ফল ও ফুল গাছে কলম করা হয়।

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Plants)

সকল উদ্ভিদকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; (১) **অপুষ্পক উদ্ভিদ** (cryptogams) ও (২) **সপুষ্পক উদ্ভিদ** (phanerogams)। শেষোক্ত শ্রেণীকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়: (১) **ব্যক্তবীজী** (Gymnosperms) ও (২) **গুপ্তবীজী** (Angiosperms)।
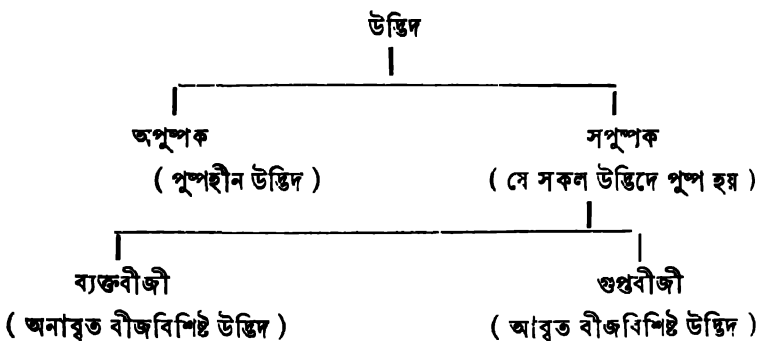
অপুষ্পক উদ্ভিদ—ব্যাকটিরিয়া, ঈস্ট (yeast), ছত্রাক, শেওলা, লাইকেন, মস ও ফার্ণ এই বিভাগের অন্তর্গত।

সপুষ্পক উদ্ভিদ :

(১) **ব্যক্তবীজী**—পাইন (pine), বিলাতি ঝাউ (cycad) প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(২) **গুপ্তবীজী**—অধিকাংশ সপুষ্পক উদ্ভিদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত এবং কৃষিকার্যে এই শ্রেণীর গুরুত্ব খুবই বেশি। গুপ্তবীজী উদ্ভিদকে আবার দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়: (ক) **একবীজপত্রী** (monocotyledons) ও (খ) **দ্বিবীজপত্রী** (dicotyledons)। এই দুই শ্রেণীর প্রধান পার্থক্যসমূহ নিয়ে দেওয়া হইল (চিত্র নং ৫৪ ও ৫৫)।
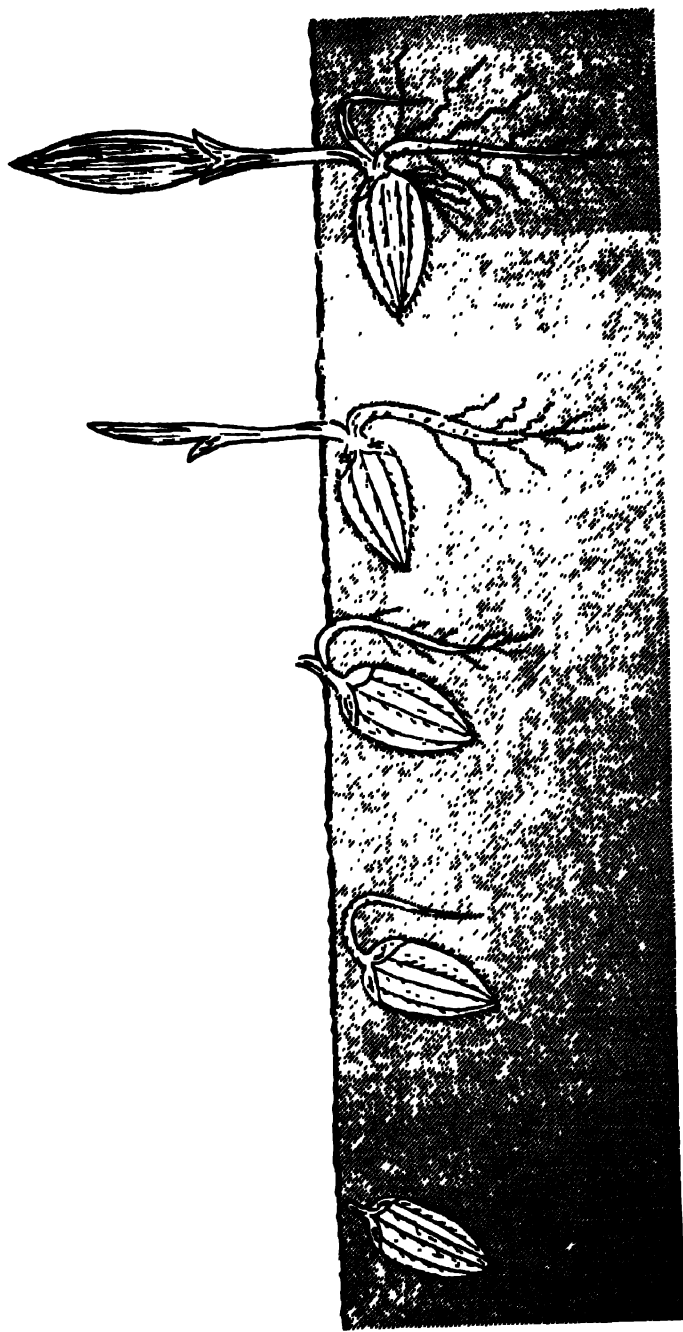
চিত্র নং ৫৪। ধান একবীজপত্রী উদ্ভিদের উদাহরণ। অঙ্কুরোদ্গমের পরে বীজ মাটির মধ্যেই থাকে।

[NARAYANAN : হইতে পুনরঙ্কিত
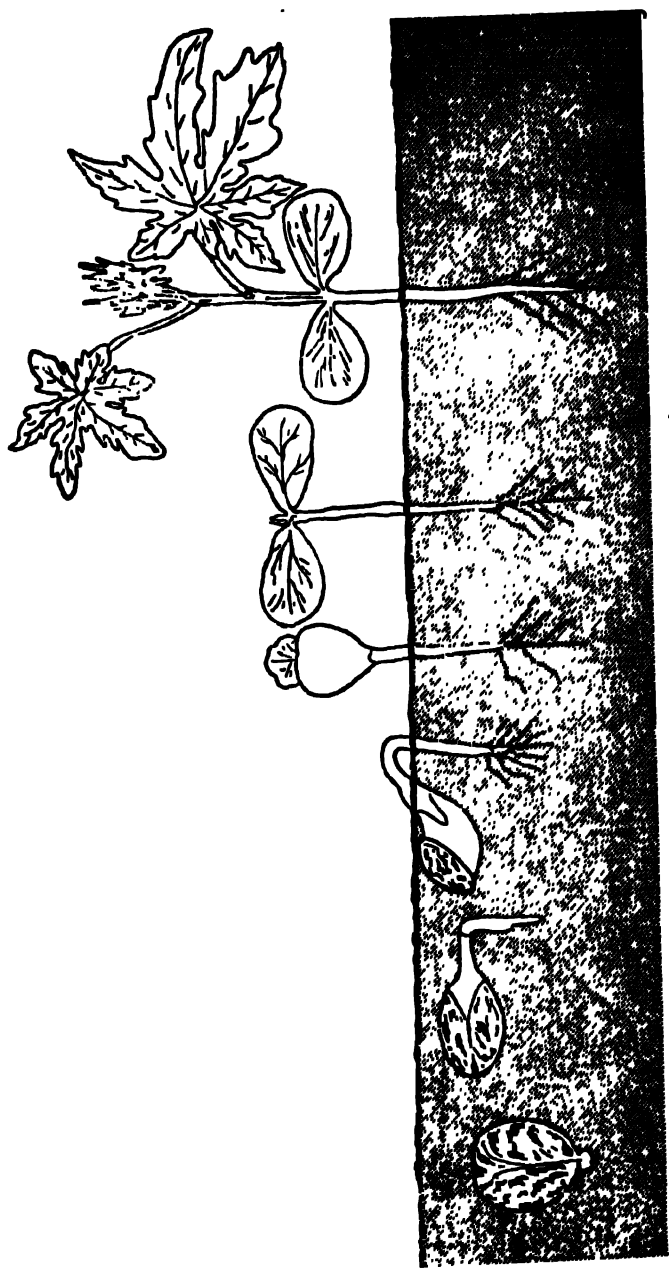
চিত্র নং ৫৫। রেড়ি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের উদাহরণ। অঙ্কুরোদ্গমের পরে বীজ মাটির উপরে উঠিয়া আসে।

[NARAYANAN : হইতে পুনরঙ্কিত]

একবীজপত্রী (উদাহরণ : ধান)	দ্বিবীজপত্রী (উদাহরণ : রেড়ি)
(১) ভ্রূণে একটি মাত্র বীজপত্র থাকে	(১) ভ্রূণে দুইটি বীজপত্র থাকে
(২) ভ্রূণমুকুল পার্শ্বে থাকে	(২) ভ্রূণমুকুল অগ্রে থাকে
(৩) প্রাথমিক মূল নষ্ট হইয়া যায় এবং গুচ্ছমূল ঐ স্থান অধিকার করে।	(৩) প্রাথমিক মূল থাকিয়া যায় এবং উহা প্রধান মূল গঠন করে
(৪) পত্র সমান্তরাল শিরাবিন্যাস বিশিষ্ট	(৪) পত্র জালিকা শিরাবিন্যাস বিশিষ্ট
(৫) পুষ্প তিন বা তাহার গুণিতকে হয় (trimerous)	(৫) পুষ্প পাঁচ বা তাহার গুণিতকে হয় (pentamerous)
(৬) ভ্যাসকুলার (নালিকা) বাণ্ডিল (Vascular bundles) অনিয়মিত ভাবে ছড়ানো থাকে এবং বদ্ধ হয়। **ক্যাম্বিয়ম অনুপস্থিত থাকে।** কাণ্ডের গৌণ বৃদ্ধি (secondary thickening) হয় না।	(৬) ভ্যাসকুলার (নালিকা) বাণ্ডিল চক্রাকারে সাজানো থাকে এবং মুক্ত হয়। **ক্যাম্বিয়ম** (cambium) **থাকে** এবং কাণ্ডের গৌণ বৃদ্ধি হয়।

সংক্ষিপ্তসার

মাটি হইতে খাদ্য পদার্থ ও জল শোষণ, উদ্ভিদ হইতে জল বাহির করিয়া দেওয়া, খাদ্য পদার্থ তৈয়ারি বা সংশ্লেষণ, শ্বাস-প্রশ্বাস বা শ্বাসক্রিয়া, বৃদ্ধি ও পরিণতি এবং জনন-উদ্ভিদ এই সকল অপরিহার্য কার্যসমূহ করিয়া থাকে। অসমোটিক চাপের প্রভাবে মূলরোমের ভিতর দিয়া মাটি হইতে জল ও তাহাতে দ্রব পদার্থসমূহ উদ্ভিদ শোষণ করিয়া থাকে। কোষ প্রাচীরের গাত্র হইতে বাষ্পমোচন হেতু পাতার ভিতর হইতে পত্ররন্ধ্র নামক রন্ধ্র বা ছিদ্রের ভিতর দিয়া উদ্ভিদ হইতে জল বাহির হইয়া যায়। এই জল বাহির হইয়া যাওয়া বা বাষ্পমোচন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক কারণসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

উদ্ভিদ তাহার খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান মাটি ও বায়ু হইতে শোষণ করে। জল ও দ্রবণীয় অবস্থায় খনিজ পদার্থ মাটি হইতে সংগ্রহ করে। বায়ু হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গৃহীত হয়। প্রথম যে খাদ্য তৈয়ারি হয় তাহা হইল শর্করা। শর্করা তৈয়ারি করিতে নিম্নলিখিত অত্যাবশ্যকীয় পদার্থগুলির প্রয়োজন হয়: (১) জল, (২) কার্বন ডাই-অক্সাইড, (৩) সূর্যালোক, (৪) তাপমাত্রা ও (৫) সবুজ রঞ্জক পদার্থ বা ক্লোরোফিল। ইহাদের যে কোন একটির অনুপস্থিতিতে শর্করা তৈয়ারি হইতে পারে না। কেবলমাত্র আলোকের উপস্থিতিতেই শর্করা সংশ্লেষণ সম্ভব বলিয়া এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সালোকসংশ্লেষ বা স+আলোক+সংশ্লেষ। সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে শর্করা উদ্ভিদ কর্তৃক পরে শ্বেতসারে পরিবর্তিত হয়। অন্যান্য খাদ্য পদার্থ, যেমন প্রোটিন ও স্নেহপদার্থও উদ্ভিদ তৈয়ারি করে। ধান ও ভুট্টার বীজে প্রধানত শ্বেতসার থাকে; শিম্বিগোত্রীয় উদ্ভিদ, যেমন মটর, শিম, ডাল প্রভৃতির বীজ প্রোটিনে সমৃদ্ধ এবং চীনাবাদাম, রেড়ি, তিসি ও সরিষার বীজে যথেষ্ট পরিমাণে তৈল থাকে।

পশু ও মানুষের ন্যায় উদ্ভিদও শ্বাসক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, অর্থাৎ অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়িয়া দেয়। বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সঞ্চিত খাদ্য ভাঙ্গিয়া আবশ্যকীয় শক্তি মুক্ত করিবার জন্য সকল জীব শ্বাস গ্রহণ করে। এমন কি, অব্যক্ত বীজেও শ্বাসক্রিয়া চলিতে থাকে।

উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে এবং অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে। অঙ্গজ জনন উদ্ভিদের অংশ বিশেষ যেমন কাণ্ড, মূল, পত্র বা মুকুল বিচ্ছিন্ন করিয়া রোপণ করা হয় এবং তাহা হইতে নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। এই ভাবে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার অঙ্গজ জনন পদ্ধতি, যেমন শাখা-কলম, চোক-কলম, দাবা-কলম প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

উদ্ভিদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় ও তাহাদিগকে সনাক্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

প্রশ্ন

১। উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি কিভাবে হয় এবং কেন হয়?

২। উদ্ভিদের জলের প্রয়োজনীয়তা কি?

৩। উদ্ভিদ হইতে জলের বহির্গমন হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা কি ? বাষ্পমোচন ও বাষ্পীভবনে পার্থক্য কি ?

৪। উদ্ভিদে খাদ্য সংশ্লেষণে আলোকের প্রয়োজন হয় কি ?

৫। উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়ার আবশ্যকতা কি ?

সপ্তম অধ্যায়

কৃষিতে রসায়ন বিদ্যা

(Chemistry in Agriculture)

রসায়ন বিদ্যায় পদার্থের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক পদার্থই রাসায়নিক মৌল (element) ও যৌগ (compound) দ্বারা গঠিত। যেমন রান্নায় ব্যবহৃত সাধারণ লবণ; সমুদ্রের জল হইতে প্রাপ্ত এই লবণে দুইটি মৌল সোডিয়ম ও ক্লোরিন থাকে। উভয়ে মিলিয়া সোডিয়ম ক্লোরাইড একটি যৌগিক পদার্থ গঠিত হয় এবং ইহাকেই সাধারণ লবণরূপে আমরা খাইয়া থাকি।

সুবিধার জন্য রসায়নবিদগণ প্রত্যেক মৌলে একটি প্রতীক (symbol) আরোপ করেন। সোডিয়মকে (sodium) Na, ক্লোরিনকে (chlorine) Cl এবং সোডিয়ম ক্লোরাইডকে NaCl রূপে লেখা হয়। প্রকৃতিতে প্রায় নব্বইটি বা ততোধিক মৌল এবং সহস্রাধিক যৌগিক পদার্থ আছে। সজীব বা জড় সকল পদার্থেই মৌল ও যৌগিক পদার্থ থাকে। এই অধ্যায়ে মৃত্তিকার উর্বরতা, ক্ষারীয় মৃত্তিকার সংশোধন, উদ্ভিদ জীবন ও খাদ্য সহ কৃষির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সরল মৌল ও যৌগিক পদার্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

মৃত্তিকার উর্বরতার রসায়নতত্ত্ব (Chemistry of Soil Fertility)

ভারতে কৃষকগণ তাঁহাদের জমিতে প্রতি বৎসর প্রায় বিশ লক্ষ টন বৃক্ষ খাদ্য প্রয়োগ করেন; কিন্তু জমি হইতে প্রায় আশি লক্ষ টন বৃক্ষ খাদ্য ফসলের সহিত অপসারণ করেন। মাটিতে যে পরিমাণ যোগ হইল তাহা অপেক্ষা অধিক আরও যে ষাট লক্ষ টন বৃক্ষ খাদ্য অপসারিত হইল তাহা নিশ্চয়ই মৃত্তিকার খনিজ পদার্থ ও বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন (nitrogen) বন্ধনের ফলে সম্ভব

হইয়াছে। মৃত্তিকার খনিজ পদার্থ ও নাইট্রোজেন বন্ধন প্রতি বৎসর যথার্থই এই ষাট লক্ষ টন বৃক্ষখাদ্য সরবরাহ করিতেছে কিনা তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। যদি ইহা সত্যিই সম্ভব হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মৃত্তিকার উর্বরতা কোন প্রকারে বজায় থাকিতেছে। সম্ভবত ইহা সত্য হইতে পারে কারণ পৃথিবীর মধ্যে ভারতে শস্যের ফলন প্রায় সর্বনিম্ন এবং এ ফলন বৎসরের পর বৎসর প্রায় একই থাকিয়া যাইতেছে।

যতদিন পর্যন্ত দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ না করিতেছে ততদিন পর্যন্ত শস্যের একর প্রতি ফলন বাড়াইয়া যাইতে হইবে। রাসায়নিক সার গোবর সার, সবুজ সার ও কম্পোস্ট (compost) বা আবর্জনা সারের যথাযথ প্রয়োগে শস্যের একর প্রতি ফলন বাড়ানো সম্ভব।

মৃত্তিকার উর্বরতা বজায় (Maintaining Soil Fertility)

ফসল জন্মাইবার সময় মাটি, জল ও বায়ু হইতে নব্বইটি বা ততোধিক যৌগের প্রায় সবগুলিই বিভিন্ন পরিমাণে উদ্ভিদ শোষণ করিয়া থাকে। খামার হইতে এই ফসল বিক্রয় করিয়া দিলে ঐ বৃক্ষখাদ্যগুলি খামার হইতে অপসারিত হইল এবং নিম্নলিখিতভাবে এই সকল বৃক্ষ খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করা যায়:

১। আবহাওয়ার প্রভাবে মৃত্তিকায় খনিজ পদার্থের স্বাভাবিক ক্ষয় প্রাপ্তি।

২। কয়েকপ্রকার ব্যাকটিরিয়া কর্তৃক বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন বন্ধন (চিত্র নং ৫৬)

৩। কম্পোস্ট (compost) বা প্রাণীজ সারের (animal manure) প্রয়োগ (চিত্র নং ৫৭),

৪। রাসায়নিক সারের প্রয়োগ

উদ্ভিদ যদিও নব্বই বা ততোধিক যৌগ শোষণ করে, তন্মধ্যে ষোলটি উদ্ভিদের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে প্রতীকসহ এই সকল যৌলের নাম অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল:

মৌল		মৌল	প্রতীক
কার্বন (carbon)	(C)	ম্যাগনেশিয়ম (magnesium)	(Mg)
হাইড্রোজেন (Hydrogen)	(H)	আইরণ (iron)	(Fe)
অক্সিজেন (Oxygen)	(O)	ম্যাঙ্গানিজ (manganese)	(Mn)
নাইট্রোজেন (nitrogen)	(N)	জিংক (zinc)	(Zn)
ফসফোরস (phosphorus)	(P)	কপার (copper)	(Cu)
সালফার (sulphur)	(S)	মলিবডেনম (molybdenum)	(Mo)
পটাশিয়ম (potassium)	(K)	বোরন (boron)	(B)
ক্যালশিয়ম (Calcium)	(Ca)	ক্লোরিন (chlorine)	(Cl)
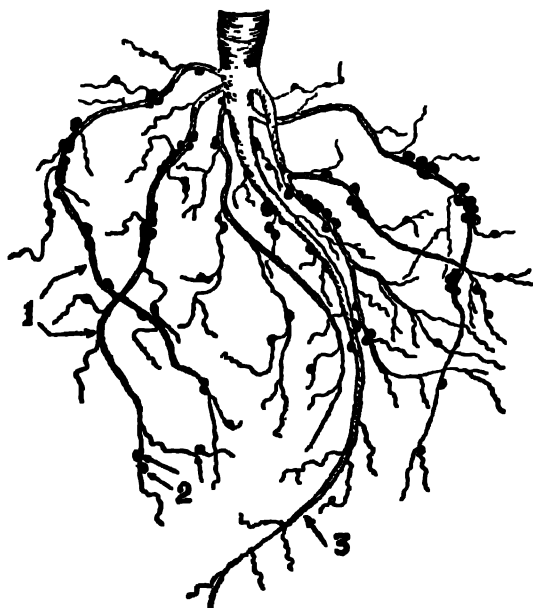
চিত্র নং ৫৬। শিম্বিগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে অর্বুদ (nodule)। ইহাদের ভিতরে, একপ্রকার ব্যাকটিরিয়া বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন বন্ধন করিয়া মাটির উর্বরতা বাড়ায়। চিত্রে লুসার্ন (lucerne) উদ্ভিদের মূল দেখানো হইয়াছে। 1. শাখা মূল, 2. অর্বুদ, 3. প্রধান মূল। (EVANS হইতে পুনরঙ্কিত)।

প্রথম তিনটি মৌল-কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বায়ু ও জল হইতে আসে। নাইট্রোজেন মূলতঃ বায়ু হইতেই আসে, কিন্তু বায়ুমণ্ডলস্থিত নাইট্রোজেনকে কেবল ডাল শস্য (শিম্বি গোত্রীয় উদ্ভিদ) ও কয়েক প্রকার ব্যাক্‌টিরিয়া মাত্র ব্যবহার করিতে পারে। অন্যান্য উদ্ভিদ যেমন ধান নাই-ট্রোজেনকে তখনই গ্রহণ করিতে পারে, যখন উহা কোন স্থায়ী রাসায়নিক যোগে পরিণত হয়। বাকী বারটি মৌল মাটি হইতে সরবরাহ হয়।

মাটির খনিজ ও জৈব পদার্থের বিয়োজনের ফলে বৃক্ষখাদ্য মৌলসমূহ উদ্ভূত হয়। কোন প্রকার রাসায়নিক ও জৈব সার বা কম্পোস্ট প্রয়োগ না করিলে ফসলের ফলন কমই থাকিয়া যায় এবং অধিকাংশ জমিতে সন্তোষজনক ফলন পাইতে হইলে এই সকল সার অবশ্যই প্রয়োগ করিতে হয়।

ভারতে শস্যের ফলন বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য বৃক্ষখাদ্য মৌলসমূহের মধ্যে নাইট্রোজেন (N) ও ফসফোরস (P) সর্বাধিক পরিমাণে জমিতে প্রয়োগ করা হয়। পটাশিয়ম (K) অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের অম্ল মাটিতে মধ্যে মধ্যে চুন ($CaCO_3$) হিসাবে ক্যালশিয়ম প্রয়োগ করা হয়।

নাইট্রোজেন ঘটিত সার হিসাবে ভারতে সাধারণত অ্যামোনিয়ম সালফেট [$(NH_4)_2SO_4$] ব্যবহৃত হয়। ইহাতে শতকরা প্রায় ২০.৫ ভাগ নাইট্রোজেন (N) থাকে। অ্যামোনিয়ম সালফেটে (ammonium sulphate) সালফারও থাকে। ইহাও একটি অপরিহার্য বৃক্ষখাদ্য মৌল। অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে অন্যান্য যে সকল নাইট্রোজেন ঘটিত সার ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে ইউরিয়াতে (urea) [$CO(NH_2)_2$] শতকরা ৪৫ ভাগ এবং অ্যামোনিয়ম নাইট্রেটে (ammonium nitrate) (NH_4NO_3) শতকরা ৩২ ভাগ নাই-ট্রোজেন থাকে। ব্যবহারে সুবিধার জন্য শেষোক্ত সারে চুন ($CaCO_3$) যোগ করা থাকে।

অ্যামোনিয়ম (NH_4^+) ও নাইট্রেট (NO_3^-) উভয়প্রকার নাইট্রোজেনই উদ্ভিদ শোষণ করিতে পারে। উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত হইবার পূর্বে ইউরিয়া ব্যাকটিরিয়া কর্তৃক অ্যামোনিয়মে (NH_4^+) পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক।

ভারতে ফসফোরস ঘটিত সার সচরাচর সুপার ফসফেট (super phosphate)-রূপেই জমিতে প্রয়োগ করা হয়। ইহা একটি জটিল যৌগিক পদার্থ এবং ইহাতে তিন প্রকার ক্যালশিয়ম ফসফেট (calcium phosphate) থাকে। সুপার ফসফেটে শতকরা ১৬ ভাগ জলে দ্রবণীয় ফসফোরস থাকে। সুপার ফসফেটের পরেই ফসফোরস ঘটিত সার হিসাবে হাড়ের গুঁড়ার (bone meal) স্থান। ইহাতে মুখ্যত ট্রাই ক্যালশিয়ম ফসফেট (tri-calcium phosphate) [$Ca_3(PO_4)_2$] থাকে। হাড়ের গুঁড়ায় শতকরা ২৫ ভাগ ফসফেট থাকে।

পটাশিয়ম ঘটিত সার হইল পটাশিয়ম সালফেট (potassium sulphate) (শতকরা ৪৮ ভাগ K_2O) ও পটাশিয়ম ক্লোরাইড (potassium chloride) (শতকরা ৫০ হইতে ৬০ ভাগ K_2O)। কাঠের ছাইও অনেক সময় পটাশিয়ম ঘটিত সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইহাতে শতকরা প্রায় ৪ ভাগ K_2O ও ৪০ ভাগ চুন ($CaCO_3$) থাকে।

ক্যালশিয়ম সচরাচর কাঠের ছাই ও চূর্ণ চুনাপাথর হিসাবে জমিতে প্রয়োগ করা হয়। চুনাপাথরে শতকরা ৭৫ হইতে ৯০ ভাগ ক্যালশিয়ম কার্বনেট ($CaCO_3$) থাকে। পোড়ানো চুনাপাথর ব্যবহারেও সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। ইহাতে ক্যালশিয়ম হাইড্রক্সাইড (calcium hydroxide) [$Ca(OH)_2$] ও ক্যালশিয়ম অক্সাইড (calcium oxide) [CaO] থাকে।

মৃত্তিকা পরীক্ষা (Soil Testing)

জমিতে ঠিক কত পরিমাণ সার ও চুন প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা কৃষক কি করিয়া স্থির করিবে?

জমির মৃত্তিকার নমুনা পরীক্ষা করিয়া এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। সম্প্রতি এক নূতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে ভারতীয় কৃষিবিদ্‌গণ এই প্রশ্নের জবাব দিতেছেন। অধুনা কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় দেশে পঁচিশটি মৃত্তিকা পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল পরীক্ষাগারে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি আছে এবং মৃত্তিকা বিশ্লেষণের রসায়নতত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ মৃত্তিকা রসায়নবিদগণ ইহাদের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সুপারিশসমূহ যাহাতে সরল ও ব্যবহারিক হয় তাহার জন্য মৃত্তিকা রসায়নবিদগণ কৃষক ও কৃষিবিদগণের সহিত

চিত্র নং ৫৭। আদিম মানুষ যখন লক্ষ্য করিল যে গোবর সারের নিকটবর্তী উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত বড় হইয়াছে, সেই সময় হইতে ফসল বৃদ্ধির জন্ত কৃষকগণ তাহাদের খামার-জাত সকল সার জমিতে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল।

[H .R. ARAKERI মহাশয়ের সৌজন্যে

হাতে হাত মিলাইয়া কাজ করিতেছেন। এ সকল পরীক্ষাগার এমনভাবে গঠিত হইয়াছে যাহাতে বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডারকে ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ করা যায়। কৃষকগণ বিনামূল্যে তাহাদের জমির মৃত্তিকার নমুনা পরীক্ষা করাইতে পারেন। প্রারম্ভে প্রধান বৃক্ষখাদ্যসমূহ (নাইট্রোজেন, ফসফোরস ও পটাশিয়ম) ও চুনের প্রয়োজনীয়তা এবং লবণাক্ততা সম্পর্কে তৎপরতার সহিত সুপারিশ প্রেরণ করিবার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে।

মৃত্তিকা রসায়নবিদ পরীক্ষাগারে মৃত্তিকার নমুনা বিশ্লেষণের ফলাফল, জমিতে মৃত্তিকার গঠন, পূর্বে কি কি ফসল জন্মানো হইয়াছে ও কি প্রকার ফলন পাওয়া গিয়াছে এবং জমির উর্বরতা সংরক্ষণের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া সুপারিশ করেন। জমি সেচযুক্ত, না বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল, তাহাও তাঁহাকে বিবেচনা করিতে হয়। জমিতে জলের অভাব না ঘটিলে তিনি তাঁহার সুপারিশে সার প্রয়োগের মাত্রা বাড়াইতে পারেন। জমিতে কোন্ ফসলের চাষ করা হইবে, তাহার বৃক্ষখাদ্যের চাহিদা কত এবং কত আর্থিক লাভ হইবে তাহাও তাঁহাকে জানিতে হইবে। কৃষক তাঁহার ফসলের উত্তম পরিচর্যা করেন কিনা এবং সার ক্রয়ের আর্থিক সামর্থ্য আছে কিনা তাহাও মৃত্তিকা রসায়নবিদের জানা দরকার। সাধারণত ফসলের উত্তম পরিচর্যা করিলে অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় সার প্রয়োগে একর প্রতি লাভের হার অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। মৃত্তিকা রসায়নবিদ উক্ত বিষয়সমূহ বিচার-বিবেচনা করিয়া এমন সুপারিশ করেন যাহার উপর কৃষক সম্পূর্ণ আস্থা রাখিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতায় এইরূপ একটি পরীক্ষাগার আছে। সম্প্রতি বর্ধমানেও একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

কৃষকদের নিজ নিজ এলাকার কৃষি আধিকারিক হইতে মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ ও তৎসম্পর্কীয় তথ্যাবলী সম্পর্কে যাবতীয় নির্দেশ পাওয়া যাইবে। বিভিন্ন পরীক্ষাগারের নির্দেশাবলীর মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও নিম্নে মোটামুটি ভাবে অনুমোদিত নির্দেশাবলী প্রদত্ত হইল :

১। প্রত্যেক জমিখণ্ড হইতেই পৃথক পৃথক নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে। একই জমির ভিতরে আবার বিভিন্ন স্থানের মাটির মধ্যে প্রকৃতি, জল নিকাশন, মাটির গ্রথন (texture) ও বর্ণগত পার্থক্য থাকিলে বিভিন্ন স্থান হইতে পৃথক পৃথক নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে। জমি অসমতল হইলে বা অতীতে বিভিন্ন

ভাবে ব্যবহৃত হইলেও অনুরূপ পৃথক নমুনা সংগ্রহ করিতে হয়। জমির আয়তন ১০ একরের অধিক হইলে জমিকে ১০ একর করিয়া ভাগ করিতে হইবে এবং তাহার পর প্রত্যেক ভাগ হইতে নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে।

২। প্রত্যেক প্রকার জমি হইতে একাধিক নমুনা লইয়া মিশ্রিত করিয়া একটি নমুনা তৈয়ারি করিতে হইবে। নমুনা সংগ্রহের জন্য সরু চোঙ্গা, তুরপুন (auger) বা সরু মুখবিশিষ্ট খুরপি ব্যবহার করা যায়। মাটি খুব ঝুর-ঝুরে হইলে একটি বড় চামচ বা কাস্তের সাহায্যেও নমুনা সংগ্রহ করা যায়।

৩। জমির প্রায় দশটি স্থানের উপরিতল হইতে লাঙ্গল যতদূর গভীরতায় প্রবেশ করে ততদূর পর্যন্ত একটি সরু মাটির ফালি সংগ্রহ করিতে হইবে। ফালিগুলি একটি পাত্রে সংগ্রহ করিয়া পাত্রের মধ্যেই বা একটি পরিষ্কার কাগজ বা কাপড়ের উপর উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে ৫০০ গ্রাম ওজনের একটি নমুনা লইতে হইবে।

৪। প্রতিনিধিমূলক নয় জমির এইরূপ স্থানগুলি যেমন পুরানো বাঁধ, জলা জায়গা, পুকুর, এবং রাস্তা, বৃক্ষ, জমির আইল, কম্পোস্টের স্তূপ বা বাড়ী-ঘরের নিকটবর্তী স্থানের মাটি হইতে নমুনা সংগ্রহ করা চলিবে না।

৫। জমির আর্দ্রতা যখন লাঙ্গল চালাইবার উপযুক্ত থাকে তখনই নমুনা সংগ্রহ করিতে সুবিধা হয়। লাঙ্গল চালাইবার পরই নমুনা সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

৬। চুন, ছাই, কম্পোস্ট ও সার প্রয়োগের পর তিন মাসের মধ্যে নমুনা সংগ্রহ করা চলিবে না।

৭। নমুনার মধ্যে ঢেলা থাকিলে সেগুলি শুষ্ক হইবার পূর্বেই ভাঙ্গিতে হইবে। ভিজা নমুনাগুলি কৃত্রিম তাপের সহায়তা ছাড়াই শুষ্ক করিতে হইবে, সেজন্য ছায়ায় বিছাইয়া শুষ্ক করিতে হয়।

৮। যথাযথ পরিমাণ (সাধারণত ৫০০ গ্রাম) নমুনা মৃত্তিকা পরীক্ষাগারে পাঠাইবার জন্য একটি পরিষ্কার কাপড় বা কাগজের ব্যাগ বা কার্ডবোর্ডের বাক্সে রাখিতে হইবে।

৯। প্রত্যেক নমুনায় একটি সংখ্যা ও কৃষকের নামযুক্ত লেবেল আঁটিতে হইবে। একটি খসড়া মানচিত্রে খামারের কোন্ কোন্ স্থান হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা নির্দেশ করিতে হইবে।

১০। তথ্য তালিকাটি (information sheet) যথাসম্ভব ভর্তি করিতে হইবে। সুপারিশ-নির্দেশে ইহা খুব কাজ দেয়। নমুনার প্যাকেট বন্ধ করিবার পূর্বে তথ্য তালিকাটি তাহার ভিতরে রাখিতে হইবে।

লাবণিক মাটি (Saline Soils)

পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া, ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলায় লাবণিক মাটি দেখা যায়। শুষ্ক অবস্থায় জমির উপরে লবণের সাদা স্তর বা মাটির ভিতরে লবণ কণিকা দ্বারা এই মাটি চিনিতে পারা যায়। লাবণিক মাটির রাসায়নিক ধর্ম প্রধানত লবণের প্রকার ও পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। লবণের গাঢ়ীভবন মাটির দ্রবণের অসমোটিক চাপকে প্রভাবিত করে; ফলে উদ্ভিদ কম জল শোষণ করে এবং চরম অবস্থায় জল শোষণ করিতে না পারিয়া মারা যায়।

জমিতে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকার জন্য লাবণিক মাটির গঠন খুবই উন্নত থাকে। উত্তম জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা দ্বারা উক্ত লবণগুলি ধৌতকরণ প্রক্রিয়ায় অপসারণ করা যায় এবং মাটিকে লবণমুক্ত ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায়।

মাটির লবণতার কারণ (Factors Responsible for Salinity)

মাটির লবণতার জন্য তিনটি প্রধান কারণ দায়ী :

(১) বিশুষ্ক ও প্রায়-বিশুষ্ক জলবায়ু

(২) অপ্রচুর জলনিষ্কাশন

(৩) জলসেচন

আর্দ্র অঞ্চলের ন্যায় বিশুষ্ক অঞ্চলে দ্রবণীয় লবণগুলি ধৌতকরণ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হয় না। এই সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত যেমন কম, তাপমাত্রাও আবার বেশি। কাজেই বাষ্পীভবন দ্রুততর হয়। ভূগর্ভস্থ জল বাষ্পীভবন হেতু মাটির উপরে উঠিলে জল বাষ্পীভূত হইয়া যায়; কিন্তু লবণগুলি মাটির উপরে জমা হইতে থাকে। অপরপক্ষে আর্দ্র অঞ্চলে মাটির লবণ ধৌত হইয়া ভূগর্ভে চলিয়া যায় এবং তথা হইতে নদী-নালায় বাহিত হইয়া সমুদ্রে চলিয়া যায়। কাজেই সমুদ্র-জল প্লাবিত অঞ্চল ব্যতীত আর্দ্র অঞ্চলে লাবণিক মাটি গঠিত হইতে পারে না।

অপ্রচুর জল নিকাশন ও জমির লবণতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মাটির দুর্ভেদ্যতা, উঁচু জলপীঠ, প্রতিকূল ভূসংস্থান, স্বাভাবিক নদীনালার অভাব (স্বল্প বৃষ্টিপাত হেতু) প্রভৃতি অপ্রচুর জল নিকাশনের জন্য দায়ী। চারিদিকে উঁচু জমি বেষ্টিত নিম্নভূমিতে জলনিকাশনের পথ না থাকিলে, ঐ জমিতে চতুর্দিকস্থ উঁচু জমি হইতে নিকাশিত জলের মাধ্যমে লবণ জমা হয়। এই প্রকার জমিতে জলপীঠ উপরে উঠিয়া আসে এবং অস্থায়ী বা স্থায়ী লবণ হ্রদ গঠিত হয়।

জলসেচনের ফলেও জমি লাবণিক হইতে পারে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে সেচজলে যেন অত্যধিক লবণ না থাকে। প্রতি লক্ষ ভাগ জলে ১০০ ভাগের বেশি লবণ থাকিলে সেচজল ক্ষতিকারক হয়।

লাবণিক মাটি সংশোধন (Reclamation of Saline Soils)

ন্যূনতম ব্যয়ে লাবণিক জমি সংশোধনের একমাত্র উপায় হইল ধৌতকরণ (leaching) প্রক্রিয়া এবং তাহার জন্য আবশ্যক উত্তম জল নিকাশন ব্যবস্থা। জলপীঠ উদ্ভিদমূলের স্তর হইতে অন্ততঃপক্ষে ৮-১০ ফুট নিচে রাখিতে হইবে। স্বাভাবিকভাবে জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকিলে কৃত্রিম উপায়ে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিবার পর লবণগুলি ধুইয়া ফেলিতে হইবে। বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোচনে যত জলের প্রয়োজন, এজন্য তদপেক্ষা বেশি জল প্রয়োগ করিতে হইবে। জলে লবণের পরিমাণ, মাটির প্রকার, মাটিতে জমা লবণের পরিমাণ প্রভৃতি কারণের উপর জলের পরিমাণ নির্ভর করে। মোটা মুটিভাবে বলা যায়, সেচনে যত জল প্রয়োজন তদপেক্ষা ৫-৩০% অধিক জল প্রয়োগ করা দরকার। জমিতে প্রশম (neutral) লবণ অত্যধিক থাকিলে জমিকে প্লাবিত করিয়া গভীর অনাবৃত নালার সাহায্যে যতটা সম্ভব লবণ অপসারিত করিয়া তারপর ধৌতকরণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা সুবিধাজনক। ভারী যন্ত্র সাহায্যে যেখানে চাষ করা হয়, সেখানে জমির উপরিতল চাঁচিয়া ফেলিয়াও লবণগুলিকে অপসারিত করা যায়। চাঁচিবার দরুন যে মাটি উঠিয়া আসে তাহা বাঁধ তৈয়ার করিবার কাজে ব্যবহার করা যায়।

ধৌতকরণ প্রক্রিয়া চলাকালে লবণ-সহিষ্ণু ফসলের চাষ করিয়া জমির উন্নতি সাধন করা যায়। ধান (বিশেষ জাত), মিষ্ট ক্লোভার (clover), ইক্ষু প্রভৃতি ফসল এজন্য বিশেষ উপযোগী।

ক্ষারীয় মাটি সংশোধন (Reclamation of Alkali Soils)*

মাটিতে ক্ষার পদার্থ থাকে বলিয়া ভারতের প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ একর জমির উর্বরতা অপেক্ষাকৃত কম। অধিকাংশ ক্ষারীয় মাটি পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানে অবস্থিত, অবশ্য অন্যান্য স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলেও কিছু কিছু ক্ষারীয় মাটি দেখা যায়।

ক্ষারীয় মাটি সংশোধনে জিপসাম
(Gypsum for Reclaiming Alkali Soils)

জিপসাম (ক্যালশিয়ম সালফেট $CaSO_4$) প্রয়োগে অধিকাংশ ক্ষারীয় মাটি সংশোধন করা যায়। স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া রাজস্থানে জিপসাম সহজলভ্য। উত্তমরূপে জল নিকাশ হয় এইরূপ দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি এবং দ্রবণীয় স্বল্প সোডিয়ম (Na) যুক্ত ক্ষারীয় মাটি সহজেই সংশোধন করিয়া শস্য উৎপাদনের উপযোগী করা যায়।

জিপসাম প্রয়োগে কোন জমি সংশোধন করা যাইবে কিনা তাহা স্থির করিতে হইলে ঐ জমির জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা কিরূপ তাহা জানিতে হইবে। জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা উত্তম হইলে, নিকটবর্তী মৃত্তিকা পরীক্ষাগারে মাটির একটি নমুনা পাঠাইতে হইবে। পরীক্ষায় যদি জানা যায় যে একর প্রতি তিন টন জিপসামের আবশ্যক হইবে, তবে সেই পরিমাণই প্রয়োগ করিতে হইবে। সংশোধনের রাসায়নিক ক্রিয়া নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

মাটিতে অত্যধিক পরিমাণে সোডিয়মের (Na) উপস্থিতিতে মাটি ইটের মত শক্ত ও দৃঢ় হইয়া যায়। এই দৃঢ় বা নিবিড় (compact) মাটির ভিতর দিয়া জল সহজে নিচের দিকে প্রবেশ করিতে পারে না; কাজেই দ্রবণীয় লবণসমূহ

* সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে: Aggarwal, A. A., *Alkali Soils Can Be Reclaimed*, Indian Farming, Volume VII, Number 9, December 1957, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

মাটির উপরিভাগে ও উদ্ভিদের মূল অঞ্চলে (root zone) জমা হয়। ফলে মাটির ক্ষতিকারক লবণসমূহের আধিক্য ও মূল বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিমাণ বায়ুর অভাব ঘটে (চিত্র নং ৫৮)। চরম অবস্থায় সকল উদ্ভিদ মারা যায়, মৃদুতর অবস্থায় কেবল ক্ষার-সহিষ্ণু উদ্ভিদসমূহই বাঁচিতে পারে।
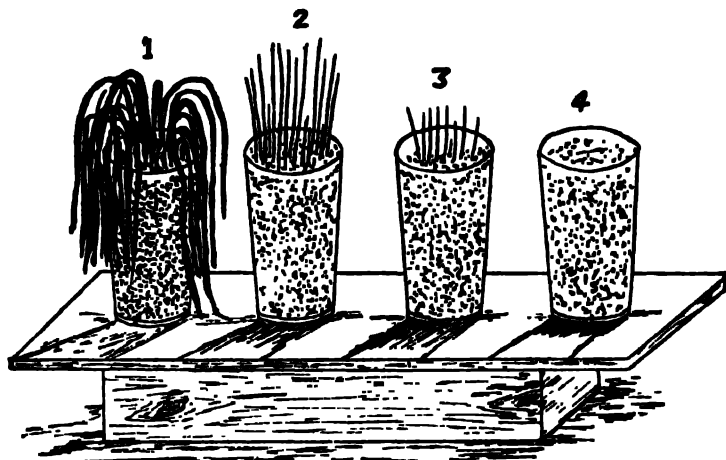
চিত্র নং ৫৮। গমের বৃদ্ধির উপর লবণবাহুল্যের (salt concentration) প্রভাব: 1. লবণ বিহীন, 2. শতকরা এক ভাগ লবণের এক দশমাংশ (০·১%), 3. শতকরা এক ভাগ লবণের পনর শতাংশ (০·১৫%), 4. শতকরা এক ভাগ লবণের দুই দশমাংশ (০·২%)।

[WEAVER : হইতে পুনরঙ্কিত]।

ক্ষারীয় মাটিতে প্রযুক্ত জিপসামের দ্রবণীয় ক্যালশিয়ম (Ca), মাটির অধিকাংশ সোডিয়মকে (Na) প্রতিস্থাপন করে। জিপসাম প্রয়োগের পরে প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করিলে সোডিয়ম (Na) মূল অঞ্চলের নিচে ধুইয়া চলিয়া যায়। মাটির উপরিভাগে তখন প্রচুর ক্যালশিয়ম থাকে যাহা মৃত্তিকা কণিকাগুলিকে পুনর্বিন্যাস করিয়া শিথিল বা অপেক্ষাকৃত ঝুরঝুরে মাটি গঠনে সাহায্য করে। ফলে মাটিতে ক্ষতিকারক লবণের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং উদ্ভিদ-মূল বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিমাণ বায়ুর অভাব ঘটে না (চিত্র নং ৫৯)।

জিপসামকে ক্ষারীয় মাটির সংশোধনে সাহায্য করিবার জন্য ধইঞ্চার (*Sesbania aculeata*) সাহায্যে সবুজ সারের চাষ করা আবশ্যক।
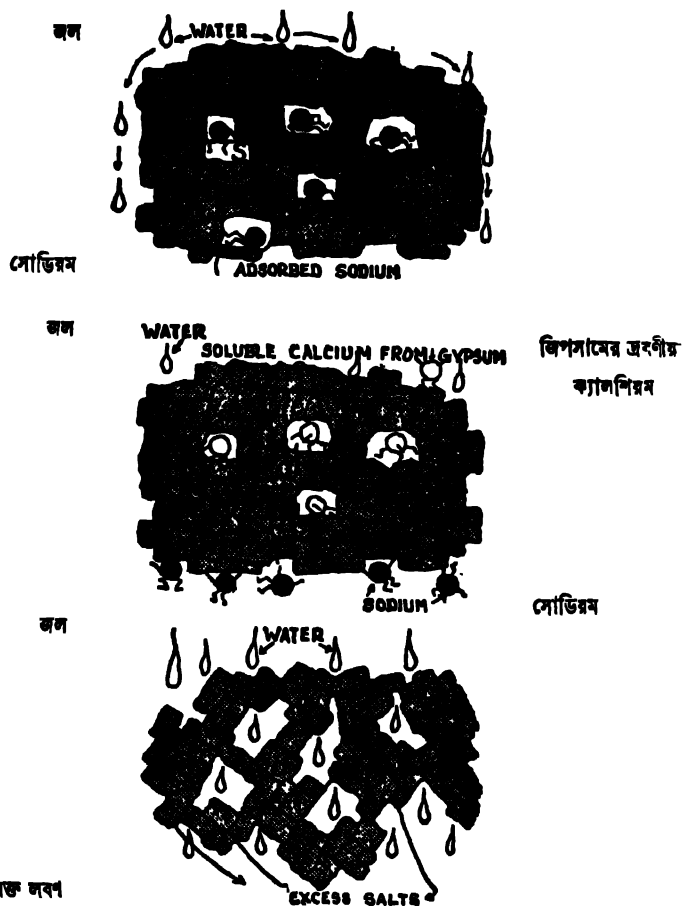
চিত্র নং ৫৯। জিপসাম ($CaSO_4$) কিভাবে ক্ষারীয় মাটি সংশোধন করে।

[ALDRICH and SCHOONOVER ;- হইতে পুনরঙ্কিত]

কেবল ধইঞ্চার চাষে, কেবল জিপসাম প্রয়োগে, এবং উভয়ের একত্র প্রয়োগে, উত্তর প্রদেশের কৃষকদের জমিতে ফলন যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

প্রয়োগ	যে জমিতে কোন কিছু প্রয়োগ করা হয় নাই, তাহা অপেক্ষা প্রযুক্ত জমিতে চাউলের ফলন বৃদ্ধি
ধইঞ্চা	শতকরা ৩৮ ভাগ
জিপসাম	" ৯১ "
ধইঞ্চা ও জিপসাম	" ১১০ "

কাজেই দেখা যাইতেছে যে ক্ষারীয় মাটিতে চাউলের ফলন ধইঞ্চায় শতকরা ৩৮ ভাগ ও জিপসামে শতকরা ৯১ ভাগ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ধইঞ্চা ও জিপসামের একত্র প্রয়োগে শতকরা ১১০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।*

ক্ষার-সহিষ্ণু ফসল নির্বাচন
(Selection of Crops Tolerant to Alkali)

যব, তুলা, খেজুর, পালং, শতমূলী (asparagus) প্রভৃতি ফসল খুবই ক্ষার-সহিষ্ণু। প্রায় সকল প্রকার শিম ও নাশপাতি, আপেল, কমলালেবু, আঙ্গুর, লেবু প্রভৃতি ফলের গাছ ও লতা মোটেই ক্ষার-সহিষ্ণু নয়। ক্ষার-সহিষ্ণু নয় এই প্রকার ফসল কোন ক্ষেত্রেই ক্ষারীয় মাটিতে রোপণ করা উচিত নয়।

স্বল্প ক্ষারযুক্ত অঞ্চলে ক্ষার-সহিষ্ণু ফসলের চাষ করিলে উত্তম ফলন পাওয়া যায়। অধিক ক্ষারযুক্ত অঞ্চলে প্রথমে জিপসাম প্রয়োগ করিয়া তারপর ক্ষার-সহিষ্ণু ফসলের চাষ করা উচিত।

উদ্ভিদ জীবনের রসায়নতত্ত্ব (Chemistry of Plant Life) †

বীজের একমাত্র সজীব অংশ হইল জ্রূণ (embryo or germ)। বীজের অবশিষ্টাংশ সঞ্চিত খাদ্য, যথা, শ্বেতসার বা স্টার্চ (starch), প্রোটিন (protein) ও খনিজ পদার্থ দ্বারা গঠিত। উভয় অংশই বীজত্বক (hull or seed coat) দ্বারা আবৃত থাকে। জ্রূণের মধ্যে সামান্য পরিমাণে শর্করা (sugar) ও তৈল (oil) থাকে। জ্রূণ যখন বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন এই শর্করা ও তৈল কয়েকদিন পর্যন্ত জ্রূণের খাদ্য সরবরাহ করে। জ্রূণের চারিদিকে

* মনে রাখিতে হইবে যে শতকরা ১০০ ভাগ ফলন বৃদ্ধির অর্থ দ্বিগুণ ফলন।

† সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে : Berne, Erwin J, *"Chemistry in the Corn Field"*, Better Crops with Plant Food. September-October, 1955. American Potash Institute, Washington, D.C., U.S.A.

থাকে প্রচুর সঞ্চিত খাদ্য। শিশু উদ্ভিদ যতদিন পর্যন্ত না নিজের মূলের সাহায্যে মাটি হইতে খনিজ পদার্থ সংগ্রহ এবং সবুজ পাতা সূর্যালোকের শক্তির সাহায্যে জৈব খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারিতেছে ততদিন পর্যন্ত ইহা ঐ সঞ্চিত খাদ্যের সাহায্যে বাঁচে ও বৃদ্ধি পায়।

উষ্ণ ও আর্দ্র মাটিতে বীজ বপন করিলে নানাপ্রকার ক্রিয়ার সূচনা হয়। মাটির জল ধীরে ধীরে বীজত্বকের ভিতর দিয়া বীজের মধ্যে প্রবেশ করে, বীজ ফুলিয়া উঠে এবং তাপমাত্রা অনুকূল হইলে অব্যক্ত উদ্ভিদশিশু জাগিয়া উঠে এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুত শ্বাস গ্রহণ করে (চিত্র নং ৬০)।

ইহার রসায়নতাত্ত্বিক অর্থ হইল কোষমধ্যস্থিত শর্করা অপেক্ষাকৃত দ্রুত অক্সিজেনের (O) সহিত মিশ্রিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও
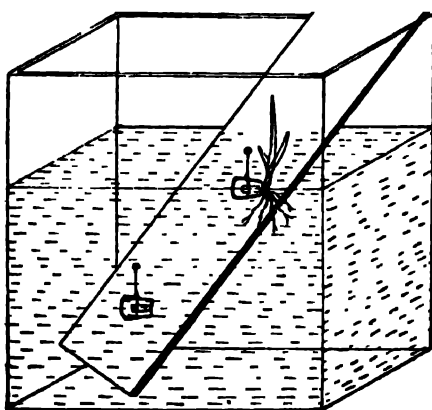
চিত্র নং ৬০। তাপমাত্রা, জল ও বায়ু অনুকূল হইলে তবেই বীজ অঙ্কুরিত হইবে। উপরের পরীক্ষায় জলের মধ্যে দাঁড় করানো এক খণ্ড কাঠে তিনটি শিমের বীজ আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতি অল্প অক্সিজেনের জন্য জলের অভ্যন্তরস্থ বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই। সর্বোপরিস্থ বীজ যথেষ্ট জলের অভাবে অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই। মধ্যের বীজটি যথেষ্ট জল ও বায়ু পাইয়াছে। তাপমাত্রা তিনটি বীজের ক্ষেত্রেই এক।

[NARAYANAN : হইতে পুনরঙ্কিত]

জল (H_2O) গঠন করে এবং যে শক্তি মুক্ত হয় তাহা সদ্য-জাগ্রত শিশু উদ্ভিদ ব্যবহার করে।

'শ্বাস প্রশ্বাসের' জন্য অবিরাম শর্করার সরবরাহ আবশ্যক এবং ভ্রূণস্থিত শর্করা নিঃশেষিত হইলে সজীব কোষগুলি বীজে সঞ্চিত শ্বেতসার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। শ্বেতসার জলে অদ্রবণীয়, কাজেই ভ্রূণে পৌঁছিবার পূর্বে তাহা শর্করায় পরিণত হওয়া আবশ্যক। শ্বেতসার হইতে প্রস্তুত শর্করা জলে দ্রবণীয়, তাহা ভ্রূণে গিয়া ভ্রূণের খাদ্যের প্রয়োজন মিটায়। অনুরূপভাবে কোষ কয়েকটি পদার্থ [এনজাইম (enzyme)] প্রস্তুত করে যাহা প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থকে দ্রবণীয় শর্করায় পরিণত করে এবং বর্ধিষ্ণু উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করে। শিশুউদ্ভিদ যখন বীজ হইতে উৎপন্ন হইতে থাকে তখন কিছু কিছু সঞ্চিত খনিজ পদার্থও জলে দ্রবীভূত হইয়া নানাপ্রকার ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে।

শর্করা জারণের (oxidation) ফলে উদ্ভূত শক্তির সাহায্যে অঙ্কুরিত ভ্রূণ তাহার প্রাথমিক মূলের অগ্রভাগ মাটির ভিতরে এবং কাণ্ড ও প্রথম পত্র-গুলিকে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করায়। মাটি হইতে পত্র নির্গত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের ভিতরে সবুজ রঞ্জক (pigment-chlorophyll) গঠিত হয় এবং তাহাদের উপর সূর্যের আলোক পড়িলে তাহারা এক প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া আরম্ভ করে—ইহাকে বলা হয় সালোক-সংশ্লেষ (photo-synthesis)।

সালোক-সংশ্লেষ শ্বাসক্রিয়ার (respiration) ঠিক বিপরীত কাজ করে। সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়ায় পত্ররন্ধ্র (stomata) নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতর দিয়া প্রবিষ্ট বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও মাটি হইতে মূলের সাহায্যে শোষিত জল (H_2O) মিলিয়া শর্করা গঠন করে ও অক্সিজেন (O) ছাড়িয়া দেয়। এই ক্রিয়ায় ক্লোরোফিল অনুঘটকরূপে (catalyst) কাজ করে ও সূর্যালোক শক্তি যোগায়। এই শক্তির কিছু অংশ শর্করারূপে সঞ্চিত হয় এবং শ্বাসক্রিয়া ও বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয় (চিত্র নং ৬১)।

নূতন পাতা সবুজ হওয়ার পর সালোক-সংশ্লেষ আরম্ভ হইলে শাখা (secondary) মূল মাটিতে প্রবেশ করে এবং জল ও খনিজ পদার্থসমূহ শোষণ করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় উদ্ভিদ তাহার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রস্তুতের একটি স্বনির্ভর রাসায়নিক কারখানাতে পরিণত হয়। উদ্ভিদের পরবর্তী
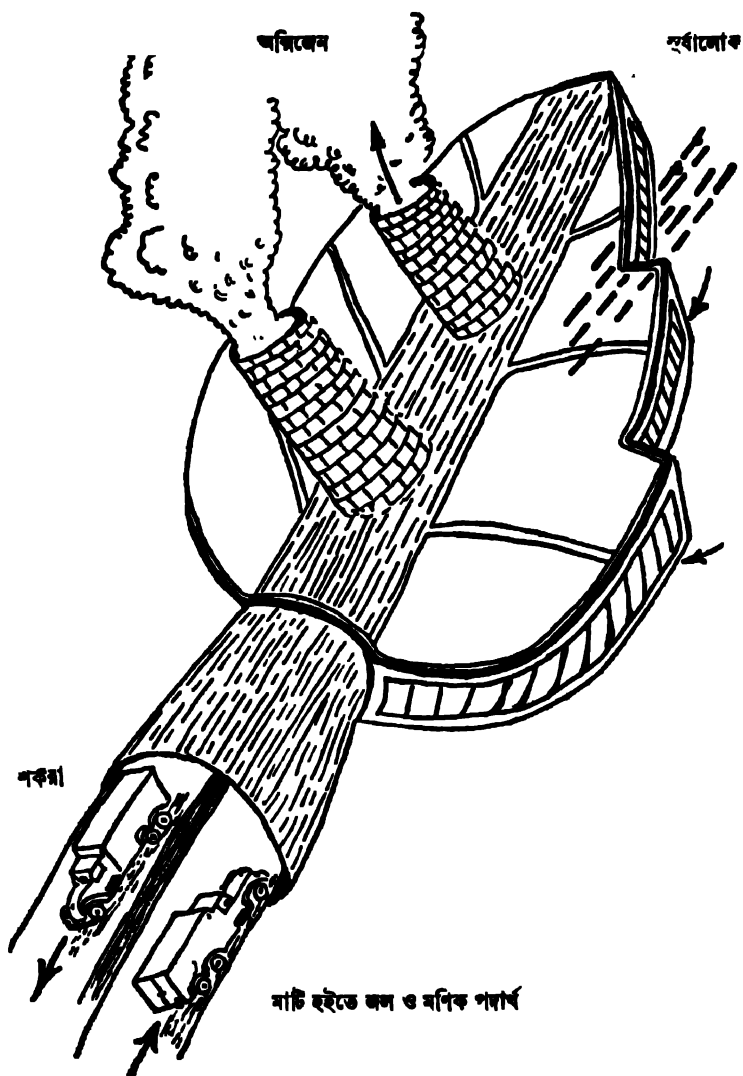
চিত্র নং ৩১। সবুজপত্র পৃথিবীর প্রাথমিক খাদ্যের কারখানা। পাতার সবুজ ক্লোরোফিল মাটি হইতে প্রাপ্ত খনিজ পদার্থ, বায়ু হইতে প্রাপ্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও সূর্যালোক হইতে প্রাপ্ত শক্তির সাহায্যে শর্করা প্রস্তুত করে। কিছু শর্করা যেমন ইক্ষুতে যাহা পাওয়া যায় তাহা মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, আর কিছু শর্করা শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থে পরিণত হয় এবং সেইগুলি মানুষের বা পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

[ROY L. DONAHUE : মহাশয়ের সৌজন্যে]।

জীবনে যখন উহা বৃদ্ধি পায়, বয়োপ্রাপ্ত হয়, জননে অংশগ্রহণ করে এবং মারা যায় তখন সালোকসংশ্লেষ ছাড়া আরও বহু জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই সকল ক্রিয়া উদ্ভিদকে মাটি ও বায়ু হইতে প্রাপ্ত সরল পদার্থগুলিকে জটিল যৌগিকে (compound) পরিণত করিয়া ইহার মূল, কাণ্ড, পত্র ও নূতন বীজ গঠনে সহায়তা করে (চিত্র নং ৬২)।

প্রত্যেক কারখানার ন্যায় উদ্ভিদেরও কাঁচা মাল আমদানি ও তৈয়ারি মাল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা আছে। কাণ্ডের ভিতরে কয়েকটি জলের স্রোত মূল হইতে খনিজ পদার্থ পাতায় বহন করিয়া লইয়া যায়, অপর কয়েকটি জলের স্রোত বিপরীত মুখে বহিয়া যায় এবং পাতা হইতে তৈয়ারি শর্করা বর্ধিষ্ণু কোষ বা যেখানে ইহা সঞ্চয় করা হইবে সে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বহন করিয়া লইয়া যায়। সালোক-সংশ্লেষে যে শর্করা প্রস্তুত হয় তাহার কিছু অংশ উদ্ভিদের কোষসমূহ শ্বাসক্রিয়ার জন্য ব্যবহার করে। কিছু অংশ শ্বেতসার বা স্নেহ পদার্থে পরিবর্তিত হইয়া সঞ্চিত খাদ্যে পরিণত হয়। কিছু অংশ সেলুলোজে (cellulose) পরিণত হইয়া উদ্ভিদের কাঠামো গঠন করে এবং অবশিষ্ট কিছু অংশ নাইট্রোজেন, সালফার ও ফসফোরসের সহযোগে প্রোটিন গঠন করে, যাহা বর্ধিষ্ণু উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাজম গঠনে প্রয়োজন হয়।

প্রয়োজন হইলে উদ্ভিদ এই সকল পরিবর্তনকে উল্টাইয়া দিতে পারে এবং শ্বেতসার, তৈল পদার্থ ও প্রোটিনকে পুনরায় শর্করায় পরিবর্তিত করিতে পারে। সালোক-সংশ্লেষ ব্যতীত উক্ত সকল ক্রিয়াই দিবারাত্র সকল সময়েই সংঘটিত হয়। সালোক-সংশ্লেষ কেবল আলোকের উপস্থিতিতে ঘটিতে পারে।

গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও জননের জন্য ন্যূনপক্ষে ষোলটি মৌলের প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদ ইহাদের মধ্যে একমাত্র অক্সিজেন (O) অযুক্ত বা মৌল অবস্থায় (elemental form) ব্যবহার করে এবং ইহা বায়ু হইতে পাওয়া যায়। বায়ু হইতে এবং উদ্ভিদের মূলের ভিতর দিয়া কার্বন ঘটিত সরল যৌগিকের যে জলীয় দ্রবণ প্রবেশ করে তাহা হইতে কার্বন (C) কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) রূপে পাওয়া যায়। জল (H_2O) হাইড্রোজেন (H) ও যুক্ত অক্সিজেন (O) সরবরাহ করে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় অবশিষ্ট সকল প্রয়োজনীয় মৌলগুলিই মাটি হইতে পাওয়া যায়। প্রয়োজনবোধে সার প্রয়োগে মাটিতে শেষোক্ত মৌলগুলির অভাব পূরণ করা যায়।
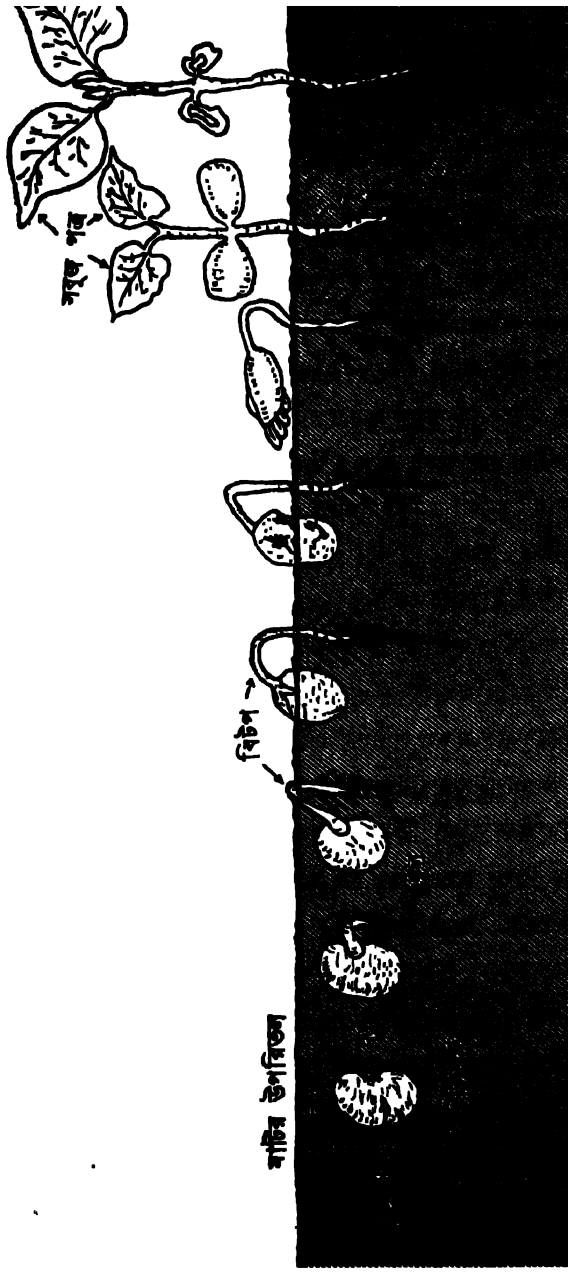
চিত্র নং ৩২। বীজের অঙ্কুরোদগম ও তৎপরে উদ্ভিদে পরিণত হইবার সময় বহু রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহাই চিত্রে একটি শিম বীজের অঙ্কুরোদগমে দেখানো হইয়াছে। ভ্রূণ ফুলিয়া উঠে এবং মূল ও কাণ্ড গঠন করে। বীজের অন্তঃস্থ সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থ শর্করায় পরিণত হয় এবং শিশু উদ্ভিদ তাহা ব্যবহার করে। সবুজপত্র ও স্থায়ী মূল গঠিত হওয়ার পরে উদ্ভিদ মাটি হইতে প্রাপ্ত জল ও খনিজ পদার্থ এবং সূর্য হইতে প্রাপ্ত শক্তির সাহায্যে নিজের খাদ্য নিজেই প্রস্তুত করে।

[NARAYANAN : হইতে পুনর্মুদ্রিত]

উদ্ভিদ জীবনের প্রথম দুই মাস দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমবর্ধমান কোষ সমষ্টির জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে। তাহাদের পাতা চওড়া ও লম্বা হয় এবং ক্লোরোফিলসমন্বিত অধিক সংখ্যক কোষের সৃষ্টি হয়। ইহাতে উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ ক্রিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সূর্যালোকিত দিনে এ সকল কর্ম-চঞ্চল কারখানাগুলি সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও জলকে (H_2O) মিলিত করিয়া নূতন শর্করা তৈয়ারি এবং তাহাকে আবার বর্ধিষ্ণু উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদানে পরিবর্তিত করে। সূর্যাস্ত হইলেও উদ্ভিদের কাজ শেষ হয় না। রাত্রিতে সদাব্যস্ত উদ্ভিদ কোষগুলি পাতা হইতে অতিরিক্ত শর্করা বহন করিয়া লইয়া যায়। কিছু শর্করা উদ্ভিদের আশু প্রয়োজনে লাগে, অবশিষ্ট শর্করা শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্নেহপদার্থে পরিবর্তিত হয় এবং ভবিষ্যত প্রয়োজনের জন্য সঞ্চয় করা হয়।

উদ্ভিদ জীবনের মধ্যভাগে আশ্চর্য রাসায়নিক ক্রিয়া-জনন আরম্ভ হয়। তখন উদ্ভিদের বেশির ভাগ রাসায়নিক ক্রিয়া নূতন জ্রূণের পরিপোষণে এবং তাহাকে ঘিরিয়া বীজের মধ্যে খাদ্য সঞ্চয়ে ব্যস্ত থাকে। ক্রমে ক্রমে উদ্ভিদের ভিতরে রাসায়নিক ক্রিয়ার উগ্রতা হ্রাস পায় এবং অবশেষে একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। তাহাদের কর্ম শেষ হয়, এবং নূতন বীজ হয় মাটিতে পড়িয়া নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে অথবা মানুষ বা পশুর খাদ্য হিসাবে সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত বীজের কিছু অংশ পুনরায় ফসল ফলাইবার জন্য সংরক্ষণ করা হয়।

খাদ্যের রসায়নতত্ত্ব (Chemistry of Foods)

মাটির খনিজ পদার্থ, জল, বায়ু ও সূর্যের শক্তির সাহায্যে উদ্ভিদ তাহার খাদ্য তৈয়ারি করে। উদ্ভিদ কর্তৃক প্রস্তুত কিছু খাদ্য পশু খায়, এবং মানুষ নির্দিষ্ট উদ্ভিদ ও পশু এবং ঐ সকল উদ্ভিদ ও পশু-জাত পদার্থ খায়। মনুষ্য-খাদ্যের প্রাথমিক উৎস হইল উদ্ভিদ এবং দ্বিতীয় উৎস হইল পশু, যেমন, ছাগল এবং পশু-জাত পদার্থ, যেমন দুধ ও ডিম।

মানুষের উদ্ভিদ-জাত খাদ্য এবং মাংস ও পশু-জাত খাদ্য অতিশয় জটিল রাসায়নিক পদার্থ। অবশ্য সকল প্রকার খাদ্যের মধ্যেই নিম্নলিখিত ছয়টি খাদ্য উপাদানের কোন কোনটি বা সবগুলি বিভিন্ন পরিমাণে উপস্থিত থাকে।

প্রোটিন (Proteins)
স্নেহ পদার্থ (Fats)
কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates)
ভাইটামিন (Vitamins)
খনিজ পদার্থ (Minerals)
জল (Water)

প্রোটিন

প্রোটিনে থাকে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, নাইট্রোজেন ও ফসফোরস। ডাল, চীনাবাদাম, শিম, মাংস, দুধ, ডিম ও মাছে প্রোটিন বেশি থাকে (চিত্র নং ৬৩)।

স্নেহ পদার্থ

স্নেহ পদার্থে থাকে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। ইহাতে প্রচুর শক্তি (energy) নিহিত থাকে। সচরাচর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত স্নেহ পদার্থ হইল নারিকেল তৈল, সরিষার তৈল, বাদাম তৈল ও তিসি। প্রাণীজ স্নেহ পদার্থ হইল মাখন, ঘি, মাছের তৈল এবং ছাগল, ভেড়া ও গরুর মাংসের চর্বি (চিত্র নং ৬৪)।

কার্বোহাইড্রেট

কার্বোহাইড্রেটে থাকে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। কার্বোহাইড্রেটের অতি পরিচিত উদাহরণ হইল শর্করা ও শ্বেতসার। চাউল, গম, জোয়ার, ভুট্টা, বাজরা ও রাগি(ragi)তে কার্বোহাইড্রেট অধিক পরিমাণে থাকে। এই সকল শস্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট থাকে। গুড়, দুধ ও আলুতেও যথেষ্ট পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট থাকে (চিত্র নং ৬৫)।

ভাইটামিনসমূহ

অতি পরিচিত ভাইটামিনসমূহ হইল ভাইটামিন এ (A), ডি (D), ই (E), কে (K), বি কমপ্লেক্স (B complex) ও সি (C)।

ভাইটামিন এ কেবল প্রাণী ও প্রাণীজ দ্রব্যেই পাওয়া যায়। পশুর হলদে রঙের চর্বি, ডিম ও কড্‌লিভার তৈলে (cod-liver oil) ভাইটামিন এ প্রচুর

পরিমাণে থাকে। হলদে ও সবুজ সব্‌জিতে এমন একপ্রকার পদার্থ (ক্যারোটিন-carotene) থাকে যাহা মানুষ ও পশুর শরীরে প্রবেশ করিয়ে ভাইটামিন এ্তে রূপান্তরিত হয়। ভাইটামিন এ-এর অভাব ঘটিলে মানুষ বা পশু রাত্রিতে দেখিতে পায় না। এই রোগকে সাধারণতঃ 'রাতকানা' (night blindness) বলে।

প্রোটিনের উৎস
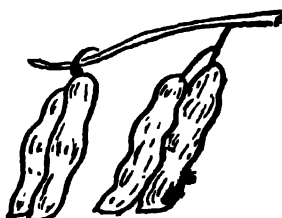
চিত্র নং ৬৩। ভারতীয় আহার্যে প্রোটিনের উৎস হইল মাংস, ডিম, মাছ, চীনাবাদাম, দুধ, শিম, ও ডাল।

["What Should We Eat?", MINISTRY OF HEALTH, NEW DELHI হইতে পুনরঙ্কিত।]

ভিটামিন ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ খাদ্য
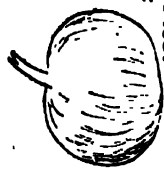
চিত্র নং ৬৬। 1. কলা, 2. আপেল, 3 আঙ্গুর, 4. নাশপাতি, 5. লেবু, 6. আম, 7. গাজর, 8. তাজা সবজি, 9. দই, 10. মাছ, 11. ডিম, 12. দুধ, 13. যকৃৎ। এই সকল খাদ্য খনিজ পদার্থ ও ভাইটামিনে সমৃদ্ধ।

["What Should We Eat"— MINISTRY OF HEALTH, NEW DELHI হইতে পুনরঙ্কিত।]

আস্ত তণ্ডুল শস্য

রাগি জোয়ার গম

ধান বাজরা ভুট্টা

চিত্র নং ৬৭। ছাঁটা চাউল, ময়দা প্রভৃতি অপেক্ষা আস্ত শস্য ভাইটামিন, কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। এ জন্য শেষোক্ত খাদ্যসমূহই খাওয়া উচিত।

নানাস্থানের পেশী হইতে রক্ত ক্ষরিত হয় এবং কখনও কখনও মৃত্যু ঘটে। লেবু জাতীয় ফল, যেমন, কমলা লেবু, সরবতী লেবু, পাতি লেবু প্রভৃতি ভাইটামিন সিতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

খনিজ পদার্থ

কার্বন (c), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), ফসফোরস (P), পটাশিয়ম (K), নাইট্রোজেন (N), সালফার (S), ক্যালশিয়ম (Ca), আয়রণ (Fe). ম্যাগনেশিয়ম (Mg), ম্যাঙ্গানিজ (Mn), কপার (Cu), জিংক (Zn), সোডিয়ম (Na), আইওডিন (I), ক্লোরিন (Cl) ও কোবাল্ট (Co) এই ১৭টি মৌল মানুষ ও পশুর পক্ষে অপরিহার্য। ইহাদের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্লোরিন ও নাইট্রোজেন খনিজ পদার্থ নয়।

ক্যালশিয়ম ও ফসফোরসের অভাব ঘটিলে মানুষ ও পশুর হাড় ও দাঁত দুর্বল হয়। আইরণের অভাবে রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা হ্রাস পায়। আইওডিনের অভাব ঘটিলে গলায় একটি গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে; এই প্রকার অবস্থাকে গলগণ্ড রোগ বলে। মানুষ ও পশুর শরীরে অন্যান্য খনিজ পদার্থের অভাবজনিত লক্ষণ এত সহজে নির্ণয় করা যায় না।

দুই অংশ হাইড্রোজেন (H) ও এক অংশ অক্সিজেন (O) লইয়া বিশুদ্ধ জল গঠিত; ইহাকে সাধারণতঃ H_2O হিসাবে লেখা হয়। কিন্তু যে জল সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কখনও বিশুদ্ধ নয়। এমন কি বৃষ্টি রূপে প্রাপ্ত জলও বায়ু হইতে অন্য পদার্থ শোষণ করে। বৃষ্টির ফোঁটা যখন ধরিত্রীর বুকে আঘাত করে তখন ইহাতে বহু ধূলি কণা থাকে এবং দ্রবীভূত অবস্থায় অ্যামোনিয়া (NH_3) থাকে।

আমাদের দেহের প্রায় ৬০ শতাংশ জলদ্বারা গঠিত। কোন ব্যক্তি খাদ্য ছাড়া পাঁচ সপ্তাহ বা ততোধিক সময় বাঁচিতে পারে; কিন্তু জল ব্যতীত কয়েকদিনও বাঁচিতে পারে না। উত্তম স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা আবশ্যক। মাথা পিছু দৈনিক গড়ে আমরা কিঞ্চিৎ অধিক এক লিটার জল পান করি এবং যে সকল খাদ্য খাই তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ অধিক আরও এক লিটার জল থাকে। ব্যায়াম করিলে বা উচ্চভূমি অঞ্চলে গরম আবহাওয়ায় কাজ করিলে জলের চাহিদা অনেকগুণ বাড়িয়া যায়।

সংক্ষিপ্তসার

সজীব বা মৃত প্রত্যেক পদার্থ রাসায়নিক মৌল দ্বারা গঠিত। এই অধ্যায়ে মৃত্তিকার উর্বরতা, লাবণিক ও ক্ষারীয় মাটির সংশোধন, উদ্ভিদ জীবন ও খাদ্য সহ কৃষি রসায়নতত্ত্বের কয়েকটি দিক আলোচিত হইয়াছে।

ফসলের ফলন বজায় রাখিতে হইলে বা তাহা বাড়াইতে হইলে অপরিহার্য রাসায়নিক মৌলগুলি প্রতিস্থাপন করিতে হইবে। কোন্ কোন্ বৃক্ষখাদ্য মৌল কি পরিমাণে মাটিতে প্রতিস্থাপন করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য মৃত্তিকা পরীক্ষা করা দরকার।

ক্ষারীয় মাটি সংশোধনের জন্য সচরাচর জিপসাম ব্যবহার করা হয় এবং এই প্রক্রিয়ার রসায়নতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে বীজের অঙ্কুরোদ্গম, শ্বাসক্রিয়া ও সালোক সংশ্লেষের রসায়নতত্ত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

মানুষের খাদ্য প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ, কার্বোহাইড্রেট, ভাইটামিন, খনিজ পদার্থ ও জল লইয়া গঠিত।

প্রশ্ন

১। একটি মৌল ও একটি যৌগিক পদার্থের উদাহরণ দাও।

২। মাটির উর্বরতা কিভাবে প্রতিস্থাপন করা যায়, তাহার চারিটি উপায় বর্ণনা কর।

৩। রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য কিভাবে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়, সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা কর।

৪। জিপসামের ব্যবহারে কিভাবে ক্ষারীয় মাটি সংশোধন করা হয় তাহা একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

৫। যে ছয়টি খাদ্য উপাদান মানুষের প্রয়োজনীয় তাহাদের নাম লিখ।

সহায়ক পুস্তক

Arakeri, H. R., G. V. Chalam, P. Satyanarayana and **Roy L. Donahue,** *Soil Management in India,* Asia Publishing House, Bombay, India, Second Edition, 1962

Comber, Norman M., J. S. Willcox and W. N. Townsend, *An Introduction to Agricultural Chemistry,* Edward Arnold (Publisher) Ltd., London 1956

Donahue, Roy L., *Our Soils and Their Management—An Introduction to Soil and Water Conservation,* The Interstate, Danville, Illinois, U.S.A,, Second Edition, 1961

Donahue, Roy L., *Soils : An Introduction to Soils and Plant Growth,* Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, U. S. A. 1958

Food : The Yearbook of Agriculture, 1959, United States Department of Agriculture, Washington D.C., 1960

Narayanan, S., *General Science Standard IX,* Orient Longmans, Bombay, 1959

অষ্টম অধ্যায়

জলবায়ু ও মৃত্তিকা (Climate and Soil)

জলবায়ু (**Climate**)

ভারতে ফসলের উৎপাদনকে যে সকল কারণ প্রভাবিত করে তন্মধ্যে আবহাওয়া ও জলবায়ু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন এক সময়ের বায়ুমণ্ডলের অবস্থাকে আবহাওয়া বলে ; আর গড় আবহাওয়াকে জলবায়ু বলে।

কৃষিকার্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। যেমন,

(১) বর্ষা আরম্ভ হইবার পর এবং মাটি আর্দ্র হইলে লাঙ্গল চালানো উচিত। শুষ্ক মাটিতে লাঙ্গল চালাইতে অধিক শক্তির আবশ্যক হয়। শুষ্ক জমিতে লাঙ্গল চালাইলে অসংখ্য ঢেলার সৃষ্টি হয় এবং ঐ জমিকে পুনরায় বীজ বপনের উপযোগী করিতে বেশ কয়েক মাস সময় লাগে।

(২) জমির উপরিতল হইতে ৩ ইঞ্চি বা ততোধিক নিচে পর্যন্ত মাটি আর্দ্র হইলে তবেই বীজ বপন করা উচিত। যে মাটি শীঘ্র শুকাইয়া যায় তাহাতে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াও জলের অভাবে সত্বর মারা যায়।

(৩) এমন সময় ফসলে সার প্রয়োগ করিতে হয় যখন উপরিতলের ক্ষয় (surface erosion) ও গভীর অনুস্রবণে (deep percolation) অপচয়ের সম্ভাবনা কম থাকে। ইহা ছাড়া, মাটির এমন স্তরে সার প্রয়োগ করিতে হইবে যে স্তর সকল সময় আর্দ্র থাকে, নতুবা আবহাওয়া যখন শুষ্ক থাকে উদ্ভিদমূল তখন উহা শোষণ করিতে পারে না।

(৪) বৃষ্টিপাত ও মাটির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শস্য-সূচী এমন ভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে যাহাতে আগাছা দমনের জন্য যথাসময়ে শস্য পরিচর্যায় (inter-cultivation) হাত দেওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়
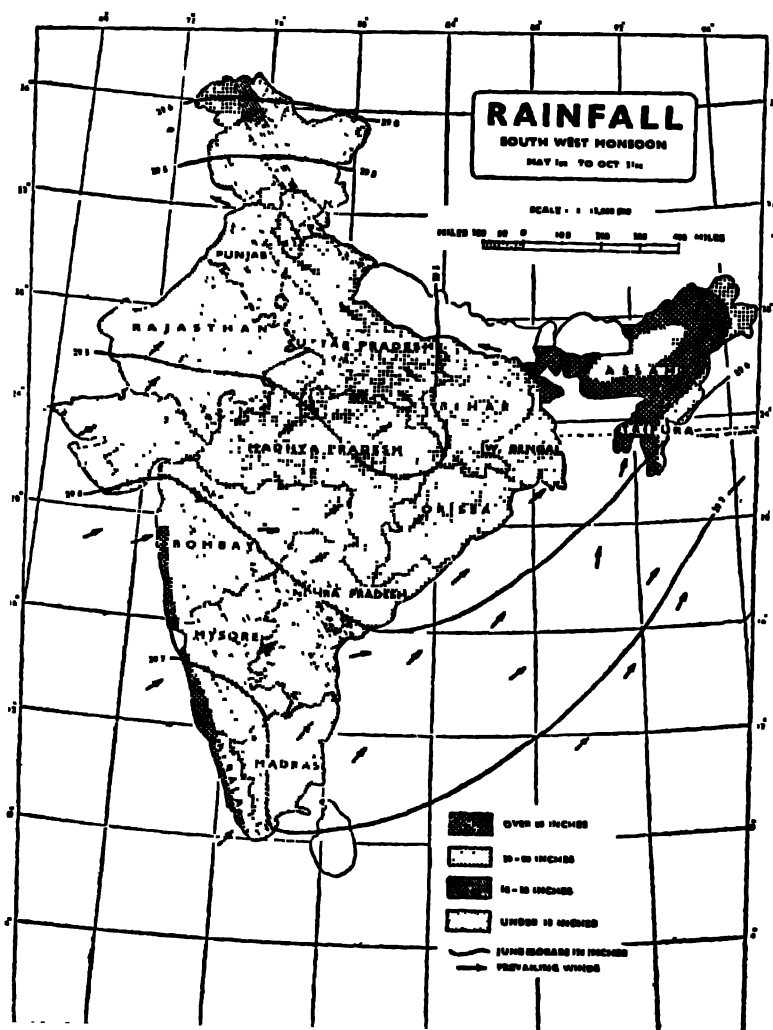
চিত্র নং ৬৮। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহ কালে বৃষ্টিপাত। বায়ুর গতি (তীর চিহ্ন দ্বারা) ও জুন মাসের বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্দেশ করা হইয়াছে। অবিচ্ছিন্ন রেখার প্রতি বিন্দুতে একই বায়ুচাপ এবং তাহা পারদের তুল্য ইঞ্চিতে (equivalent inches of mercury) প্রকাশ করা হইয়াছে। লম্বভাবে অবস্থিত রেখাগুলি দ্রাঘিমাংশ (পূর্ব দিকস্থ ডিগ্রি) ও অনুভূমিক রেখাগুলি অক্ষাংশ (উত্তর দিকস্থ ডিগ্রি) [*The Indian Cotton Atlas*, Second Edition, Indian Central Cotton Committee, Bombay, 1959 হইতে গৃহীত]।

যে কৃষ্ণ মৃত্তিকা (Black clay soils) অঞ্চলে মৌসুমী বৃষ্টিতে শস্য পরিচর্যা সম্ভব হয় না।

(৫) যখন মৃত্তিকা ক্ষয়ের সম্ভাবনা অধিক থাকে, যেমন বর্ষাকালে, তখন এমন ফসল নির্বাচন করিতে হয় যাহা মাটির উপরে আচ্ছাদনের কাজ করে।

(৬) এমন ফসল নির্বাচন করিতে হয় যাহা আবহাওয়া শুষ্ক থাকাকালীন কাটা যায়। বর্ষাকালে যে সকল ফসল পাকে, বৃষ্টিতে প্রায়ই ঐ সকল ফসলের ক্ষতি হয়।

১৯৪৫ সালে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর কৃষির জন্য আবহাওয়া তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থায় প্রতি জেলায় বর্ষার আরম্ভ ও শেষ এবং আবহাওয়ার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ সম্পর্কে কৃষকদের ওয়াকিবহাল রাখা হয়। বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ ও নাগপুরে ইহার আঞ্চলিক পূর্বাভাস কেন্দ্রগুলি (regional forecasting centres) অবস্থিত। এই সকল কেন্দ্র হইতে দৈনিক কৃষকদের জন্য আবহাওয়া ইস্তাহার প্রকাশিত হয় এবং এই সকল তথ্য দৈনিক বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ও আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে আঞ্চলিক ভাষায় প্রচার করা হয়। যাহাতে কৃষি-সূচী আরও সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করা যায়, তজ্জন্য সকল কৃষকেরই উক্ত আবহাওয়া প্রচার ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করা উচিত।

মৌসুমী বৃষ্টি (Monsoon Rains)

আরব সাগর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত আর্দ্র বায়ু হইতেই ভারতের অধিকাংশ বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। যেহেতু যে দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই দিক অনুসারে বায়ুর নাম দেওয়া হয়, সেজন্য এই বায়ু ও বৃষ্টিপাতকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ও বৃষ্টিপাত বলা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বৃষ্টিপাত কেরালায় ১লা জুন আরম্ভ হয় এবং উত্তর দিকে প্রবাহিত হইয়া ১৫ই জুলাই নাগাদ (চিত্র নং ৬৮) পশ্চিম পাঞ্জাবে উপস্থিত হয়। কোন এক অঞ্চলে তিন হইতে চার মাস ধরিয়া দক্ষিণ-মৌসুমী বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ জুন হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু হইতে সংঘটিত হয়।

ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাসে, উত্তর-পূর্ব দিক হইতে ভারতের উপর দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে এবং তাহার ফলে জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তর পাঞ্জাব, আসাম এবং পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজের উপ-কূলবর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। এই ঋতুকে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী ঋতু বলা হয়। ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের মাত্র ২ শতাংশ উত্তর-পূর্ব মৌসুমী ঋতুতে পাওয়া যায়।

ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ১০ শতাংশ মার্চ হইতে মে-এর মধ্যে প্রাক্-মৌসুমী ঋতুতে এবং ১৩ শতাংশ অক্টোবর হইতে নভেম্বরে মৌসুমী পরবর্তী ঋতুতে পাওয়া যায় (চিত্র নং ৬৯ ও ৭০)।

গড় বৃষ্টিপাত (Average Rainfall)

ভারতের রাজস্থানের মরুভূমিতে বার্ষিক গড়ে কিঞ্চিৎ অল্প পাঁচ ইঞ্চি হইতে আসামের খাসিয়া পাহাড় অঞ্চলে ৪২৫ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়।* রাজ্যের রাজধানীগুলির মধ্যে রাজস্থানের জয়পুরে সব চাইতে কম গড় ২৪ ইঞ্চি মাত্র বৃষ্টিপাত হয়; আবার আসামের শিলং-এ বৎসরে চরম গড় ৮৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় (২নং তালিকা)।

ভারতে বৃষ্টিপাত মৌসুমী ভাবাপন্ন এবং অধিকাংশ বৃষ্টিপাত জুন হইতে সেপ্টেম্বর—এই সময়ের মধ্যে পাওয়া যায়। রাজ্যের রাজধানীগুলির মধ্যে রাজস্থানের জয়পুরে বৎসরে গড়ে ৩৬ দিন বৃষ্টিপাত হয়, আবার আসামের শিলং-এ বৎসরে গড়ে ১২২ দিন বৃষ্টিপাত হয়। সাধারণ ভাবে দেখা যায়, বৃষ্টিপাত যেখানে যত কম মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণে বৎসর বৎসর তত বেশী তারতম্য ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রাজস্থানের জয়পুরে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের অবম (minimum) পরিমাণ হইল পাঁচ ইঞ্চি এবং চরম (maximum) পরিমাণ হইল ৫৫ ইঞ্চি; অর্থাৎ অবম বৃষ্টিপাতের ১১ গুণ। অপর দিকে আসামের শিলং-এ বার্ষিক বৃষ্টিপাতের অবম পরিমাণ হইল ৬০ ইঞ্চি এবং চরম পরিমাণ হইল ১২৬; অর্থাৎ অবম বৃষ্টিপাতের কিঞ্চিৎ অধিক দুই গুণ।

* একটি চোঙ্গার মত পাত্র উন্মুক্ত স্থানে রাখিলে যে পরিমাণ বৃষ্টি সংগৃহীত হয় তাহাকে ইঞ্চি বৃষ্টিপাত বলে। খাড়া পার্শ্ববিশিষ্ট একটি টিন ঘরবাড়ী ও বৃক্ষাদি হইতে দূরে স্থাপন করিলে এবং তাহাতে এক ইঞ্চি পুরু জল জমিলে বুঝিতে হইবে যে এক ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়াছে।
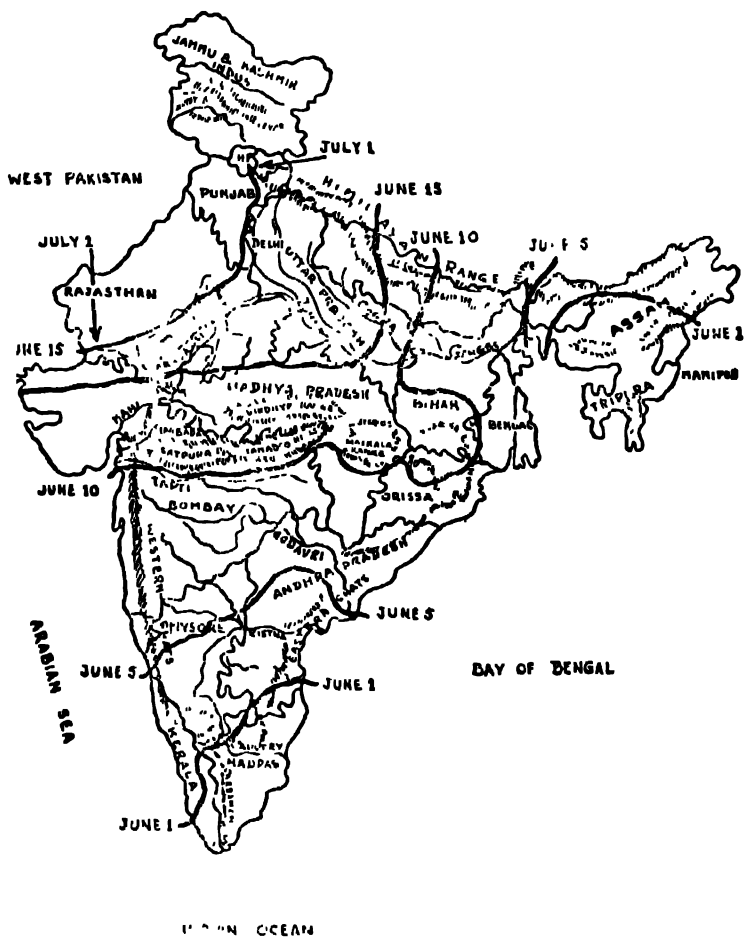
চিত্র নং ৬৯। ভারতে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের প্রারম্ভিক তারিখ।

[RANDHAWA : হইতে পুনরঙ্কিত]

গড় হিসাবে দেখা যায়, ভারতের শতকরা ১১ ভাগ জমিতে বৎসরে ৭৫ ইঞ্চির অধিক, শতকরা ২১ ভাগ জমিতে ৫০ হইতে ৭৫ ইঞ্চি, শতকরা ৩৭ ভাগ জমিতে ৩০ হইতে ৫০ ইঞ্চি, শতকরা ২৪ ভাগ জমিতে ১৫ হইতে ৩০ ইঞ্চি এবং শতকরা ৭ ভাগ জমিতে ১৫ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয় (চিত্র নং ৭১)।
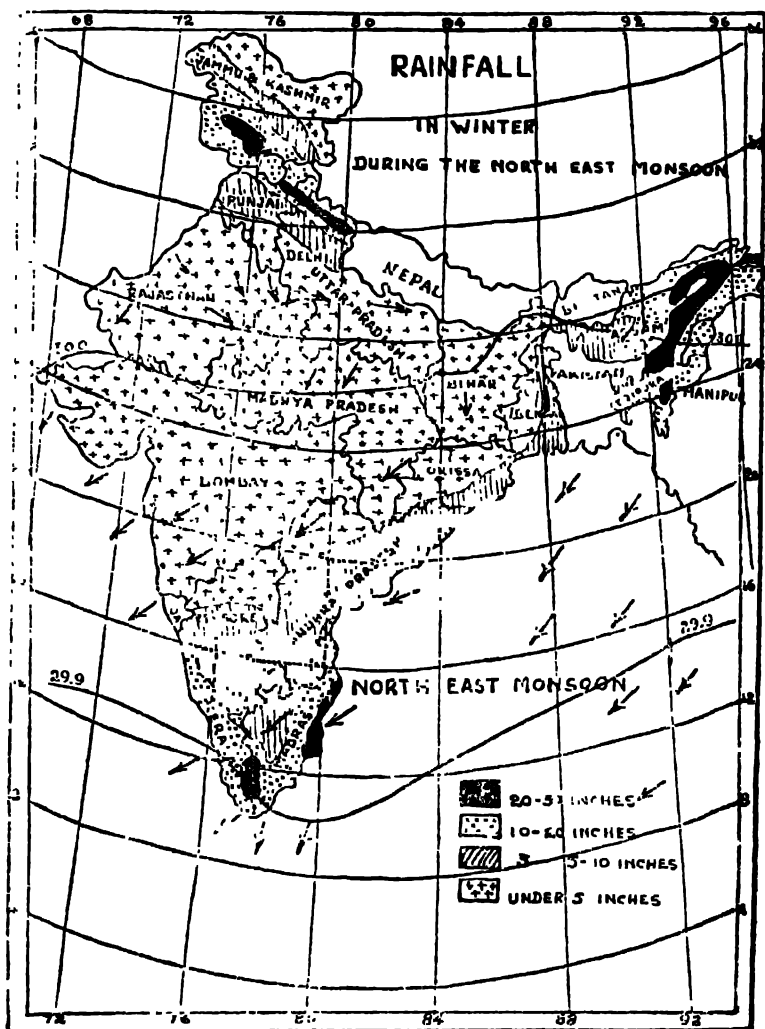
চিত্র নং ১০। উত্তর পূর্ব মৌসুমী ঋতুতে শীতকালীন বৃষ্টিপাত।

[OILSEED ATLAS : হইতে পুনরঙ্কিত]

২নং তালিকা—নূতন দিল্লী ও রাজ্যসমূহের রাজধানীতে বৃষ্টিপাত

রাজ্য	রাজধানী	বৎসরে গড়ে কয়দিন বৃষ্টি হয়	বৃষ্টিপাতের বার্ষিক অবম পরিমাণ (ইঞ্চি)	বৃষ্টিপাতের বার্ষিক চরম পরিমাণ (ইঞ্চি)	বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি) †
অন্ধ্রপ্রদেশ	হায়দরাবাদ	৫০	১৮	৫৬	২৯
আসাম	শিলং	১২২	৬০	১২৬	৮৫
বিহার	পাটনা	৫৬	২৫	৭৭	৪৭
গুজরাট	আহমেদাবাদ	৩৬	৫	৭৯	২৯
কেরালা	ত্রিবান্দ্রাম	৯৭	৪০	১২০	৬৭
মধ্যপ্রদেশ	ভূপাল	৫৯	৩৯	৬০	৫২
মহারাষ্ট্র	বোম্বাই	৭৪	৩৩	১০১	৭১
মাদ্রাজ	মাদ্রাজ	৫৭	২২	৭৯	৫০
মহীশূর	বাঙ্গালোর	৫৭	২১	৫৩	৩৪
উড়িষ্যা	কটক	৭৪	৩৬	৯১	৬০
পাঞ্জাব	চণ্ডীগড় (আম্বালা) ‡	৪২	১৪	৮১	৩৩
রাজস্থান	জয়পুর	৩৬	৫	৫৫	২৪
উত্তরপ্রদেশ	লক্ষ্ণৌ	৬৯	১৭	৭৪	৪০
পশ্চিমবঙ্গ	কলিকাতা	৮৪	৩৬	৯৮	৬৩
কাশ্মীর	শ্রীনগর	৫৭	১৬	৫১	২৬
	নূতন দিল্লী	৩৬	১০	৬০	২৬

* যে সকল দিনে ইঞ্চির এক দশমাংশ বা তদধিক বৃষ্টি হইয়াছে।

† বরফ পাতের জলের অনুপাতসহ বৃষ্টিপাতের হিসাব ধরা হইয়াছে।

‡ পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড় হইলেও এখানে কোন আবহাওয়া কেন্দ্র না থাকার দরুন নিকটবর্তী আবহাওয়া কেন্দ্র আম্বালার আবহাওয়া তথ্য দেওয়া হইয়াছে।

জ্ঞাতব্য: বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিকটবর্তী ইঞ্চিতে দেওয়া হইয়াছে; যেমন ২৯·৪ কে ২৯ বা ৮৫·৬ কে ৮৬ হিসাবে লেখা হইয়াছে।

চিত্র নং ৭১। ভারতে বৃষ্টিপাত (মোট)

[OILSEED ATLAS : হইতে পুনরঙ্কিত]
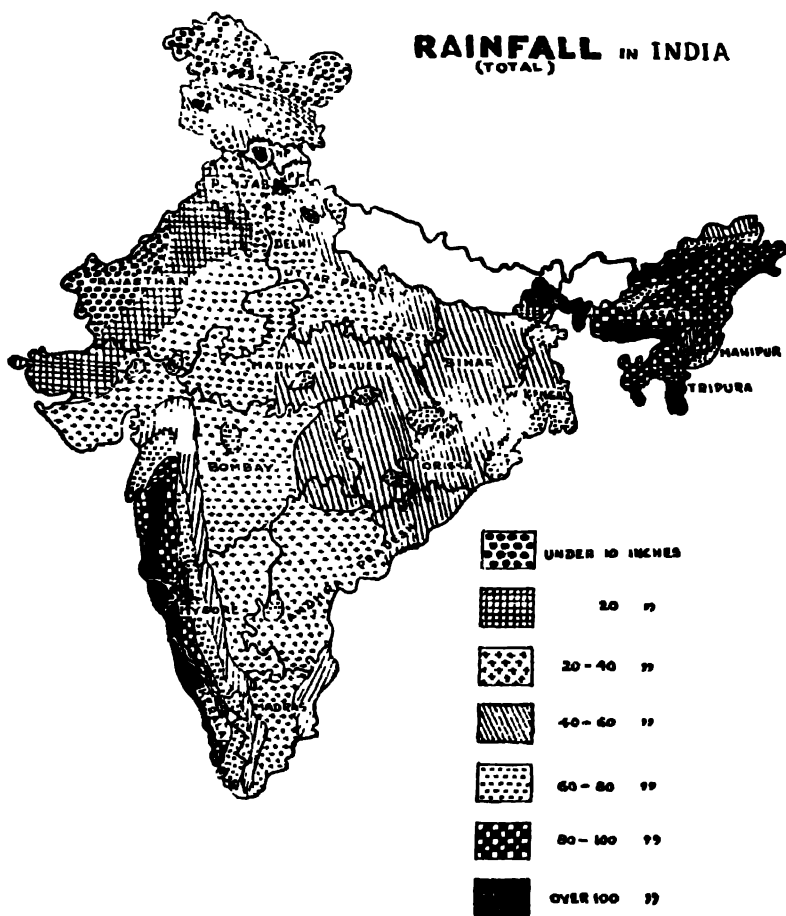
অনাবৃষ্টি ও প্লাবন (Droughts and Floods)

ভারতের কিছু অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা অনাবৃষ্টি ও প্লাবন দুইই বেশি হয়। এই অঞ্চলগুলি হইল পূর্ব ও উত্তর পাঞ্জাব, পূব উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিম রাজস্থান ও মধ্য মহারাষ্ট্র। এ সকল অঞ্চলে প্রতি ছয় বৎসরে একবার বন্যা ও প্রতি সাত বৎসরে একবার অনাবৃষ্টি হইতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, এই অঞ্চলের কৃষকগণ প্রতি তিন বৎসরে একটি বন্যা বা অনাবৃষ্টি আশা করিতে পারে। আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার জন্য এই সকল অঞ্চলে কৃষিকার্যের ফলাফলও খুবই অনিশ্চিত; এজন্য এই সকল অঞ্চলে জল ও ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

অনাবৃষ্টি

গত ৭৫ বৎসরে ভারতের নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে গড়ে প্রতি পনর বৎসরে একবার অনাবৃষ্টি হইয়াছে; আসাম, পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা, দক্ষিণ পাঞ্জাব, মহীশূর, কেরালার মালাবার উপকূল ও মাদ্রাজ রাজ্যের উত্তরাংশ। গড়ে প্রতি আট বৎসরে একবার যে সকল অঞ্চলে অনাবৃষ্টি দেখা দিয়াছে সেগুলি হইল বিহার, উত্তর প্রদেশ, পূব ও উত্তর পাঞ্জাব, কাশ্মীর, পশ্চিম রাজস্থান ও মধ্য মহারাষ্ট্র।

প্লাবন

মাটি যে পরিমাণ জল শোষণ করিতে পারে বা নালা, খাল ও নদীগুলি যে পরিমাণ জল বহন করিতে পারে তাহা অপেক্ষা বৃষ্টিপাত বেশি হইলে বন্যার সৃষ্টি হয়। বন জঙ্গল ধ্বংস, তৃণভূমিতে অপরিমিত গোচারণ এবং ফসলের জমির অপরিমিত কর্ষণ প্রভৃতি কারণে মাটিতে অপেক্ষাকৃত অল্প জল নালা, খাল ও নদীতে প্রবেশ করিয়া বন্যার সৃষ্টি করে।

প্রতি বৎসর ভারতের বহু অঞ্চলে এত দ্রুত বৃষ্টিপাত হয় যে তাহার ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়। আবহাওয়া দপ্তরের নথিতে দেখা যায় যে গত ৭৫ বৎসরে ভারতের প্রত্যেক জেলায় অন্তত একবার ২৪ ঘণ্টায় ন্যূনপক্ষে ৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে। আসামের খাসিয়া পাহাড়ের চেরাপুঞ্জিতে ২৪ ঘণ্টায় ৪০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইল ভারতের চরম দ্রুত বৃষ্টিপাত। এই কেন্দ্রের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত হইল চার শ পঁচিশ ইঞ্চি।

গত ৭৫ বৎসরের মধ্যে পশ্চিম বাংলা, কাশ্মীর ও মহীশূরে প্রতি পনর বৎসরে একবার করিয়া বন্যা সৃষ্ট হইয়াছে। উড়িষ্যা, বিহার, পূর্ব উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, পশ্চিম রাজস্থান, মধ্য মহারাষ্ট্র, দক্ষিণ অন্ধ্র প্রদেশ ও উত্তর মাদ্রাজে প্রতি আট বৎসরে একবার করিয়া প্লাবন দেখা দিয়াছে।

প্রবল বায়ু (High winds)

কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল ও বোম্বাই হইতে করাচী পর্যন্ত আরব সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রায়ই ঝড়ের সৃষ্টি হয়। বিশুষ্ক (arid) অঞ্চলে যেমন রাজস্থানে ঝড়ের ফলে সাময়িক বায়ুতাড়িত ভূমিক্ষয় হয়। ঝড়ের তাণ্ডবে ফসলের নিম্নলিখিত রূপ ক্ষতি হয়:

(১) আখ ও জোয়ার প্রভৃতি ফসলকে উড়াইয়া লইয়া যায়।

(২) মাটি হইতে জলের অপচয় বৃদ্ধি পায়।

(৩) বায়ু তাড়িত ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি সাময়িক হইতে পারে।

(৪) ফসলের ফলন ও উৎকর্ষ হ্রাস পাইতে পারে।

ঝড়ে যাহাতে আখ উড়াইয়া লইয়া যাইতে না পারে, সেজন্য খেতে চার বা পাঁচটি আখকে একটি আঁটি করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। ঝড়জনিত ক্ষতির অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সমাধান হইল জমির যে দিক হইতে ঝড় প্রবাহিত হয় সে দিকে বড় বড় গাছ লাগানো যাহাতে ফসলে প্রবল বায়ু পৌঁছিতে না পারে। প্রবল বায়ু প্রবাহকে বাধা দেওয়ার জন্য লম্বা গাছের একটি সারির উভয় পার্শ্বে এক বা একাধিক সারি ছোট ছোট গাছ লাগানো উচিত। সম্ভব হইলে গাছগুলি চিরসবুজ হওয়া বাঞ্ছনীয়; তাহা হইলে সকল ঋতুতেই ঐ সকল গাছ প্রবল বায়ুকে বাধা দান করিতে পারিবে (চিত্র নং ১২ ও ১৩)।

তুষারপাত (Frosts)

৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইটের (৩২ ফা.) নিম্ন তাপমাত্রায় অধিকাংশ ফসল অতি সহজেই মারা যায়। এই তাপমাত্রাকে শূন্য ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড (০° সে.) হিসাবেও লেখা হয় এবং এই তাপমাত্রায় জল জমিয়া বরফ হয়। এইজন্য ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে বায়ুর তাপমাত্রা ৩২° ফা. বা ততোধিক নিম্নে নামিয়া যায় তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক।
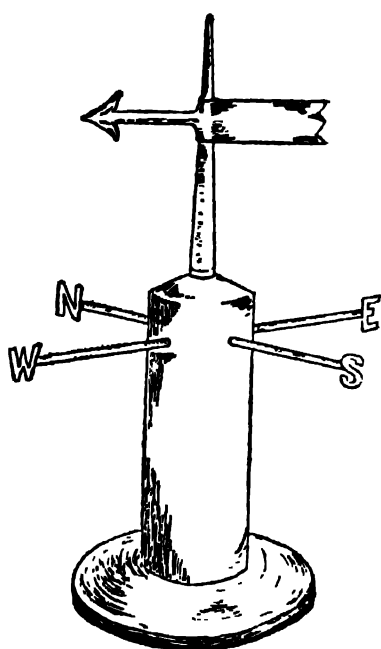
। চিত্র নং ৭২ । বায়ুর দিক নির্ণয়ের জন্য বায়ুমান যন্ত্র । যে কোন কারখানায় ইহা তৈয়ারি করা যায় । [MUDALIAR : হইতে পুনরঙ্কিত]

গত ৭৫ বৎসরের আবহাওয়া তথ্যে দেখা যায়, নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলিতে এক বা একাধিক দিন তাপমাত্রা ৩২°ফা. বা ততোধিক নিচে নামিয়া গিয়াছিল : জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর রাজস্থান ও দিল্লী। সাধারণত ডিসেম্বর, জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসেই ঐ সকল অঞ্চলে তুষারপাত হইয়াছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কখনও তুষারপাত হয় নাই।

যে সকল অঞ্চলে তুষারপাত হয়, সেখানে বিভিন্ন উপায়ে তুষারপাত জনিত ক্ষতি কৃষক এড়াইতে পারেন। যথা,—

১) তুষার-সহিষ্ণু ফসলের চাষ করিতে হইবে, যেমন ফুলকপি ও বাঁধাকপি ;

২) তুষার-অসহিষ্ণু ফসলের চাষ এমন সময়ে করিতে হইবে যাহাতে সচরাচর যখন তুষারপাত হয়, তাহার পূর্বেই ফসল পাকিয়া যায় ;

৩) তুষার-অসহিষ্ণু ফসল, যেমন টোম্যাটো ও লতা ফসল ঢালু জমিতে
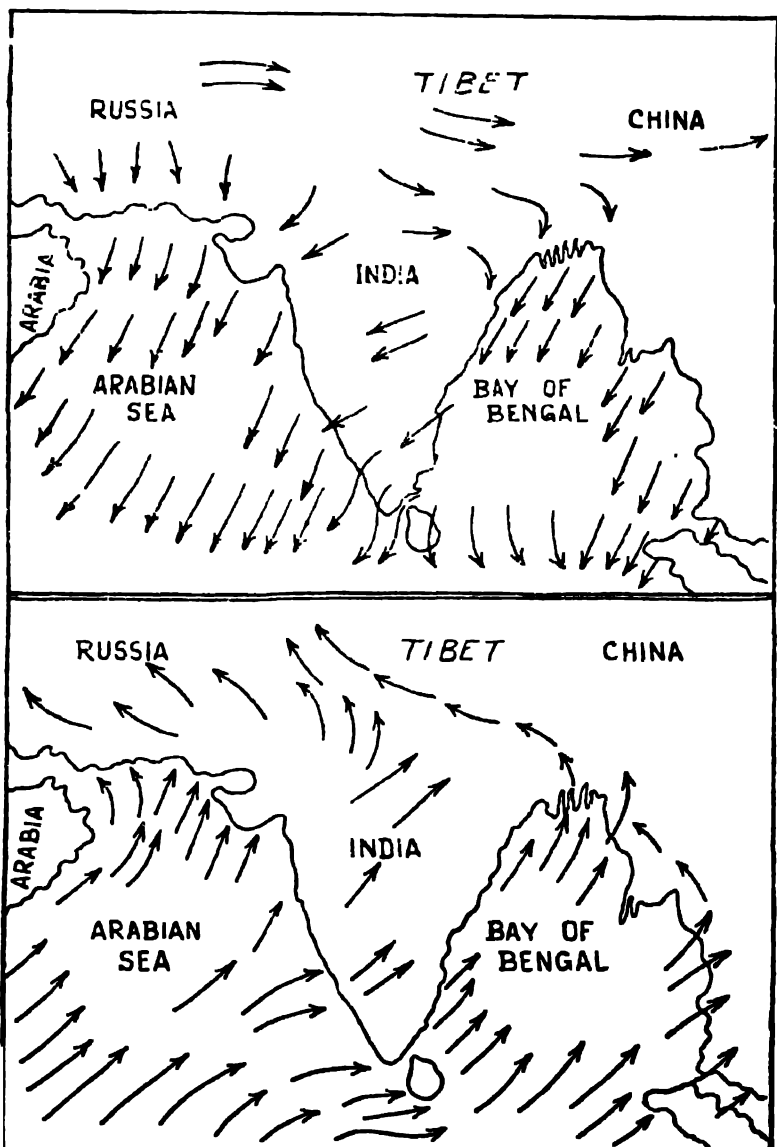
চিত্র নং ৭৩। ভারতে বায়ু প্রবাহ। (উপরে): উত্তর পূর্ব মৌসুমী ঋতুতে জানুয়ারী মাসে ভারতের উপর গড় বায়ু স্রোত। (নিম্নে): দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী ঋতুতে জুলাই মাসে ভারতের উপর গড় বায়ু স্রোত।

[NORMAND: হইতে পুনরঙ্কিত]

চাষ করিতে হইবে। ঢালু জমিতে ঠাণ্ডা বাতাস নীচের দিকে নামিয়া যায় ; এজন্য ঢালু জমিতে তুসার জনিত ক্ষতির সম্ভাবনা কম ;

৪) শীততম রাত্রিগুলিতে বাতাসকে উত্তপ্ত করিবার জন্য জমির চারিদিকে অস্থায়ী বায়ু প্রতিবন্ধক (windbreak) তৈয়ারি করা যায়। মহারাষ্ট্রের নাসিকে এক পরীক্ষায় জানা যায়, জমির চারিদিকে একর প্রতি ৪০০ জোয়ারের ডাঁটা জ্বালাইয়া ফসলের নিকটবর্তী বায়ুর তাপমাত্রা ১০ ফা. পর্যন্ত তোলা সম্ভব হইয়াছে ;

৫) ফসলে তুসারজনিত ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিলে, তৎক্ষণাৎ সেচ জল প্রয়োগে ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা যায়।

মাটি (Soil)

কৃষি বিজ্ঞানে যিনি শিক্ষণপ্রাপ্ত নন, তাঁহার নিকট মাটি ধরিত্রীর বুকে ধূলা বিশেষ। কিন্তু একজন বিজ্ঞানীর নিকট ধরিত্রী আবৃতকারী মাটি একটি 'সজীব' পদার্থ বিশেষ এবং ইহা আবহিক বিকৃত (weathered) শিলাখণ্ড, জৈব পদার্থ, জল, বায়ু ও সজীব জীবাণু দ্বারা গঠিত।

মাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ, কারণ সকল মনুষ্য খাদ্য ও পশু খাদ্য উৎপাদনের ইহাই হইল মাধ্যম। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক ধারণ (mechanical support), জল ও উদ্ভিদ খাদ্য মৌল মাটি হইতে পাওয়া যায়। মাটি হইতে সুপ্রচুর ফসল উৎপাদন করিতে হইলে মাটি ও তাহার ব্যবহার সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

মৃত্তিকা গঠন (Soil Formation)

সকল প্রকার মাটিই শিলা হইতে গঠিত হয় (চিত্র নং ৭৪)। তাপমাত্রার তারতম্যে শিলা চূর্ণবিচূর্ণ হয় এবং বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইয়া উদ্ভিদ ও প্রাণী ধারণের উপযোগী হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণী জলবায়ুর সহিত একযোগে কার্য করিয়া মৃত্তিকা গঠনকে ত্বরান্বিত করে। উৎসশিলা, ভূসংস্থান এবং ধীর দ্রবণীয় শিলা হইতে যৌগিক পদার্থ সমূহ বহনকারী জলের গতির উপর মাটির প্রকৃতি নির্ভর করে।

শিলা
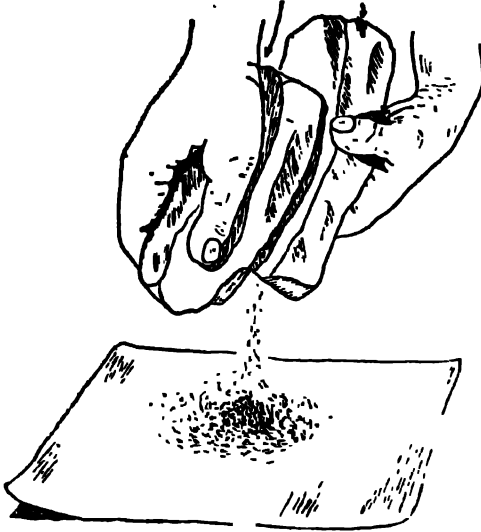
চিত্র নং ৭৪। দুইটি শিলাখণ্ডকে ঘষিলে সূক্ষ্ম ধূলার সৃষ্টি হয়। ইহাই সেই মণিক (mineral) পদার্থ যাহা হইতে প্রকৃতিতে মৃত্তিকা গঠিত হয়। [EVANS : হইতে পুনরঙ্কিত]

অন্য ভাবে বলা যায় ধরিত্রীর পর্বত ও উপত্যকাগুলি কালের প্রবাহে রৌদ্র, বৃষ্টি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রভাবে মৃত্তিকা গঠন করে।

শিলাসমূহ আবহিক বিকারে উদ্ভিদ ধারণের উপযোগী হইলেই মৃত্তিকা গঠিত হইয়াছে বলা যায়। কিন্তু বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সকল মাটি একপ্রকার নয়। মৃত্তিকার এই তারতম্য এক বিস্ময়ের বস্তু। মৃত্তিকা গঠনের জন্য নিম্নলিখিত পাঁচটি কারণ দায়ী :

১। মূল পদার্থ (parent material), ২। জলবায়ু (climate), ৩। সজীব জীব (living organism), ৪। ভূসংস্থান (topography), ৫। কাল বা সময় (time)।

মূল পদার্থ

প্রকৃতি কোন স্থানে বালুশিলা (sandstone) জমা করিয়াছে ; কোন স্থানে জমা করিয়াছে শেল (shale) বা চুণাপাথর। আবার অন্যস্থানে হয়ত

ধরিত্রীর ভিতর হইতে লাভা (lava) ধীরে ধীরে উপর দিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়া গ্র্যানিট্ (granite) বা ব্যাসল্টকে (basalt) অনাবৃত করিয়াছে। কিন্তু মূল শিলা যাহাই হউক না কেন, শতাব্দীর পরা শতাব্দী ধরিয়া বৃষ্টির জলের আবহিক বিকারে উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রভাবে শিলা ক্ষয়ীভূত হয়। এইজন্যই দেখা যায়, বালুশিলা হইতে গঠিত মাটির গ্রথন (texture) স্থূল ও মাটিতে বালির ভাগ বেশি। শেল হইতে গঠিত মাটির গ্রথন সূক্ষ্ম ও মাটিতে কর্দমের ভাগ বেশি এবং মাটি খুব উর্বর নয়। আবার চুনাপাথর বা ব্যাসল্ট হইতে গঠিত মাটির রং সাধারণত কালো, গ্রথন সূক্ষ্ম এবং মাটি অতি উর্বর। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা চুনাপাথর বা ব্যাসল্ট হইতে গঠিত মাটির উদাহরণ।

জলবায়ু

মনে করা যাক্, কলিকাতা বা মাদ্রাজের নিকটে বঙ্গোপসাগরে বা বোম্বাই-এর নিকটে আরব সাগরে প্রাসাদের মত বড় একটি ব্যাসল্ট শিলা হঠাৎ দেখা গেল। আবহাওয়ার নিকট অনাবৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিলার উপরিতল ক্ষয় পাইতে থাকিবে। দিবা-রাত্রে ও বিভিন্ন ঋতুতে তাপমাত্রার তারতম্যে শিলা টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। টুকরা কিছু শিলাখণ্ড বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইবে। অতি অল্প কালের মধ্যেই ছোট ছোট ফাটল ও গর্তে বৃক্ষধারণ উপযোগী যথেষ্ট জল ও খাদ্যের অভাব ঘটিবে না।

সজীব জীব

জল ও বৃক্ষখাদ্যের ব্যবস্থা হইলে প্রথমে নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ, যেমন লাইকেন (lichen) জন্মায়। বহু বৎসর ধরিয়া এই সকল নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও মৃত্যুর পর পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ, যেমন মস্ (moss) জন্মায়, বৃদ্ধি পায় এবং মারা যায় যতদিন পর্যন্ত না তাহাদের পচনশীল কলা হইতে গঠিত জৈব পদার্থের দরুন অবস্থার আরও উন্নতি হইতেছে এবং বীজ ধারণশীল উদ্ভিদ জন্মাইতেছে। প্রথমে বহু বর্ষজীবী আগাছা জন্মায়, তারপর কয়েক বৎসর তৃণ ও গুল্ম জন্মায় এবং যেখানে একদা কেবল উদ্ভিদ-শূন্য ব্যাসল্ট শিলা ছিল সেস্থান অবশেষে ধীরে ধীরে জঙ্গলে

।

ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক এবং বহু পাখি ও অন্যান্য প্রাণী মৃত্তিকা গঠনে অবিরত অংশ গ্রহণ করে। শিলার উপরে যে উদ্ভিদ জন্মায় তাহার বীজ পাখি ও প্রাণী বহন করিয়া লইয়া যায়। শিলাকে সূক্ষ্ম মৃত্তিকা কণিকায় চূর্ণ করিতে উদ্ভিদ ও প্রাণী সাহায্য করে। শিলা হইতে মৃত্তিকা গঠনের অবিরাম কাজে পিঁপড়ে ও উই সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। শিলা যত পরিমাণ জল ধরিয়া রাখিতে পারে তাহার উপরে মৃত্তিকা গঠনের গতি নির্ভর করে। আবার শিলা কি পরিমাণ জল ধরিয়া রাখিতে পারে তাহা বৃষ্টি ও শিলাস্থ গর্তের আয়তনের উপর নির্ভর করে।

মূল পদার্থের মণিক সংযুতি (mineral compcsition) এবং যে আবহিক বিকার ঘটিয়াছে তাহার উপর মাটির রাসায়নিক সংযুতি নির্ভর করে। যেমন, যে মাটি উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে লৌহ ও অ্যালুমিনিয়ম থাকে ; কিন্তু ক্যালসিয়ম খুবই কম থাকে।

মাটিতে ক্যালসিয়মের পরিমাণ ও বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক সম্বন্ধে পাঞ্জাবের এক উদাহরণ দেওয়া যায়। হিসারের সমতলভূমিতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১১ ইঞ্চি। অপর দিকে কাঙ্গরা পর্বতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২৬ ইঞ্চি। হিসারের সমতলভূমির মাটিতে ক্যালসিয়মের পরিমাণ কাঙ্গরা পর্বতের মাটি অপেক্ষা দ্বিগুণ। হিসারের সমতলভূমির ঘাসে কাঙ্গরা পর্বতের ঘাস অপেক্ষা শতকরা ১৭ ভাগ ক্যালসিয়ম বেশি থাকে। কাঙ্গরা পর্বতে বৃষ্টিপাত আধিক্য হেতু মাটি হইতে প্রচুর ক্যালসিয়ম ধুইয়া যায়, ফলে ঐ অঞ্চলের ঘাস ও অন্যান্য উদ্ভিদে ক্যালসিয়মের পরিমাণ কম।

ভূসংস্থান

আরব সাগর বা বঙ্গোপসাগরের সেই ব্যাসল্ট শিলা যদি কিঞ্চিৎ হেলিয়া পড়ে যাহাতে বৃষ্টির জল অপেক্ষাকৃত দ্রুত নিষ্কাশিত হয়, তবে ঐ স্থানে জঙ্গলের সৃষ্টি হইতে সময় অনেক বেশি লাগিবে। প্রত্যেকবার বৃষ্টির পর শিলার উপর যেহেতু জল কম থাকে সেইহেতু উদ্ভিদ জীবন অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে উদ্ভিদের পরবর্তী বংশ বৃদ্ধির জন্য স্বল্পতর জৈব পদার্থ জমা হয়। অপর পক্ষে, সেই একই শিলার উপরে যদি সামান্য

গর্ত থাকিত যাহার ফলে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিতে পারিত তবে উদ্ভিদ-জীবন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইত। এইভাবে মোটামুটি সমতল অঞ্চলে মাটি অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে গঠিত হয় এবং পার্বত্য অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে গঠিত হয়।

সময়

শিলা হইতে লাইকেন ও মস্ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ বৃদ্ধির উপযোগী মাটি সৃষ্টি হইতে মাত্র পাঁচ হইতে দশ বৎসর সময় লাগে। কিন্তু খাদ্য ফসল জন্মানোর উপযোগী ৩ ফুট গভীর মাটি ব্যাসল্ট শিলা হইতে গঠিত হইতে কয়েক সহস্র বৎসর লাগিয়া যায়। শিলা হইতে মাটি গঠন করিতে প্রকৃতির যখন এত দীর্ঘ সময় লাগে, তখন মাটির যথেষ্ট যত্ন করা উচিত; নতুবা শীঘ্রই মনুষ্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদনের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ মাটির অভাব ঘটিবে। ফলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ও পশু অনাহারে মারা যাইবে।

মৃত্তিকার সংযুতি (Soil Composition)

মণিক পদার্থ, বায়ু, জল ও জৈব পদার্থ লইয়া মৃত্তিকা গঠিত। মণিক পদার্থসমূহের আকার বড় বড় শিলাখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া বালির দানা বা ততোধিক সূক্ষ্ম কর্দম কণিকা পর্যন্ত হইতে পারে। যে সকল ছোট গর্ত বা সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে সেগুলি জল ও বায়ু অধিকার করে। প্রাণী, যেমন কেঁচো মাটিতে ছোট ছোট গর্ত করে, বা বৃক্ষমূল প্রবেশ হেতু ছোট গর্তের সৃষ্টি হয়; আবার মৃত্তিকা কণিকাগুলির মধ্যে কিছু ফাঁকা বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। পর্যায়ক্রমে আর্দ্র ও শুষ্ক হওয়ার ফলেও মাটিতে অসংখ্য ফাটলের সৃষ্টি হয়। মাটি যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী ধারণ করে, জৈব পদার্থ তাহাদের খাদ্য সরবরাহ করে। মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর অবশিষ্টাংশেও সজীব ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক থাকে। বৃক্ষ মূল, কীটপতঙ্গ, যেমন পিঁপড়ে, উই প্রভৃতি মৃত্তিকার সজীব জৈব পদার্থের অংশ-বিশেষ।

মণিক পদার্থ (Mineral matter)

মাটি প্রধানত শিলার মণিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। কাজেই মূল শিলার

রাসায়নিক সংযুতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শিলা হইতে গঠিত মাটির মণিক পদার্থের মধ্যেও পার্থক্য থাকে। মৃত্তিকা কণিকাগুলি বিঘটনের (disintegration) বিভিন্ন স্তবে বা অবস্থায় থাকে ; ফলে ইহাদের আকারও বিভিন্ন হয়। মৃত্তিকা কণিকাগুলির আপেক্ষিক আকারকে বলা হয় মাটির গ্রথন (texture)। মাটির মোটা বা স্থূল পদার্থগুলি বাছিয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট যে অংশ থাকে তাহাকে আকার অনুসারে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : যথা, বালি (sand), পলি (silt) ও কর্দম (clay)।

স্ফটিক (quartz) ও অন্যান্য মণিক যেগুলি ধীরে ধীরে ভাঙ্গে, সেগুলি হইতে বালি কণিকা উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য আবশ্যকীয় বৃক্ষ খাদ্য বালি কণিকার মধ্যে খুবই কম থাকে। বালি থাকার জন্য মৃত্তিকা কণার মধ্যে ফাঁক বেশি হয় ; ফলে মাটির ভিতরে অপেক্ষাকৃত সহজে জল ও বায়ু চলাচল করিতে পারে।

পলি প্রধানত স্ফটিক ও ফেল্ডস্পার (feldspar) মণিক হইতে উৎপন্ন হয়। পলিতে হাত দিলে ময়দার মত মোলায়েম অনুভব হয়। পলি যেহেতু বালি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর এবং আবহিক বিকারের অপেক্ষাকৃত পরিণত অবস্থায় থাকে, সেইহেতু ইহাতে বৃক্ষখাদ্যের পরিমাণ বেশি থাকে।

কর্দম কণিকা অতিশয় সূক্ষ্ম এবং প্রধানত ফেল্ডস্পার মণিক হইতে উৎপন্ন হয়। মৃত্তিকার ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মগুলিকে ইহা বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ক্যালসিয়ম, ম্যাগনেশিয়ম, পটাশিয়ম প্রভৃতি বৃক্ষখাদ্য মৌল সমূহের প্রধান উৎস হইল এই সকল কর্দম কণিকা।

মৃত্তিকার জল ও মৃত্তিকার বায়ু
(Soil Water and Soil Air)

খুবই নিবিড় বা এঁটেল মাটিতেও মৃত্তিকা দানাগুলির (granules) চতুর্দিকে ও প্রত্যেকটি দানার মধ্যে কিছু ফাঁক থাকে। এই ফাঁককেই বলা হয় রন্ধ্র পরিসর (pore space)। বিভিন্ন অনুপাতে জল ও বায়ু এই রন্ধ্র পরিসর অধিকার করিয়া থাকে। বৃষ্টির পরে প্রায় সকল রন্ধ্র পরিসরই জল দ্বারা পূর্ণ থাকে। কয়েকদিনের মধ্যে জলের কিছু অংশ অনুস্রবণে (percolation), কিছু অংশ বাষ্পীভবনে নষ্ট হয় এবং কিছু অংশ উদ্ভিদ কর্তৃক শোষণ ও বাষ্প

মোচনে ব্যয় হয়। জলের পরিমাণ যখন কমিতে থাকে তখন বায়ু জলের স্থান অধিকার করিতে থাকে। আবার বৃষ্টি হইলে এই প্রক্রিয়া পুনরায় সংঘটিত হয়। উদ্ভিদ বৃদ্ধির উপযোগী উত্তম অবস্থায় মাটির রন্ধ্রপরিসরের অর্ধেক জল দ্বারা ও অবশিষ্ট অর্ধেক বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে।

স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতই হইল মৃত্তিকার জলের উৎস। বৃষ্টির কিছু অংশ মাটিতে প্রবেশ করে এবং অবশিষ্ট অংশ জমির উপর দিয়া গড়াইয়া নদী-নালায় গিয়া পড়ে। যে অংশ মাটিতে প্রবেশ করে তাহাকেই মৃত্তিকার জল বলা হয়। মৃত্তিকার জল উদ্ভিদের মূলতন্ত্রকে প্রভাবিত করে (চিত্র নং ৭৫)।

বায়ুমণ্ডলের বায়ু যে সকল গ্যাস দ্বারা গঠিত, মৃত্তিকার বায়ুও সেই সকল গ্যাস দ্বারা গঠিত; কিন্তু মৃত্তিকার বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে এবং অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। অবশ্য মৃত্তিকাস্থ বায়ুর সংযুতি সর্বদাই পরিবর্তিত হইতেছে। উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকার বায়ু ও মৃত্তিকার জল স্বাভাবিক অনুপাতে থাকা একান্ত আবশ্যক। জল ও বায়ু কর্তৃক অধিকৃত রন্ধ্রপরিসরের অনুপাত সেচ, জল নিষ্কাশন, কর্ষণ ও বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে।

জৈব পদার্থ

জৈব পদার্থ কোন মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে, আবার কোন মাটিতে স্বল্প পরিমাণে থাকে। যখন প্রথম উদ্ভিদ জন্মায়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তারপর মারা যায় ও পচে তখন হইতে মাটিতে জৈব পদার্থ জমা হইতে আরম্ভ করে। মাটিতে জৈব পদার্থের প্রধান উৎস উদ্ভিদ-অবশেষ (residue)। তবে প্রাণী অবশেষ হইতেও কিছু জৈব পদার্থ মাটিতে জমা হয়।

মাটির জৈব, ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মসমূহকে জৈব পদার্থ প্রভাবিত করে। জৈব পদার্থ ব্যতীত মাটি জড় পদার্থের জঞ্জালবিশেষ, কারণ ইহাতে জীবাণুর কোন তৎপরতা থাকিতে পারে না। জৈব পদার্থ মৃত্তিকাস্থ সকল জীবাণুর খাদ্য সরবরাহ করে এবং সেজন্যই জৈব পদার্থকে মৃত্তিকার প্রাণ বলিয়া অভিহিত করা হয়। জৈব পদার্থ মাটির গঠন উন্নত করে, বেলে মাটির জল-ধারণ ক্ষমতা বাড়ায় ও এঁটেল মাটির রন্ধ্রপরিসর বৃদ্ধি করে। জৈব পদার্থ থাকিলে মাটির রং অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয়।
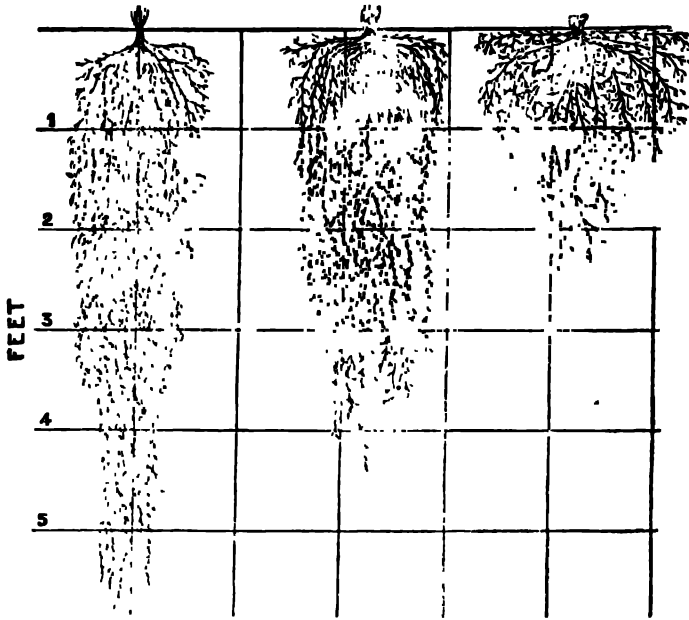
চিত্র নং ৭৫। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত অনুসারে গমের মূলের বৃদ্ধি। (বামে): ৩০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলের গমের মূল। (মাঝে): ২৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলের গমের মূল। (ডাইনে): ২০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলের গমের মূল।
[WEAVER : হইতে পুনরঙ্কিত]।

জৈবপদার্থ হইল নাইট্রোজেনের প্রধান ভাণ্ডার। বিযোজনের (decomposition) সময় জৈব পদার্থ হইতে অন্যান্য সকল বৃক্ষ-খাদ্যই কিছু কিছু নির্গত হয়।

যে জমিতে চাষ হয় তাহা অপেক্ষা যে জমিতে কখনও চাস হয় নাই তাহাতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে। চাষের ফলে জৈব পদার্থ দ্রুত বিযোজিত হয় এবং সেজন্য ইহা কর্ষিত জমিতে কম থাকে। জঙ্গলে আবৃত অকর্ষিত মাটি অপেক্ষা তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত অকর্ষিত (virgin) মাটিতে হিউমাস (humus) ঘটিত জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে। আবার ইহাও সত্য যে শীতপ্রধান অঞ্চলের অকর্ষিত মাটি অপেক্ষা উষ্ণ অঞ্চলের অকর্ষিত মাটিতে জৈব পদার্থ অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

তৃণাচ্ছাদিত বা জঙ্গলাকীর্ণ অকর্ষিত জমিতে কর্ষণ আরম্ভ করিলেই জৈব পদার্থের বিযোজন ত্বরান্বিত হয়। জমিতে যত ফসলের চাষ করা হয় ততই ইহার জৈব পদার্থের পরিমাণ কমিতে থাকে। ভারতে কর্ষিত মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ খুবই কম এবং মন্দোষ্ণ (subtropical) অবস্থা ও জমির অতিরিক্ত কর্ষণ হেতু ইহার পরিমাণ বাড়ানো খুবই কঠিন। কিন্তু মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি কঠিন হইলেও, সবুজ সার, কম্পোস্ট, গোবর সার প্রভৃতি যথাসাধ্য জমিতে প্রয়োগ করা আবশ্যক, কারণ তাহা হইলে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পাইবে।

মৃত্তিকাস্থ জীবাণু (Soil Organism)

কোন কোন মাটি সজীব জীবে খুবই সমৃদ্ধ। ইহাদের মধ্যে ইঁদুর, কীট-পতঙ্গ, কেঁচো প্রভৃতি প্রাণী ও শেওলা (algae), ছত্রাক, ব্যাক্টিরিয়া প্রভৃতি নিম্ন-শ্রেণীর উদ্ভিদ থাকে। ইহাদের কিছু উদ্ভিদ জীবনের পক্ষে উপকারী ও কিছু ক্ষতিকারী। ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ ও জীবাণু সজীব উদ্ভিদকে আক্রমণ করে এবং উহা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। উপকারী জীবাণুরা উদ্ভিদ-অবশেষকে আক্রমণ করে এবং ফসলের ব্যবহারের জন্য বৃক্ষখাদ্য সমূহকে অপেক্ষাকৃত সরল অবস্থায় মুক্ত করে। উদাহরণ স্বরূপ, জীবাণু কর্তৃক জৈব পদার্থের বিযোজনের ফলে জৈব পদার্থ হইতে নাইট্রেট্, সালফেট্, ফসফেট্ প্রভৃতি মুক্ত হয় এবং উদ্ভিদ তাহার বৃদ্ধির জন্য এই সকল খাদ্য ব্যবহার করিতে পারে।

নাইট্রোজেন-বন্ধন (nitrogen-fixation) কারী জীবাণু হইল অপর উপকারী জীবাণু। কিছু ব্যাক্টিরিয়া তাহাদের দেহস্থ প্রোটিন গঠনের জন্য বায়ুমণ্ডলস্থ নাইট্রোজেন ব্যবহার করিতে পারে। ঐ সকল ব্যাক্টিরিয়া মারা গেলে, ঐ নাইট্রোজেন মাটিতে প্রযুক্ত হয় এবং উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করিতে পারে। এই শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়ার কিছু অংশ স্বাধীন ভাবে নাইট্রোজেন বন্ধন করে, কিছু অংশ আবার উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের সহিত যুক্ত থাকিয়া কাজ করে। ইহাদিগকে যথাক্রমে **অমিথোজীবী (non-symbiotic)** ও **মিথোজীবী (symbiotic)** ব্যাক্টিরিয়া বলা হয়। অমিথোজীবী ব্যাক্টিরিয়া ফসলের উপর নির্ভর করে না এবং মৃত্তিকার আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকিলে এবং মাটিতে খাদ্যের অভাব না ঘটিলে ইহারা স্বাধীনভাবে

কাজ করে। মিথোজীবী ব্যাক্টিরিয়া লুসার্ন, ছোলা প্রভৃতি শিম্বি গোত্রীয় উদ্ভিদের মূলস্থ অঙ্কুরের (nodule) মধ্যে বাস করে এবং বায়ুমণ্ডলস্থ নাইট্রোজেন বন্ধন করে। এই নাইট্রোজেন তাহার নিজের প্রয়োজনে লাগে, আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের প্রয়োজনে লাগে এবং ঐ মাটিতে যে পরবর্তী ফসলের চাষ করা হইবে, তাহার প্রয়োজনে লাগে (চিত্র নং ৭৬)।

ভারতের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ (Soil Groups in India)

ভারতের মৃত্তিকার সাধারণভাবে স্বীকৃত শ্রেণীগুলির নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

লাল মাটি (Red Soils)
লাটেরাইট মাটি (Laterite Soils)
কৃষ্ণবর্ণ মাটি (Black Soils)
পলিজ মাটি (Alluvial Soils)
অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের মাটি (Forest and Hill Soils)
মরু অঞ্চলের মাটি (Desert Soils)
লাবণিক ও ক্ষারীয় মাটি (Saline and Alkaline Soils)
পিট ও জলাভূমির মাটি (Peaty and Marshy Soils)

লাল মাটি

প্রায় সমগ্র মাদ্রাজ ও মহীশূর রাজ্য, দক্ষিণ-পূর্ব মহারাষ্ট্র, মধ্য অন্ধ্রপ্রদেশ, দক্ষিণ মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিম উড়িষ্যা লাল মাটি দ্বারা গঠিত। অধিকাংশ লাল মাটির গ্রথন বেলে-দোআঁশ বা এঁটেল-বেলে। এই মাটিতে চুণের ভাগ কম থাকে এবং ইহার উপরি-ভাগের রং লাল। এ মাটিতে সাধারণত নাইট্রোজেন, ফসফোরস, চুণ ও জৈব পদার্থের অভাব থাকে ; কিন্তু সেচ, সবুজ সার, গোবর সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগে এ মাটিতে উত্তম ফলন পাওয়া যায়।

লাটেরাইট মাটি

পশ্চিম অন্ধ্রপ্রদেশ, মহীশূর, কেরালা, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও আসামের পার্বত্য ভূমির উঁচু অংশে দেখা যায়। এই মাটি সছিদ্র ; কিন্তু
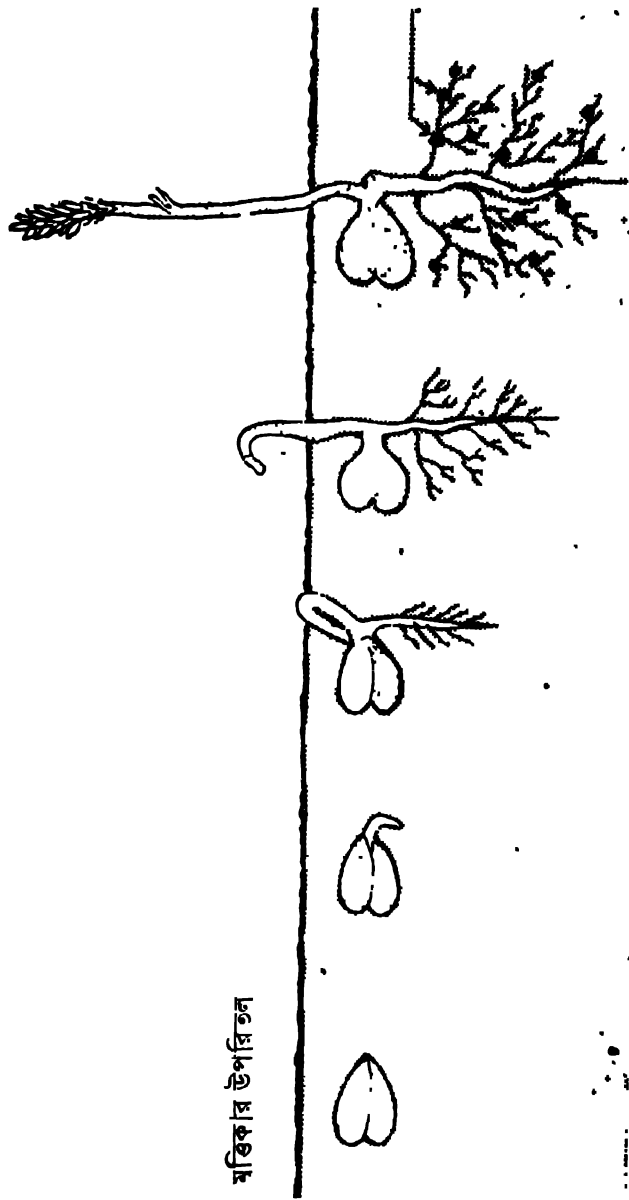
চিত্র অঙ্কুরে দ্গমের পর শিম্বিগোত্রীয় (ডাল শস্য) উদ্ভিদের মূলে অর্বুদের সৃষ্টি হয়। ইহার অভ্যন্তরস্থ মিথোজীবী ব্যাক্টিরিয়া বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ব্যবহার করিয়া ও জমা করিয়া মাটিকে সমৃদ্ধ করে। চিত্রে প্রদর্শিত উদ্ভিদটি হইল ছোলা (gram) গাছ।
[NARAYANAN হইতে পুনরঙ্কিত]।

দেখিতে শিলার ন্যায়। অনেকস্থানে লাটেরাইট মাটি টুকরা করিয়া কাটিয়া গৃহ নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। লাটেরাইটের রং লাল এবং ইহাতে নাইট্রোজেন, ফসফোরস, পটাশিয়ম ও চুনের অভাব থাকে।

কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা

প্রধানতঃ মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, পশ্চিম অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ মাদ্রাজে কৃষ্ণবণ মৃত্তিকা বিস্তৃত আছে। ইহা প্রধানত এঁটেল মাটি এবং শুষ্ক ঋতুতে ইহাতে গভীর ফাটলের সৃষ্টি হয়। মাটির বিভিন্ন স্তরে প্রায়শই চুন জমা থাকে দেখা যায়। নাইট্রোজেন ও ফসফোরস-ঘটিত রাসায়নিক সার, সবুজ সার ও গোবর সার প্রয়োগে এ মাটিতে উত্তম ফসল পাওয়া যায়। এই মাটিতে প্রধানত তুলার চাষ হয় বলিয়া ইহাতে অনেক সময় ব্ল্যাক কটন সয়ল্ (black cotton soil) নামে অভিহিত করা হয়।

পলিজ মাটি

নদীর উভয় তীর ও বদ্বীপ অঞ্চল এই মাটি দ্বারা গঠিত এবং সকল রাজ্যেই এই মাটি দেখা যায়। নদীর উভয় পার্শ্ব বন্যাপ্লাবিত হইলে নদী বাহিত পদার্থ সমূহ জমা হইয়া এই মাটি গঠন করে। এই মাটির সংযুক্তি নানাপ্রকার ; কিন্তু যে কোন অঞ্চলে এই মাটি অতিশয় উর্বর। এই মাটিতে নাইট্রোজেনের প্রায়ই অভাব থাকে এবং অনেক সময় ফসফোরস-ঘটিত সার প্রয়োগেও ফসল সাড়া দেয়। পলিজ মাটিতে উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান, গম ও আখ হইল প্রধান।

অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের মাটি

বৃক্ষের বৃদ্ধির উপযোগী বৃষ্টিপাত যুক্ত উচ্চ এবং নিম্নভূমি অঞ্চলে অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের মাটি দেখা যায়। ভারতে প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ জমি এই মাটি দ্বারা গঠিত। অধিকাংশ মাটি এতই পাতলা বা ঢালু বা প্রস্তরপূর্ণ বা অনুর্বর যে ফসল উৎপাদনের একান্তই অনুপযোগী। অবশ্য এই

শ্রেণীর মাটির কোনই উপকারিতা যে নাই তাহা নয়। অরণ্যজাত বিভিন্ন পদার্থ, যেমন কাঠ ও জ্বালানি এই শ্রেণীর মাটি দ্বারা গঠিত অঞ্চল হইতে পাওয়া যায় এবং ঐসকল বৃক্ষ পার্বত্য মাটিকে ভূমিক্ষয়ের হাত হইতে রক্ষা করে।

মরু অঞ্চলের মাটি

রাজস্থান ও পাঞ্জাবের স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে এই মাটি দেখা যায় এবং মাটি প্রধানত বেলে। মাটিতে দ্রবণীয় লবণসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণে (কখনও অতিরিক্ত পরিমাণে) উপস্থিত থাকে এবং জৈব পদার্থ কম থাকে। এই মাটির কোন অংশে চুন বেশি থাকে ; কোথাও আবার কম থাকে। জলসেচন করিলে মরু অঞ্চলের মাটিতে প্রায়ই ভাল ফলন পাওয়া যায়। জলসেচনের ব্যবস্থা না থাকিলে, প্রবল বায়ু এই মাটিকে উড়াইয়া লইয়া যায় এবং অনেক সময় রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, রেলপথ প্রভৃতি আবৃত করিয়া ফেলে।

লাবণিক ও ক্ষারীয় মাটি

মরু অঞ্চল অপেক্ষা সামান্য অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে লাবণিক ও ক্ষারীয় মাটি দেখা যায়। বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের অর্ধ বিশুষ্ক (semi-arid) অঞ্চল লাবণিক ও ক্ষারীয় মাটি দ্বারা গঠিত। এই মাটিতে জল সেচন করিলে জলনিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, নতুবা মাটির উপরি স্তরে এত লবণ জমা হয় যে, কোন ফসলের চাষ একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

পিট ও জলাভূমির মাটি

নীচু জলা জমিতে যে সকল উদ্ভিদ জন্মায় তাহারাই এই মাটি গঠন করে এবং প্রধানত কেরালা ও বিহারে দেখা যায়। উদ্ভিদ মারা গেলে অতিরিক্ত জলের জন্য তাহাদের অবশেষ সহজে পচে না। কয়েক শত বৎসর পরে এই মাটির উপরিতলে আংশিক পচা জৈব পদার্থের একটি স্তর গঠিত হয়। আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী নিম্নভূমিতে পিট ও জলাভূমির

মাটি সাধারণত গঠিত হয়। যথাযথ জল নিকাশন ও সার প্রয়োগ করিলে এই শ্রেণীর জমিতে উত্তম ধান ফলে।

সংক্ষিপ্তসার

কৃষিকার্যে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে, আবহাওয়ার সহিত লাঙল চালানো, বীজবপন, সার প্রয়োগ ও ফসল আহরণের সময়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৭৫ ভাগ জুন হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু হইতে সংঘটিত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতে রাজস্থানের মরুভূমিতে কিঞ্চিৎ ন্যূন পাঁচ ইঞ্চি হইতে আসামের খাসী পর্বতে ৪২৫ ইঞ্চি পর্যন্ত তারতম্য ঘটে। ভারতের কোন কোন জেলায় অনাবৃষ্টি ও বন্যা উভয়ই সংঘটিত হয়।

উদ্ভিদ, প্রাণী ও জলবায়ুর প্রভাবে শিলা হইতে মাটি গঠিত হয় এবং ভূসংস্থান ও সময় মৃত্তিকা গঠনের গতিকে প্রভাবিত করে। সাধারণভাবে স্বীকৃত ভারতের মাটির শ্রেণীসমূহ হইল লাল, ল্যাটেরাইট, কৃষ্ণবর্ণ, পলিজ, অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের, মরু অঞ্চলের, লাবণিক ও ক্ষারীয়, পিট ও জলাভূমির মাটি।

প্রশ্ন

১। আবহাওয়ার সহিত কৃষিকার্যের সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তা কি? একটি উদাহরণ দাও।

২। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী ঋতুতে আর্দ্রতার প্রধান উৎস কি?

৩। তোমার রাজ্যের রাজধানীতে বৃষ্টিপাতের অবস্থা কি?

৪। মৃত্তিকা গঠনের পাঁচটি কারণ উল্লেখ কর।

৫। তুমি যে অঞ্চলে বাস কর সে অঞ্চলের মাটি কোন শ্রেণীর অন্তর্গত? সে শ্রেণীর মাটি বর্ণনা কর।

সহায়ক পুস্তক

Arakeri, H. R. G. V. Chalam, P. Satyanarayan, and Roy L. Donahue, *Soil Management in India*, Asia Publishing House, Bombay, Second Edition 1962.

Donahue, Roy L., *Our Soils and Their Management an Introduction to Soil and Water Conservation,* **The Interstate, Danville, Illinois, U. S. A., Second Edition, 1961.**

Donahue, Roy L , *Soils : An Introduction to Soils and Plant Growth,* **Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, U. S. A., 1958.**

Final Report of the All-India Soil Survey Scheme, **Bulletin 73, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, 1958.**

Indian Agricultural Atlas, **Directorate of Economic and Statistics, Ministry of Food and Agriculture, New Delhi, The Manager of Publications, Delhi, 1956.**

Randhawa, M. S., *Agriculture and Animal Husbandry in India,* **Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, 1958.**

Sohoni, V. V., *Climatological Tables of Observatories in India.* **Manager of Publications, Civil Lines, Delhi, 1953.**

নবম অধ্যায়

কর্ষণ (Tillage)

ফসলের বৃদ্ধির জন্য উত্তম বীজতলা তৈয়ার, আগাছা নিয়ন্ত্রণ এবং কতকাংশে কীটশত্রু ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য। উত্তম বীজতলা বলিতে তাহাকেই বুঝায় যে বীজতলায় বীজ অঙ্কুরিত হয়, ফসল বৃদ্ধি পায় ও সর্বোচ্চ ফলন হয়। উত্তম বীজতলা আর্দ্র ও নিবিড় হওয়া আবশ্যক, বীজতলায় ঢেলা থাকিবে না এবং বীজতলার নিচে কঠিন স্তর বা শিলা থাকিলে তাহার উপরে অন্তত ৩ ফুট মাটি থাকা বাঞ্ছনীয়।

যথাসময়ে জমি কর্ষণ করিলে আগাছা এবং কিছু কীটশত্রু ও রোগ দমন করা যায়। আগাছা দমন ফলপ্রসূ করিতে হইলে আগাছা মাটির উপরে এক ইঞ্চি লম্বা হইলেই লাঙ্গল বা বিদে মই (harrow) চালাইতে হয়।

বহু কীটশত্রু মাটিতে বা উদ্ভিদ অবশেষ বা আগাছায় আশ্রয় গ্রহণ করে। মাজরা পোকা, ফড়িং ও কাটুই পোকা তাহাদের জীবন চক্রের এক অংশ মাটির ভিতরে কাটায়। অনুরূপভাবে কিছু রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু, আগাছা ও উদ্ভিদ অবশেষে বাস করে। কর্ষণ এই সকল রোগ ও কীটশত্রুর আশ্রয়দাতা আগাছাকে ধ্বংস করে; আগাছা বিনাশের ফলে এই সকল রোগজীবাণু ও কীটশত্রুও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কর্ষণের ফলে মাটি ও উদ্ভিদ অবশেষ বায়ু ও সূর্যালোকে উন্মুক্ত হয় ও শুকাইয়া যায়; ফলে কিছু কীটশত্রু ও রোগজীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কর্ষণের ফলে মৃত্তিকাস্থিত বহু কীটশত্রু মাটির উপরে উঠিয়া আসে এবং পাখিরা তাহাদের ধরিয়া খাইয়া ফেলে।

লাঙ্গল চালনা (Ploughing)

মাটি নড়াইবার জন্য আদিম মানুষ প্রথম লাঙ্গল উদ্ভাবন করে (চিত্র নং ৭৭)। আধুনিক লাঙ্গল মাটি উন্মুক্ত করে, মাটিকে গুঁড়া করে এবং উদ্ভিদ-অবশেষকে আবৃত করে; ফলে মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব গঠন উন্নত
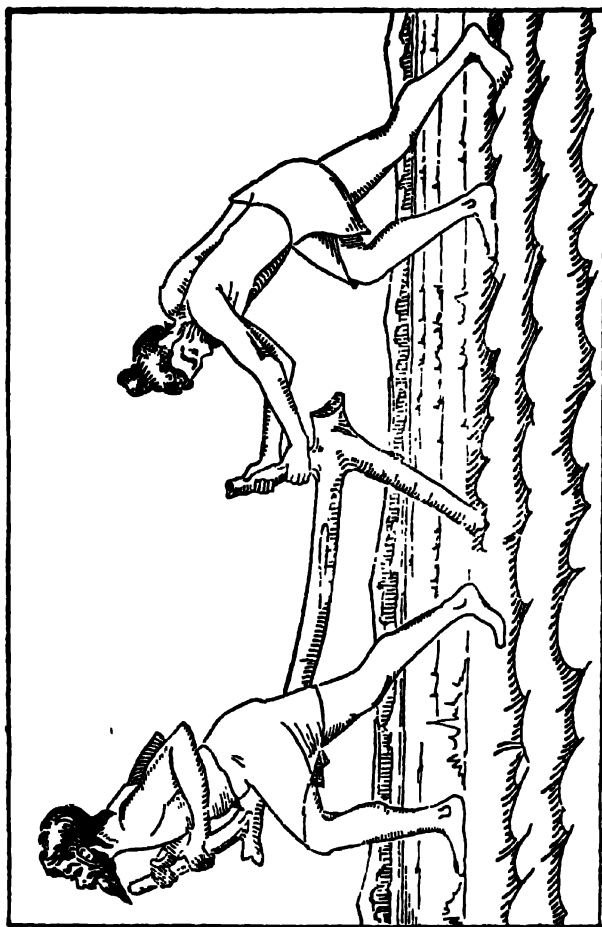
চিত্র নং ৭৭। একর পিছু অধিক খাদ্য ফলাইবার উদ্দেশ্যে আদিম মানুষ তাহার যথাসাধ্য ভূমি কর্ষণ করিত।

[H. R. ARAKERI মহাশয়ের সৌজন্যে]।

করে। এই সকল কারণেই লাঙ্গল চালনা আবশ্যক যদিও ইহা খামারের সব চাইতে ব্যয়বহুল ক্রিয়া এবং ফসল উৎপাদনের মোট ব্যয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইহাতে খরচ হয়। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য দেখা গিয়াছে যে কোন কোন জমিতে প্রত্যেক ফসল চাষের পূর্বে লাঙ্গল চালনার প্রয়োজন হয় না।

প্রত্যেক ফসলের পূর্বে লাঙ্গল চালনা করিতে হইবে কিনা তাহা স্থির করিবার পূর্বে পূর্ববর্তী ফসল কি ছিল, কোন ফসলের চাষ করা হইবে, জমিতে কোন শ্রেণীর আগাছা আছে ও তাহার প্রতাপ, মৃত্তিকা ও জলবায়ু ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হইবে।

নূতন ও অকর্ষিত জমিকে লাঙ্গল চালনা ব্যতিরেকে চাষের উপযোগী করা যায় না। পূর্ববর্তী ফসল যদি ইক্ষু, লুসার্ন বা অন্য কোন ফসল হয়, তাহাদের কাটিয়া লইয়া যাইবার পর জমিতে প্রচুর উদ্ভিদ-অবশেষ পড়িয়া থাকে এবং মাটি শক্ত হইয়া যায়, ফলে লাঙ্গল চালনা ব্যতীত তাহাকে পরবর্তী অধিকাংশ ফসলের উপযোগী করিয়া তোলা যায় না। অনুরূপ ভাবে জোয়ার বা ভুট্টার শক্ত ডাঁটা কাটিয়া লইয়া যাইবার পর মোটা ফসল অবশেষকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে লাঙ্গল চালনা আবশ্যক। ডালশস্য, বাজরা, আলু, তুলা বা চীনাবাদাম প্রভৃতি ফসলের পর পরবর্তী ফসলের জন্য জমি তৈয়ার করিতে লাঙ্গল চালনার আবশ্যক হয় না।

লাঙ্গল চালনা প্রয়োজন কিনা এবং প্রয়োজন হইলে কত গভীর করিয়া লাঙ্গল চালাইতে হইবে তাহা অনেকটা যে ফসলের চাষ করা হইবে তাহার উপর নির্ভর করে। কোন ফসলের জন্য শিথিল বীজতলা আবশ্যক, আবার কোন ফসলের জন্য দৃঢ় বীজতলা প্রয়োজন। কোন ফসল দীর্ঘকাল মাটিতে থাকে, আবার কোন ফসল স্বল্পকাল মাত্র মাটির মধ্যে থাকে। ইক্ষু এবং লুসার্ন জাতীয় ফসল দীর্ঘকাল মাটিতে থাকে এবং এই সকল ফসলে জলসেচন আবশ্যক ; এজন্য ইহাদের জমি গভীর করিয়া চাষ করিতে হয়। আদা, হলুদ, মিষ্টি আলু, আলু প্রভৃতি মূল ফসলের (root crops) জন্য ঝুরঝুরে বীজতলা আবশ্যক। কাজেই লাঙ্গল চালনাও আবশ্যক। সেচ প্রয়োগের জন্য জমি তৈয়ার করিতে বহুবার লাঙ্গল চালাইতে হয়। শুষ্ক-ভূমি ফসলের জন্য জমিতে আগাছা না থাকিলে লাঙ্গল না চালাইলেও চলে ; বাজরা, গম ও জোয়ার ইত্যাদি ফসলের জন্য দৃঢ় বীজতলা দরকার, কাজেই লাঙ্গল না চালাইলে চলিতে পারে।

কাশ ঘাসের ন্যায় গভীর মূলবিশিষ্ট আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য লাঙ্গল চালনা, বিশেষতঃ গভীর কর্ষণ আবশ্যক। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে আগাছানাশক ঔষধ যথাযথ ব্যবহার করিলে ঘন ঘন লাঙ্গল চালনার আবশ্যক হয় না। কেবলমাত্র একবার লাঙ্গল চালনার পর যুক্তরাষ্ট্রে সাফল্যের সহিত প্রত্যেক বৎসরে বহু ভুট্টা ফসল উৎপন্ন করা হইয়াছে।

গভীর কালো এঁটেল মাটির নিচে অনেকদূর পর্যন্ত ফাটিয়া যায়, এজন্য এইসকল জমি নিজেরাই নিজেদের চাষ করে বলা হয়। দেখা গিয়াছে যে এই মাটিতে প্রতি বৎসর লাঙ্গল চালনার প্রয়োজন নাই। পুণায় (মহারাষ্ট্র রাজ্য) পরীক্ষায় দেখা যায় যে, দোআঁশ কৃষ্ণবর্ণ মাটিতেও আগাছা না থাকিলে প্রতি বৎসর লাঙ্গল চালনার আবশ্যক হয় না।

এঁটেল জাতীয় সূক্ষ্ম গ্রথন-বিশিষ্ট মাটি এবং যে মাটিতে জল উত্তমরূপে নিষ্কাশিত হয় না, সে মাটিতে বায়ু চলাচলের পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্যে লাঙ্গল চালনা আবশ্যক। এ প্রকার মাটিতে লাঙ্গল চালনার ফলে নাইট্রোজেন, ফসফোরস ও পটাশের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায়। বেলে মাটি জাতীয় স্থূল গ্রথন বিশিষ্ট মাটির গঠন উন্নয়নের জন্য লাঙ্গল চালনার প্রয়োজন হয় না। বিশুষ্ক অঞ্চলে লাঙ্গল চালনা ক্ষতিকারক হইতে পারে, কারণ ইহার ফলে বাষ্পীভবন হেতু মাটির জলের অপচয় বৃদ্ধি পায়।

ভারতের কোন কোন মাটিতে গভীর কর্ষণে উত্তম ফল পাওয়া যায়। গুজরাট রাজ্যের আনন্দ কৃষি বিদ্যালয়ে ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পরিচালিত এক পরীক্ষায় জানা যায় যে সাধারণ দেশী কাঠের লাঙ্গলে চারি ইঞ্চি গভীর কর্ষণ অপেক্ষা ট্রাক্টরের সাহায্যে ১৪ ইঞ্চি গভীর কর্ষণে বাজরার ফলন শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে (চিত্র নং ৭৮)।

পৃথিবীর বহু প্রায়-বিশুষ্ক অঞ্চলে পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে মাটি উল্টাইয়া তাহার নিচে ফসল-অবশেষ চাপা দেওয়া অপেক্ষা মাটির উপরিস্তরে মিশাইয়া রাখিয়া দেওয়া অপেক্ষাকৃত ভাল। ফসল-অবশেষ থাকার জন্য জল ও বায়ু তাড়িত ভূমিক্ষয় হ্রাস পায়, বৃষ্টির ফোঁটার আঘাত হেতু মাটির গঠন বিনষ্ট হইতে পারে না এবং মাটির উপর দিয়া অধিক জল গড়াইয়া যাইতে পারে না। কাজেই মাটি না উল্টাইয়া মাটি আলগা করা এবং ফসল-অবশেষ
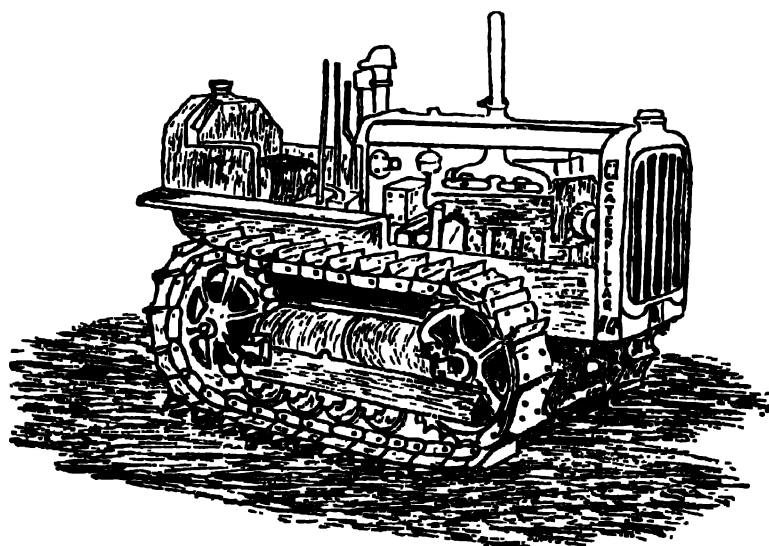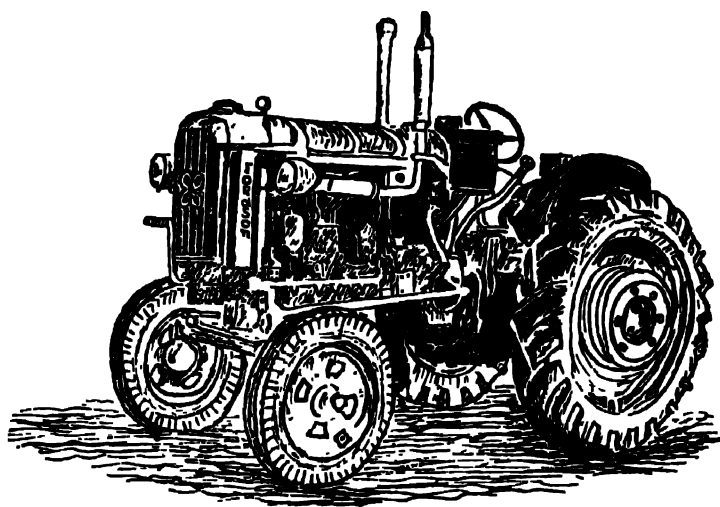
চিত্র নং ৭৮। কাশ ঘাস জাতীয় গভীর মূল সম্পন্ন আগাছা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গভীর কর্ষণ ও গভীর বীজতলা তৈয়ার করিবার জন্য গভীর কর্ষণ কেবলমাত্র চাকাযুক্ত ট্রাক্টর (উপরে) বা ক্রলার (crawler) ট্রাক্টর (নিচে) দ্বারাই সম্ভব।

[উপরে : : FORD MOTOR CO. এর সৌজন্যে।

নিচে : CATERPILLAR TRACTOR CO : এর সৌজন্যে]।

ও আগাছাকে মাটির উপরিস্তরে মিশাইয়া রাখার জন্য বহু প্রায় বিশুষ্ক-অঞ্চলে সুপারিশ করা হয়। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে বিভিন্ন পরীক্ষায় জানা যায় যে আর্দ্র অঞ্চলে অন্যান্য কর্ষণ পদ্ধতি অপেক্ষা মোল্ড বোর্ড (mounldboard) লাঙ্গল চালাইয়া জমি তৈয়ার করিলে ভুট্টার ফলন বৃদ্ধি পায় (চিত্র নং ৭৯ ও ৮০)।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ (Preparing the seed bed)

লাঙ্গল ও মই চালাইয়া, ঢেলা চূর্ণ করিয়া, জমি সমতল ও নিবিড় করিয়া বীজ তলা তৈয়ার করা হয়।

লাঙ্গল চালনায় উত্তম ফললাভের উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী ফসল আহরণের অব্যবহিত পরেই জমিতে লাঙ্গল চালাইতে হইবে। লাঙ্গল চালনার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়, কারণ এ সময়ে লাঙ্গল চালাইলে শক্তি কম লাগে, ঢেলা কম হয়, পূর্ববর্তী ফসলের অবশেষ বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং সূর্যকিরণে উন্মুক্ত হওয়ার জন্য কোন কোন জমির গঠন উন্নত হয়। পূর্ববর্তী ফসল কাটার পরে অনেক জমি কঠিন অবস্থায় থাকে; সকল জমিতে প্রথম বৃষ্টির পরেই লাঙ্গল চালানো উচিত।
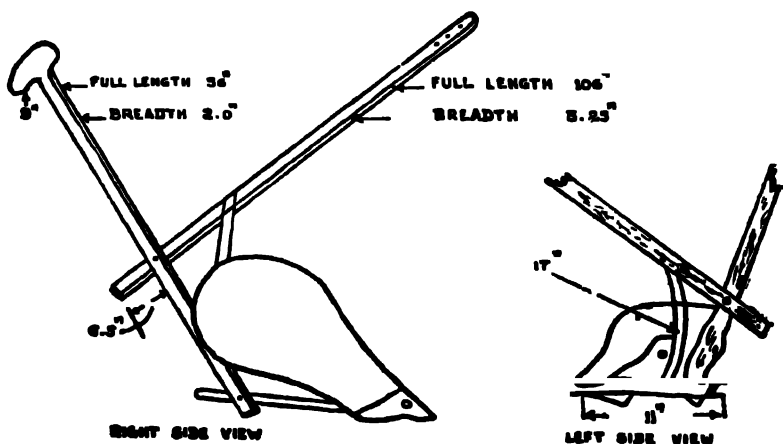
চিত্র নং ৭৯।। বলদ টানা মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল [RAMIAH and SRIVASTAVA হইতে পুনরঙ্কিত]।
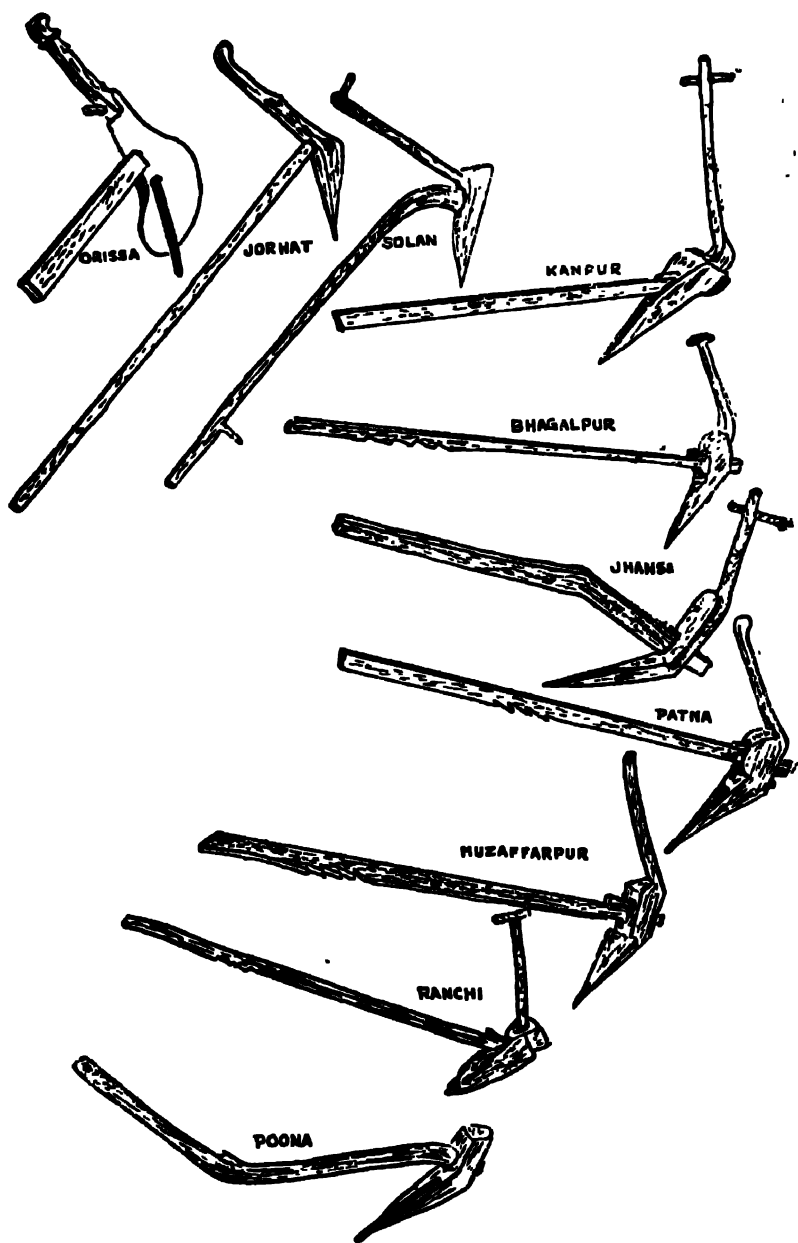
চিত্র নং ৮০ : ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ভূত ও ব্যবহৃত সাধারণ দেশী লাঙল [RAMIAH and SRIVASTAVA : হইতে পুনরঙ্কিত]।

লাঙ্গল চালনার পর জমি ঢেলাপূর্ণ, শিথিল ও অসমতল অবস্থায় থাকে। কাজেই ইহা বীজ বপনের উপযোগী হয় না। জমিকে আশানুরূপ বীজতলায় পরিণত করিবার জন্য আরও কয়েক প্রকার কর্ষণ যন্ত্রপাতি চালনা আবশ্যক। এক কথায় বলিতে গেলে লাঙ্গল চালনার পর কর্ষণের উদ্দেশ্য হইল দৃঢ় নিম্নস্তর সহ শিথিল, ঝুরঝুরে, সূক্ষ্মদানা গঠন সম্পন্ন উপরিস্তর বিশিষ্ট বীজতলা তৈয়ার। এই প্রকার বীজতলার মাটি সহজে ধুইয়া যায় না, বৃষ্টির জল সহজে মাটিতে প্রবেশ করে এবং বৃষ্টির পর মাটির উপরে কঠিন স্তর গঠিত হয় না। সুগঠিত বীজতলায় বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় এবং উদ্ভিদ মূলের অনায়াস বৃদ্ধি সম্ভব হয়।

সর্বদা ঢেলা চূর্ণ করিবার প্রয়োজন হয় না। মৃত্তিকার আর্দ্রতা যখন সব চাইতে উপযোগী অবস্থায় থাকে তখন লাঙ্গল চালাইলে খুব কম ঢেলার সৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল ফসল চাষের জন্য লাঙ্গল চালাইয়া বৃষ্টিপাত না হওয়া পর্যন্ত জমি ফেলিয়া রাখা হয়; এই প্রথায় ঢেলাগুলি নরম হইয়া চূর্ণ হয়। যথাসময়ে ফসলের চাষ না করিয়া অন্য সময়ে ফসলের চাষ করিতে গেলে ঢেলা চূর্ণন একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। প্রচুর সেচ জল পাওয়া গেলে ঢেলাপূর্ণ জমিতে জলসেচন করিয়া ঢেলাগুলি নরম করিয়া মাটির উপর দিয়া ভারী তক্তা টানিয়া লইয়া গেলে বা বাখার (blade harrow) চালনা করিয়া ঢেলা চূর্ণ করা যায়।

প্রতি বৎসর প্রয়োজন না হইলেও জমি উন্নয়নের একটি অঙ্গ হিসাবে মাঝে মধ্যে জমি সমতল করা দরকার। সেচ সম্পন্ন অঞ্চল ও যে অঞ্চলে ধান হয় সে সকল অঞ্চলের জমি সমতল হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। সেচ জল যাহাতে সমভাবে জমির সকল অংশে বিতরিত হয়, নিচু অংশে জল জমিয়া যাহাতে ফসল মারা না যায় এবং ভূমি ক্ষয় হ্রাস ও বাঁধের ভাঙ্গন রোধ করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণত বলদ টানা মই চালাইয়া জমি মোটামুটি সমতল করা হয়।

অনেক সময় অতিরিক্ত কর্ষণ দ্বারা মাটি অত্যন্ত বেশি ঝুরঝুরে করিয়া ফেলা হয়; ফলে জমিতে অতিরিক্ত বায়ু চলাচল করে এবং মাটির জলের অপচয় ঘটে। এ প্রকার শিথিল মাটিকে দৃঢ় করা আবশ্যক। তিসি, বাজরা, জোয়ার ইত্যাদি ক্ষুদ্র বীজসম্পন্ন ফসলের জন্য দৃঢ় বীজতলা আবশ্যক। ভারতে মাটির এই দৃঢ়ীকরণ সাধারণত বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতেই সম্পন্ন হয়। এজন্য কদাচিৎ

মাটির কৃত্রিম দৃঢ়ীকরণের আবশ্যক হয়। একটি বা দুইটি তক্তা টানিয়া লইয়া গিয়া মাটির কৃত্রিম দৃঢ়ীকরণ সমাধা করা যায়।

বিদে মই (harrow) চালনায় বহু উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ইহা ঢেলা চূর্ণ করে, বীজতলাকে সমতল করে, অঙ্কুরিত আগাছাকে ধ্বংস করে অন্তর্মৃত্তিকাকে দৃঢ় করে এবং উপরে শিথিল ঝুরঝুরে মাটি সৃষ্টি করে। বাখারের সাহায্যে সাধারণত বিদে মইয়ের কাজ সমাধা করা হয়। যথাসময়ে বিদে মই চালাইয়া শিথিল, ঝুরঝুরে ও উত্তম বায়ু চলাচলের উপযোগী বীজতলা তৈয়ার করা যায়। শুষ্ক অঞ্চলে এবং গভীর কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে যন্ত্রপাতির মধ্যে কেবল বাখার ও কাঁটা দাঁত বিদে মই (spike tooth harrow) চালাইয়া বীজতলা তৈয়ার করা হয় (চিত্র নং ৮১)।

মাধ্যমিক পরিচর্যা (Inter cultivation)

ফসল বোপণের পূর্বে জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে হইবে এবং ফসল বড় হইয়া যতদিন পর্যন্ত না আগাছার বৃদ্ধি রোধ করিতেছে ততদিন পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালাইয়া যাইতে হইবে। ফসলের সম্পূর্ণ অঙ্কুরোদ্গমের পূর্বে যে পরিচর্যা করা হয় তাহা প্রধানত উপরে গঠিত কঠিন স্তর ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যে করা হয়। এই পরিচর্যার ফলে বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং অঙ্কুরিত আগাছা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

সাম্প্রতিক কালে মাধ্যমিক পরিচর্যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতদ্বৈধতা দেখা দিয়াছে। পূর্বে মনে করা হইত মাধ্যমিক পরিচর্যার ফলে মাটির উপর যে ঝুরা মাটির সৃষ্টি হয় তাহা মৃত্তিকার জলের বাষ্পীভবন হ্রাস করিত। কিন্তু সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে মুখ্যত আগাছা দমনের জন্যই মাধ্যমিক পরিচর্যা আবশ্যক। আগাছার হ্রাসপ্রাপ্তি এবং স্বল্পতর আগাছা হেতু স্বল্পতর বাষ্পমোচনে মৃত্তিকার জল প্রধানত সংরক্ষিত হয়।

মাধ্যমিক পরিচর্যার ফলে আগাছা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া মৃত্তিকায় জলের অনুপ্রবেশ ও বায়ু চলাচলের পথও সুগম হয়। বৃষ্টিপাতের প্রভাবে যে মাটি দৃঢ় হইয়া গিয়াছে যথাযথ পরিচর্যার ফলে তাহা শিথিল হয় এবং বায়ু চলাচলের পথ সুগম হয়, উপকারী জীবাণুরা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং উদ্ভিদ পোষক পদার্থের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায়।
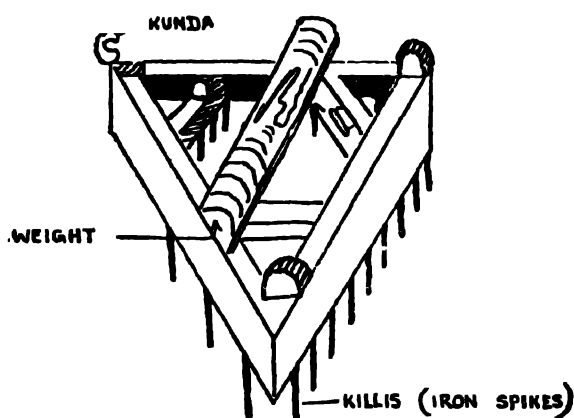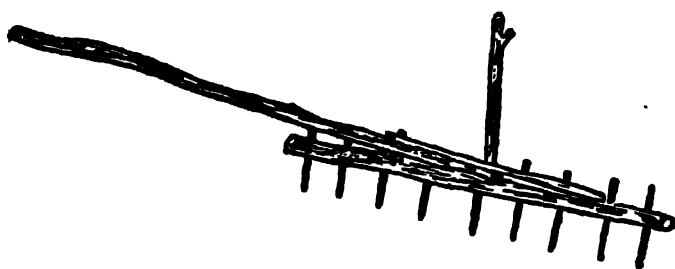
চিত্র নং ৮১। **Kunda**—টানিবার আঁকড়া ; **Weight**—ওজন ; **Killis**—লোহার দাঁত ছড়াইয়া বীজবপনের (**broadcast sowing of seed**) পূর্বে এবং পরে বীজ আবৃত করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণত স্পাইক টুথ হ্যারো চালানো হয়। উপরে : কাঠের দাঁতযুক্ত স্পাইক টুথ হ্যারো। মধ্যে : লোহার দাঁতযুক্ত হ্যারো : নিচে : প্রধানত পাঞ্জাবে ব্যবহৃত বার হ্যারো (**bar harrow**)।

[**RAMIAH and SRIVASTAVA** : হইতে পুনরঙ্কিত]

অনেক সময় মৃত্তিকার আর্দ্রতা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক পরিচর্যা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ মহীশূর রাজ্যের কোন কোন তুলাজমিতে আর্দ্রতা হ্রাস করিয়া অঙ্গজ বৃদ্ধি হ্রাস এবং ফুল ও ফল ধারণে উদ্ভিদকে উদ্দীপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক পরিচর্যা করা হয়।

কতদিন অন্তর মাধ্যমিক পরিচর্যা করা দরকার
(Frequency of inter-cultivation)

একটি ফসলে কয়বার মাধ্যমিক পরিচর্যা করিতে হইবে তাহার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, আগাছা নিয়ন্ত্রণে এবং মাটির গঠন যথাযথ রক্ষণে ন্যূনপক্ষে যে কয়বার মাধ্যমিক পরিচর্যা প্রয়োজন তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে। অতিরিক্ত মাধ্যমিক পরিচর্যায় মাটির গঠন উন্নত না হইয়া বরং ভাঙ্গিয়া যায়।

অন্যান্য যে সকল কারণ মাধ্যমিক পরিচর্যাকে প্রভাবিত করে সেগুলি হইল আগাছা, মৃত্তিকার প্রকার, ফসল ও জলবায়ু। আগাছা বেশি থাকিলে মাধ্যমিক পরিচর্যাও অধিকতর ঘন ঘন করিতে হয়। মাটির গঠন উত্তম হইলে ঘন ঘন মাধ্যমিক পরিচর্যার আবশ্যক হয় না। ধূলার ন্যায় ঝুরঝুরে মাটি প্রত্যেক বৃষ্টিপাতের পরেই দৃঢ় হইয়া যায়; কাজেই প্রায় প্রত্যেক বৃষ্টিপাতের পরেই মাধ্যমিক পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। কোন কোন ফসলে অন্যান্য ফসল অপেক্ষা অধিককাল মাধ্যমিক পরিচর্যা করিতে হয়। যেমন লঙ্কা, ইক্ষু, তুলা, তামাক প্রভৃতি দূরে দূরে লাগানো ফসলগুলিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া মাধ্যমিক পরিচর্যা করিতে হয়, অপর পক্ষে গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি যে সকল ফসল স্বল্পকালে মাটি ঢাকিয়া ফেলে সে সকল ফসলে কয়েকবার মাত্র মাধ্যমিক পরিচর্যা করিলেই চলে। চীনাবাদামে ফুল আসিবার পর মাধ্যমিক পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। চীনাবাদামে কেবল দুইবার মাধ্যমিক পরিচর্যা করিলেই চলে।

বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতে মাটির গঠন বিনষ্ট হয়; সেহেতু অধিকতর ঘন ঘন মাধ্যমিক পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। বারংবার বৃষ্টিপাতের ফলে আগাছার উপদ্রব বৃদ্ধি পায়; সে জন্য আগাছা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেও বারংবার মাধ্যমিক পরিচর্যার আবশ্যক হয়।

মাধ্যমিক পরিচর্যার গভীরতা (Depth of inter-cultivation)

মাটিতে কতদূর গভীর করিয়া মাধ্যমিক পরিচর্যা করা হইবে তাহা ফসল ও আগাছার বৃদ্ধির উপরে নির্ভর করে। ফসলের চারা বড় হইয়া স্থিতিলাভ না করা পর্যন্ত গভীর করিয়া মাধ্যমিক পরিচর্যা করা যায় না, কারণ তাহাতে চারা মূলসহ উঠিয়া আসিতে পারে। আবার বেশ বড় ফসলেও গভীর করিয়া মাধ্যমিক পরিচর্যা করা ঠিক নয়, কারণ তাহাতে উদ্ভিদের মূল ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে এবং ফলন কমিয়া যাইতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

ফসলের জন্য উৎকৃষ্ট বীজতলা তৈয়ার ও আগাছা নিয়ন্ত্রণ কর্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। কর্ষণের সাহায্যে কয়েক প্রকার রোগ এবং কীটশত্রুও কতকাংশে দমন করা যায়। লাঙ্গল চালনা সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল কর্ষণ প্রক্রিয়া ; এজন্য যাহাতে ন্যূনতম লাঙ্গল চালনা করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অনেক জমিতে প্রত্যেক বৎসর লাঙ্গল চালনা প্রয়োজন হয় না। মাধ্যমিক পরিচর্যা যত অগভীর করা যায় ততই ভাল এবং আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য যতটুকু গভীর করা প্রয়োজন কেবল ততটুকুই গভীর করিতে হয়।

প্রশ্ন

১। প্রধানত কি কি কারণে কর্ষণ করা হয় ?

২। বীজতলা প্রস্তুতকরণে কোন্ কোন্ অবস্থায় লাঙ্গল চালনা আবশ্যক ?

৩। কোন্ কোন্ অবস্থায় লাঙ্গল চালনার প্রয়োজন হয় না ?
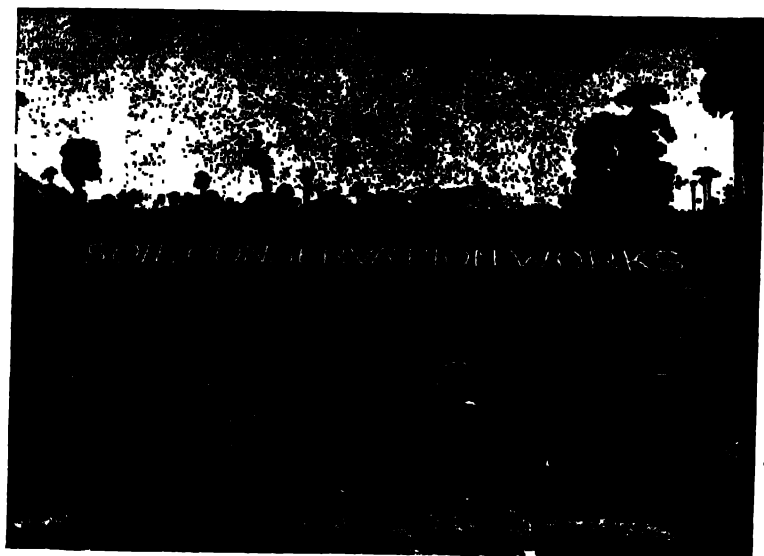
ফটো নং ৪৫।

নির্মিত বাঁধের গায়ে প্রচারের উদ্দেশ্যে "Soil Conservation Works" কথাটি লেখা হইয়াছে।
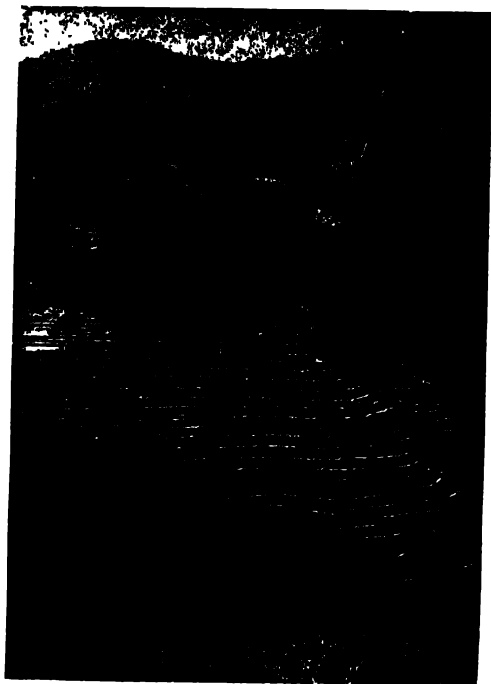
ফটো নং ৪৬।

খুব ঢাল জমিতে বেঞ্চ টেরেচ (bench terrace) বা ঢালের আড়াআড়ি ভাবে অল্প দূরে দূরে বাঁধ নির্মাণ করিলে ভূমিক্ষয়ের সাম্ভবনা হ্রাস পায়।

ফটো নং ৪৭।

মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণ এবং জলসেচের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে সম্প্রসারণ কর্মিদের শিক্ষাদান করা হইতেছে।

ফটো নং ৪৮।

বহু শতাব্দী পূর্বে উদ্ভূত ভারতের দেশী লাঙ্গলের আজ পর্যন্ত সামান্যই রূপান্তর ঘটিয়াছে [FRANK SHUMAN মহাশয়ের সৌজন্যে]।

ফটো নং ৪৯।

আগ জাতীয় ফসল চাষের পরে সাধারণ লাঙ্গল চালাইতে অসুবিধা হইতে ভারতের কৃষকগণ সাধারণত দুই বা ততোধিক জোড়া বলদ চালিত মাটি উল্টানো লোহার লাঙ্গল ব্যবহার করেন।

ফটো নং ৫০।

বলদ চালিত উত্তম যন্ত্রপাতি ব্যবহার সত্ত্বেও অনেক জমিতে এত ঢেলার সৃষ্টি হয় যে উত্তম বীজতলা তৈয়ারি করিতে হইলে মুগুরের সাহায্যে ঢেলা চূর্ণ করিতে হয়।

ফটো নং ৫১।

জমিতে আগাছা অপেক্ষাকৃত কম থাকিলে এবং মাটি নরম থাকিলে পরবর্তী ফসলের জন্য লাঙ্গল চালনার প্রয়োজন হয় না। কখনও কখনও কেবলমাত্র বাখার ব্যবহার করা হয় (উপর ও নীচের ছবিতে বাখার দেখানো হইয়াছে)।

ফটো নং ১২।

বীজের দুই ইঞ্চি নীচে ও দুই ইঞ্চি পার্শ্বে প্রয়োগ করিতে পারিলে অধিকাংশ রাসায়নিক সারে সর্বাধিক কাজ পাওয়া যায়। সাধারণ বলদ চালিত যন্ত্রপাতির দ্বারা এরূপ স্থানে

সার প্রয়োগ সচরাচর সম্ভব হয় না। তবে দেশী লাঙ্গলে একটি ফুটা হইতে সম্মুখে ও দুই ইঞ্চি পার্শ্বে অপর একটি ফুটো করিয়া দুইটি নল ও ফানেল লাগাইয়া অনায়াসে উহাকে সার ও বীজ বপন যন্ত্রে রূপান্তর করা যায়। সামনের ফুটো দিয়া সার প্রয়োগ করা হয়।

ফটো নং ৫৫ ও ৫৬।

বহু ফসল, যেমন আখ ও ধানের প্রচুর জলের প্রয়োজন। অনেক সময় এই জল তাহার উৎস হইতে উপরে তুলিতে হয়। এখানে জল তুলিবার দুই প্রকার যন্ত্র দেখানো হইয়াছে ঃ

উপরে—তিনটি দোন পাশাপাশি জল তুলিতেছে।

নিম্নে—আর্কিমিডিস স্ক্রু এর ন্যায় যন্ত্র। উহাতে নলটির ভিতর প্যাঁচাল (spiral) ব্যবস্থা আছে যাহার ফলে হাতলের সাহায্যে নলটি ঘুরাইলে জল উপরে উঠে।

[FRANK SHUMAN মহাশয়ের সৌজন্যে]।

ফটো নং ৫৭ ও ৫৮। ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় বীজ বপন ও সার প্রয়োগ সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। উপরে—গ্রামে তৈয়ারি তিন লাইনে বীজ বপন যন্ত্র। উপরে কানেলে বীজ দেওয়া হয় এবং বীজ নলের ভিতর দিয়া মাটিতে পড়ে। সার পৃথকভাবে ছড়াইতে হয়। নীচে—ট্রাক্টর বা বলদ চালিত সম্প্রতি উদ্ভাবিত তিন লাইনে সার প্রয়োগ ও বীজ বপন
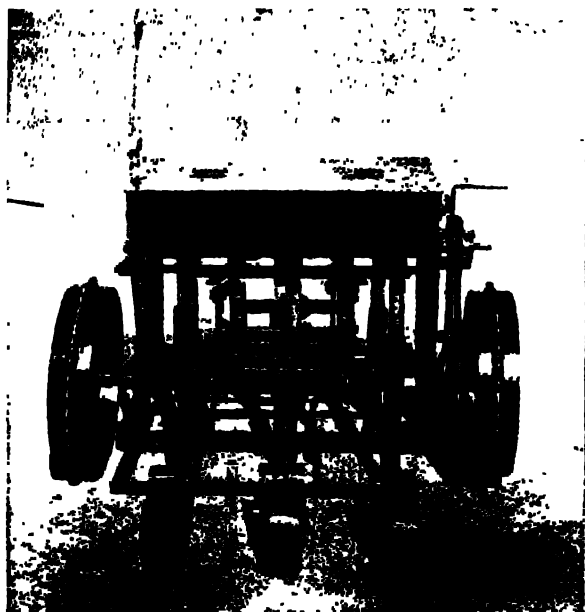
যন্ত্র। বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে বীজের দুই ইঞ্চি নিম্নে ও পার্শ্ববর্তী স্থানে সার প্রযুক্ত হয়

নীচের ফটো—প্রতিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং সেকেন্দ্রাবাদ, অন্ধ্র প্রদেশ, এর সৌজন্যে।

দশম অধ্যায়

পশ্চিম বঙ্গে প্রধান প্রধান ফসলের বণ্টন ও কয়েকটি ফসল

পশ্চিম বঙ্গে প্রধান প্রধান ফসলের বণ্টন

পশ্চিম বঙ্গে কৃষিকার্য মূলত প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। এজন্য এ রাজ্যের কৃষির উপর জলবায়ুর প্রভাবই সর্বাপেক্ষা বেশী। অবশ্য মাটিও বিভিন্ন ফসলেব বণ্টনের জন্য কিছুটা দায়ী। নিম্নে প্রধান প্রধান খাদ্য ও অর্থকরী ফসলগুলির আঞ্চলিক অবস্থান প্রদত্ত হইল।

খাদ্য ফসল

ধান—পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই ধান চাষ হয়। তন্মধ্যে মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, ২৪ পরগনা, হুগলী, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গম—পশ্চিমবঙ্গে গমের চাষ অপেক্ষাকৃত কম। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বর্ধমান, নদীয়া, পশ্চিমদিনাজপুর, কুচবিহার, বাঁকুড়া ও বীরভূম প্রভৃতি জেলায় অল্পবিস্তর গমের চাষ হয়।

আলু—যদিও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র অল্পবিস্তর আলুর চাষ হয়, তবে হুগলী, বর্ধমান. মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলাতেই ব্যাপকভাবে আলুর চাষ হয়। তন্মধ্যে হুগলী ও বর্ধমান জেলা আলু চাষে খুবই প্রগতিশীল।

ভুট্টা—বিহার ও উত্তর প্রদেশবাসীর ইহা একটি প্রিয় খাদ্য। পশ্চিমবঙ্গে ইহার চাষ কম তবে ইহার সম্ভাবনা আছে প্রচুর। প্রধানত ২৪ পরগনা,

নদীয়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানে সামান্য পরিমাণ জমিতে ইহার চাষ হয়।

ডাল শস্য—পশ্চিমবঙ্গে ডালের চাষ হইলেও চাহিদার তুলনায় উৎপাদন খুবই কম। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও ২৪ পরগনায় ডালের চাষ হয়।

অর্থকরী ফসল

ইক্ষু—নদীয়া, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পশ্চিম দিনাজপুরে ব্যাপকভাবে ইক্ষুর চাষ হয়। উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ইক্ষুর ফলন বেশী।

পাট—ইহাই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান অর্থকরী ফসল। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই পাট চাষের জমি বেশী এবং উৎপাদনও বেশী। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগনা, কুচবিহার, হুগলী ও জলপাইগুড়ি জেলায় ব্যাপকভাবে পাটের চাষ হয়।

তৈলবীজ—যে সকল শস্য হইতে তৈল প্রস্তুত করা যায় তাহাদিগকে তৈলবীজ বলে। সরিষা, তিল, তিসি, রেড়ি, বাদাম পশ্চিমবঙ্গের প্রধান তৈলবীজ। হুগলী, ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় প্রচুর তৈলবীজের চাষ হয়।

ফল—পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান ফলগুলি হইল কলা, আম, পেয়ারা, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে, আনারস ও কমলালেবু। মালদহ ও মুর্শিদাবাদের আম, হুগলীর কলা, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের আনারস, দার্জিলিঙের কমলালেবু বিখ্যাত।

চা—পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর চায়ের চাষ হয় এবং এই চা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ও বিদেশে রপ্তানি হয়। দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি জেলা চা চাষের জন্য বিখ্যাত।

নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসলগুলির জমির পরিমাণ ও গড় উৎপাদন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা প্রদত্ত হইল।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসলগুলির জমির পরিমাণ ও গড় উৎপাদন

	ফসল	জমির পরিমাণ (সহস্র একর)	একর প্রতি গড় ফসল (মণ)
১ ।	আউশ (চাউল)	১৩০০·০০	৮·০০
২ ।	আমন (চাউল)	৯৫০০·০০	১২·০০
৩ ।	বোরো (চাউল)	৫০·০০	১১·০০
৪ ।	গম	৯০·০০	৯·০০
৫ ।	যব	১০০·০০	৮·০০
৬ ।	ভুট্টা	১৩৫·০০	৮·০০
৭ ।	ছোলা	৫০০·০০	৬ ৫০
৮ ।	খরিপ ডাল শস্য	৫৬·০০	৫·৫০
৯ ।	রবি ডাল শস্য	১২০০·০০	৫·০০
১০ ।	সরিষা	২৫০·০০	৫·০০
১১ ।	পাট	১১০০·০০	৩·২৫ (বেইল)
১২ ।	মেস্তা	৩৫০·০০	২·৫০
১৩ ।	ইক্ষু	৭০·০০	৫০০·০০
১৪ ।	আলু	১২৫·০০	১১০·০০
১৫ ।	তামাক	৪০·০০	৭·৫০
১৬ ।	লঙ্কা (শুষ্ক)	২৫·০০	১৫·০০

ধান

(*Oryza sativa*)

ধান (চাউল) পৃথিবীর পুরাতন ফসলগুলির মধ্যে অন্যতম এবং চাউল ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীর প্রধান খাদ্য। সহজপাচ্য স্টার্চে ইহা সমৃদ্ধ, কিন্তু প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ চাউলে খুবই কম থাকে। ধানের উপজাত খড় পশুখাদ্য হিসাবে নিকৃষ্ট হইলেও ভারতে ইহা প্রধান পশুখাদ্য। চাউল নানা-ভাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ইহা সিদ্ধ করিয়া খাওয়া হয়।

কোন্ কোন্ অঞ্চলে ধান চাষ হয়

ধানের চাষ প্রধানতঃ তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যেমন গম প্রধান ফসল, সেরূপ এশিয়াতে ধান প্রধান তণ্ডুল জাতীয় ফসল। উত্তর-পূর্ব ভারতকেই ধানের আদিভূমি বলিয়া মনে করা হয়। ভারতের প্রায় প্রত্যেক অঙ্গ রাজ্যেই ধানের চাষ হয়। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশে ধান চাষের জমি বেশী বটে, কিন্তু অন্ধ্র-প্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর ও কেরালায় ধানের একর প্রতি ফলন অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা বেশী। ভারতে যত জমিতে খাদ্য ফসলের চাষ হয় তাহার শতকরা ৪০ ভাগ জমিতে ধান চাষ হয়। কিন্তু ধান চাষের এত ব্যাপক প্রচলন সত্ত্বেও ভারত চাউলে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রায় প্রত্যেক বৎসর ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড ও আমেরিকা হইতে চাউল আমদানি করিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ কোটি একর জমিতে ধান চাষ হয় এবং একর প্রতি ফলন হইল ২০ হইতে ৩০ মণ।

প্রকৃতি

ধান বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহা সাধারণতঃ ২ হইতে ৬ ফুট উঁচু হয় এবং অনুকূল অবস্থায় ইহার ৩০ হইতে ৪০ টি বিয়ান (tiller) হইতে পারে। খোসাসহ চাউলকে ধান বলে। ধানের খোসা ছাড়াইলেই চাউল পাওয়া যায়। খোসা ছাড়াইলে ইহাকে বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। বর্ণ, আয়তন ও আকৃতি ভেদে প্রত্যেক রাজ্যে ধানের বহু জাত আছে। কোন কোন জাত আবার সুগন্ধিযুক্ত। বপনের সময় হইতে পাকিতে কোন কোন জাতের ৩ মাস সময় লাগে, আবার কোন কোন জাতের ছয় মাস পর্যন্ত সময় লাগে। (চিত্র নং ৮২)

ঋতুভেদে পশ্চিমবঙ্গে তিন শ্রেণীর ধানের চাষ হয়, যথা—আউশ, আমন ও বোরো। প্রত্যেক শ্রেণীতে আবার জমির প্রকারভেদে বিভিন্ন জাত আছে। চাউল মোটা, সরু বা সুগন্ধিযুক্ত হইতে পারে। নিম্নে প্রধান জাতগুলির বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

চিত্র নং ৮২। ধানগাছ ও তাহার অংশ

1. বয়ঃপ্রাপ্ত ধানগাছ 2. মূলসহ উদ্ভিদের নিম্নাংশ

3. বীজসহ ধানের ছড়া। [H. R. ARAKERI মহাশয়ের সৌজন্যে]

আউশ

১। **ভুলার**—উঁচু জমিতে বোনা এবং নীচু জমিতে রোয়া চলে। বোনা অবস্থায় ৭৫-৮০ দিনে এবং রোয়া অবস্থায় ১০৫-১১০ দিনে পাকে। একর প্রতি ফলন বোনা অবস্থায় ২০ মণ এবং রোয়া অবস্থায় ৩৫-৪০ মণ।

২। **চার্নক**—৯৫-১০০ দিনে পাকে। একর প্রতি ফলন ২১-২৫ মণ। বোনা ও রোয়া দুই-ই চলে।

৩। **ধাইয়াল**—৯০-৯৫ দিনে পাকে। বোনা ও রোয়া দুই-ই চলে। একর প্রতি ফলন ২০-২৫ মণ।

৪। **আশকাটা**—কেবল রোয়া চলে। রোপণের ৬০ দিন পরে ফুল আসে। একর প্রতি ফলন ২৫-৩০ মণ।

আমন

১। **বাদকলমকাটি-৬৫**—জলদি জাত, রোপণের ১১০-১১৫ দিনে পাকে ; ফলন ২৫-২৬ মণ।

২। **চুর্ণকাটি**—জলদি জাত, রোপণের ১১৫-১২০ দিনে পাকে; ফলন ২৭-৩০ মণ।

৩। **রূপশাল**—রোপণের ১২৭-১৩৫ দিনে পাকে; ফলন ২৫-৩০ মণ।

৪। **ঝিঙাশাল**—রোপণের ১৩০-১৩৫ দিনে পাকে; ফলন ২৫-২৮ মণ।

৫। **নাগরা**—৪১/১৪—রোপণের ১২৫-১৩০ দিনে পাকে; ফলন ৩০-৩২ মণ।

৬। **ভাসামানিক**—রোপণের ১২৫-১৩০ দিনে পাকে; ফলন ৩০-৩৫ মণ।

৭। **কলমা-২২২**—রোপণের ১২৫-১৩০ দিনে পাকে ফলন ৩০-৩২ মণ।

৮। **পাটনাই-২৩**—রোপণের ১২৫-১৩০ দিনে পাকে; ফলন ৩০-৪০ মণ।

৯। **রঘুশাল**—রোপণের ১৪০-১৪৫ দিনে পাকে; ফলন ৩০-৪০ মণ।

১০। **কুমড়াগোড়**—নাবি জাত। রোপণেব ১৫৫-১৬০ দিনে পাকে; ফলন ২৫-৩০ মণ।

১১। **এফ. আর.-৪৩বি** (F. R. 43B)—প্লাবন সহিষ্ণু, ৭ দিন ধরিয়া ৬ ফুট পর্যন্ত জলের তলায় থাকিলেও ক্ষতি হয় না। ফলন ২৫-২৬ মণ।

১২। **এস. আর.-২৬ বি** (S. R. 26B)—লাবণিক মাটি-সহিষ্ণু ফলন ৩০-৩৫ মণ।

বোরো

১। **সি. বি.-১** (C. B-1)—রোপণের ১৪০-১৪৫ দিন পরে পাকে ফলন খুব বেশী। একর প্রতি ৫২ মণ পর্যন্ত ফলন পাওয়া গিয়াছে।

২। **সি. বি.-২** (C. B.-2)—রোপণের ১৪০-১৪৫ দিন পরে পাকে। ফলন একর প্রতি ৪৫ মণ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি ধানের কয়েকটি উন্নত জাত উদ্ভাবিত হইয়াছে; ইহাদের চাষ করিয়া একর প্রতি ৬০-৭৫ মণ পর্যন্ত ধান পাওয়া গিয়াছে।

মাটি ও জলবায়ু

ধান প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই জন্মায়। উষ্ণ তাপমাত্রায় জল পাওয়া গেলে প্রায় সকল শ্রেণীর মাটিতে ধানের ভাল ফলন পাওয়া যায়। বেলে বা এঁটেল, অম্লাত্মক বা ক্ষারধর্মী, হাল্কা বা ভারী যে কোন মাটিতে ধানের চাষ করা চলে। তবে এঁটেল অধঃস্তর বিশিষ্ট দোআঁশ মাটি ধান চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট। উপরিস্তরের মাটি উত্তম জল-নিকাশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন কোন জাত আবার বিশেষ শ্রেণীর মাটি, যেমন লবণাক্ত মাটিতে ভাল হয়। বদ্ধ জল অপেক্ষা প্রবহমান জলে ধানের ফলন ভাল হয়।

উচ্চ আর্দ্রতা ও মোটামুটি উষ্ণ তাপমাত্রা ধানের সর্বাপেক্ষা অনুকূল জলবায়ু। ধানের বৃদ্ধিকালে গড় তাপমাত্রা ৭০° ফা. হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জল পাওয়া গেলে এবং তাপমাত্রা অনুকূল হইলে সারা বৎসর ধানের চাষ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে ধানের তিনটি প্রধান ঋতু আছে: (১) এপ্রিল-মে হইতে জুলাই-আগস্ট। এ সময় আউশ ধানের চাষ করা হয়। (২) জুন জুলাই হইতে নভেম্বর-ডিসেম্বর। এ সময় আমন ধানের চাষ হয়। (৩) নভেম্বর-ডিসেম্বর হইতে মার্চ-এপ্রিল। এ সময় বোরো ধানের চাষ হয়।

ধান চাষে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। এজন্য ধানের বৃদ্ধিতে জলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেচযুক্ত অঞ্চলে ধারণা আছে যে ধানের জমিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে জল দাঁড়াইয়া থাকা দরকার। প্রধানতঃ আগাছা দমন ও জমির ফাটল বন্ধ রাখিবার জন্য এ ধারণা করা হয়। যদি অন্য কোন উপায়ে আগাছা দমন ও জমির ফাটল বন্ধ করা যায় তবে ধানের জমিতে অপেক্ষাকৃত কম জল থাকিলেও চলিবে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে সাধারণতঃ ৪ দিন অন্তর ২ একর-ইঞ্চি জল প্রয়োগ করিলেই চলে।

পরিচর্যা (Cultural Practices)

বীজ ছড়াইয়া বা যন্ত্রের সাহায্যে লাইনে বপন করিয়া বা চারা রোপণ করিয়া ধান চাষ করা হয়। স্থানীয় জলবায়ু ও জলের সরবরাহ অনুসারে ধানের চাষ বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে তিন শ্রেণীর ধানের চাষ হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর চাষ পদ্ধতি মুখ্যতঃ দুই প্রকার হইতে পারে: যথা, বপন ও রোপণ পদ্ধতি।

আউশ বপন পদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৪ লক্ষ একর জমিতে আউশ ধানের চাষ হয়। দার্জিলিং জেলা বাদে প্রায় সকল জেলাতেই কিছু কিছু আউশ ধানের চাষ হয়। দার্জিলিং জেলায় সামান্য জমিতে মাত্র আউশ ধানের চাষ হয়। উঁচু জমি ও হালকা দোআঁশ মাটি আউশের পক্ষে উৎকৃষ্ট। শীতকালীন বৃষ্টি বা প্রাক মৌসুমী বৃষ্টির সুযোগ লইয়া জমি চাষ করিতে হয় এবং বারংবার লাঙ্গল চালাইয়া আগাছা দমন করিতে হয়। কারণ আগাছা বোনা আউশের প্রধান শত্রু। মে-জুন মাসে বীজ ছড়াইয়া বা যন্ত্রের সাহায্যে (চিত্র নং ৮৩) লাইনে বপন করা হয়। ছড়াইয়া বপন করিলে আগাছা দমন ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে।
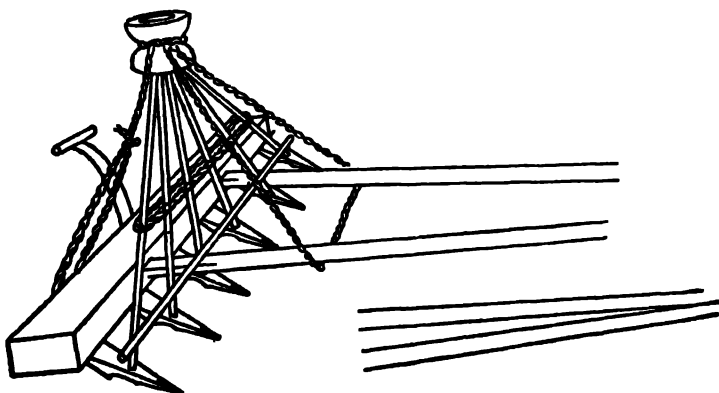
চিত্র নং ৮৩। ধানবপন যন্ত্র (মহীশূর রাজ্য)।

[H. R. ARAKERI মহাশয়ের সৌজন্যে]

লাইনে বপন করিলে একর প্রতি ২০ কেজি বীজ হইলেই চলে। নিড়ান যন্ত্র ও খুরপির সাহায্যে আগাছা দমন করা হয়। বপনের ১০ দিন পরে বিদা চালাইয়া মই দেওয়া হয়। বীজ বপনের পরে বৃষ্টি হইলে প্রথমে মই চালাইয়া পরে বিদা চালাইতে হয়। বৃষ্টির জন্য জমিতে যে আস্তরণের সৃষ্টি হয় তাহা ভাঙিয়া দেওয়া প্রথমে মই চালাইবার উদ্দেশ্য। বিদা ও মই চালাইয়া মাটি আলগা করিয়া দেওয়া হয় এবং গাছের সংখ্যাও হ্রাস করা হয়।

আমন বপন পদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গে বোনা আমনের জমির পরিমাণ খুব বেশী নয়। তিন প্রকার জমিতে আমন বপন পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। (১) যে সব জমিতে অকস্মাৎ জল আসিয়া পড়ে ; (২) যেখানে ৪½ ফুটেরও অধিক জল দাঁড়ায় ও (৩) অল্প বৃষ্টির জন্য যেখানে রোপণ পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় না। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার জমি অতি নীচু এবং শেষোক্ত জমি মাঝারি উঁচু। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার জমিতে ধান এপ্রিল-মে মাসে বপন করিতে হয় যাহাতে জুলাই-আগস্ট মাসে জমিতে জল জমিবার পূর্বেই ধান বড় হইয়া যায়। একর প্রতি ২৮-৩০ কেজি বীজ লাগে। বোনা আমনে আগাছার সমস্যা বিশেষ নাই। একবার হাত নিড়েন দিলেই চলে এবং এ নিড়েনের মুখ্য উদ্দেশ্য গাছের সংখ্যা হ্রাস। বোনা আমন বিলম্বে পাকে। ফসল কাটিবার সময় জমি শুষ্ক থাকে।

আমন রোপণ পদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গে মোট চাষের জমির প্রায় ৭০ ভাগ জমিতে রোয়া আমনের চাষ হয়। বর্ষায় জল দাঁড়ায় এরূপ নিচু এঁটেল মাটি রোয়া আমনের পক্ষে উৎকৃষ্ট। রোয়া আমনের জন্য শুষ্ক পদ্ধতি, অর্ধশুষ্ক পদ্ধতি ও আর্দ্র পদ্ধতিতে চারা তৈয়ারি করা হয়।

শুষ্ক পদ্ধতিতে জমির এক কোণায় প্রথম বৃষ্টির সুযোগ লইয়া বীজ বপন করা হয়। পর্যাপ্ত সার প্রয়োগ করিতে হয়। চারা অনাবৃষ্টি-সহিষ্ণু হয় ; কিন্তু বীজতলায় আগাছার উপদ্রব বেশী হয়।

অর্ধশুষ্ক পদ্ধতিতে বীজতলা তৈয়ারি করিয়া বীজ বপন করা হয়। প্রধানতঃ সেচযুক্ত অঞ্চলে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ইহার সুবিধা এই যে প্রয়োজন অনুসারে চারার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। যদি চারার বৃদ্ধি হ্রাস করিবার প্রয়োজন হয় তবে জল সরবরাহ বন্ধ করা হয়। যদি চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করিবার প্রয়োজন হয় তবে জলের সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয় এবং পর্যাপ্ত জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়। আর্দ্র পদ্ধতিতে তৈয়ারি চারা অপেক্ষা এ পদ্ধতিতে তৈয়ারি চারা অপেক্ষাকৃত অনাবৃষ্টি-সহিষ্ণু বলিয়া মনে করা হয়।

আর্দ্র পদ্ধতিতে (৮৪ নং চিত্র) বীজতলা কাদা করিয়া ও কিছুদূর অন্তর
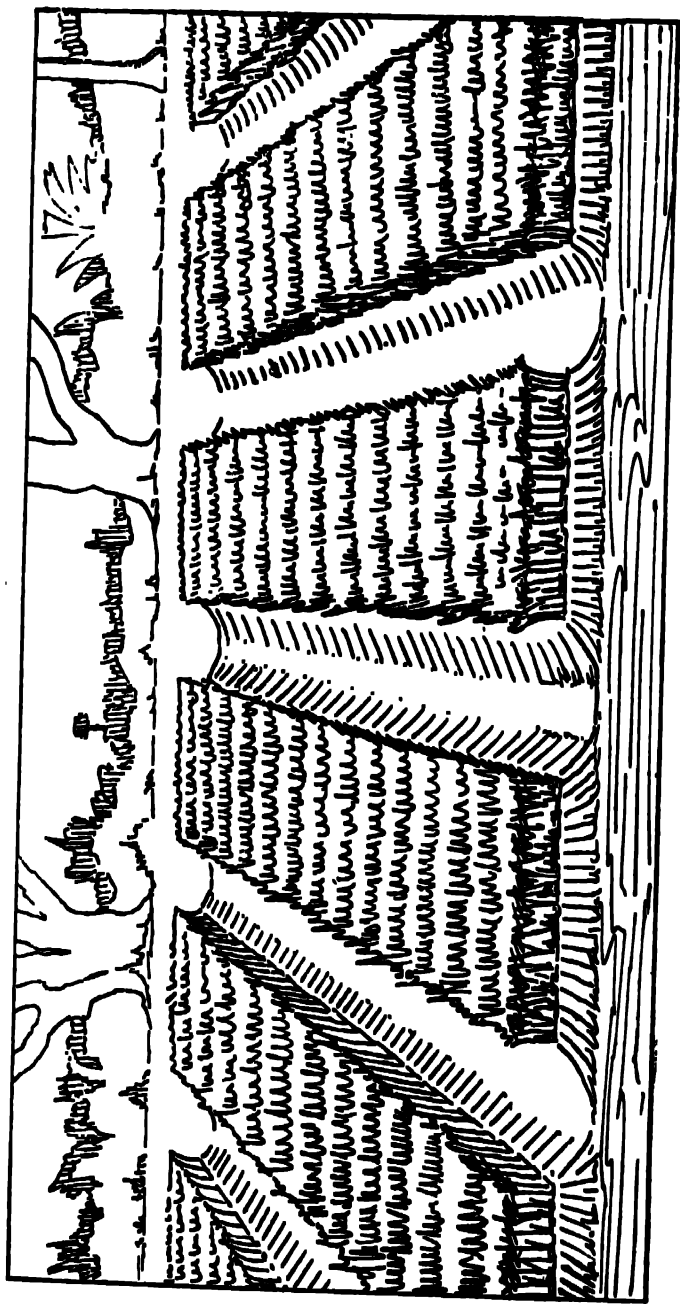
চিত্র নং ৮৪। জমিতে রোপনের জন্য উঁচু বীজতলায় চারা তৈয়ারি।

[H. R. ARAKERI মহাশয়ের সৌজন্যে]

অন্তর নালা রাখিয়া তৈয়ারি করা হয় এবং অঙ্কুরিত বীজ বপন করা হয়। বীজ বপনের পরে জল নিষ্কাশন করিয়া দেওয়া হয়। কয়েকদিন পরে পুনরায় জল প্রয়োগ করা হয়। এক একর জমি রোপণ করিতে ৩০০০ বর্গফুট পরিমাণ বীজতলা আবশ্যক হয়। এজন্য ৯ হইতে ১৮ কেজি বীজ লাগিতে পারে। তবে সযত্নে চারা তৈয়ারি করিলে এবং ঘন রোপণ না করিলে ৯ কেজি বীজই

বীজতলায় বীজ বপনের ৪ হইতে ৬ সপ্তাহ মধ্যে চারা রোপণ করা উচিত। রোপনের জমিতে জানুয়ারী হইতে মার্চের বৃষ্টির সুযোগ লইয়া যতবার সম্ভব লাঙ্গল দেওয়া হয়। জুলাই-এর শেষভাগে কাদান করিয়া চারা রোপণ করা হয়। জমি কাদা অবস্থায় থাকার জন্য চারা রোপণ করিবার সুবিধা হয়। সাধারণতঃ ৯ ইঞ্চি অন্তর সারিতে ৯ ইঞ্চি পর পর ৪টি করিয়া চারা রোপণ করা হয়। অতঃপর জমিতে যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল দাঁড়ায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা হয় এবং ২-১ বার আগাছা অপসারণ করা হয়।

আউশ-রোপণ পদ্ধতি

আউশ রোপণ পদ্ধতি মোটামুটি আমনের মত। আউশ বপন অপেক্ষা রোপণের মুখ্য সুবিধা দুইটি : (১) খরচ কম ও (২) ফলন বেশী হয়। সাধারণতঃ উঁচু ও মাঝারি জমি জুনের পূর্বেই তৈয়ারি করিয়া রাখা হয় যাহাতে জমি জল ধরিয়া রাখিতে পারে। শুষ্ক পদ্ধতিতে চারা তৈয়ারি করা হয়। জুন-জুলাই এর প্রথম বৃষ্টির সুযোগ লইয়া জমি কাদান করিয়া চারা রোপণ করা হয়। সেচের জল থাকিলে জুনের প্রথমেও রোপণ করা চলে।

বোরো

পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশী জমিতে বোরো ধানের চাষ হয় না ; কিন্তু সেচযুক্ত অঞ্চলে ইহার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। বোরো চাষে প্রধানতঃ রোপণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে চারা রোপণ করা হয় এবং মার্চ-মে মাসে ফসল সংগ্রহ করা হয়। যে সব জমি মার্চ মাসে শুকাইয়া যায় অথচ সেচের সুযোগ নাই সে সব জমিতে যত শীঘ্র সম্ভব চারা রোপণ করিতে হয়। প্রায় সকল আউশের জাত বোরো হিসাবে চাষ করা যায়।

সার প্রয়োগ

জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগে ধানের ফলন বাড়ে। একর প্রতি দশ গাড়ী গোবর সার বা কম্পোস্ট প্রয়োগ করিয়া উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। জমিতে সবুজ সারের চাষ করিয়া বা অন্যত্র বর্ধিত গাছের সবুজ অংশ (শাখা ও পাতা) প্রয়োগ করিয়াও সবুজ সার মাটিতে মিশানো যায়। সবুজ সার, গোবর সার বা কম্পোস্ট প্রয়োগ করিবার পরও নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। একর প্রতি ১০০ হইতে ২০০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগ করা উচিত। ফসফেট ঘটিত সার প্রয়োগেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন ও ফসফেট ঘটিত সার পৃথক ভাবে প্রয়োগ অপেক্ষা একত্র প্রয়োগে ফলন বেশী হয়। কোন কোন অঞ্চলে পটাশ ঘটিত সার প্রয়োগেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

কেবল মাত্র মাটি পরীক্ষা করিয়া সার প্রয়োগে যথাযথ ফললাভ সম্ভব। মাটি পরীক্ষা করিয়া যদি দেখা যায় যে মাটিতে নাইট্রোজেন খুবই কম (low) আছে, ফসফোরস মাঝারি (medium), পটাশিয়মও মাঝারি (medium) তবে ধানে একর প্রতি ৪০ পাউণ্ড N, ২০ পাউণ্ড P_2O_5 ও ২০ পাউণ্ড K_2O প্রয়োগ করিবার সুপারিশ করা হয়। N-এর অর্ধেক এবং সম্পূর্ণ P_2O_5 ও K_2O রোপণের পূর্বে প্রয়োগ করিতে হইবে এবং বাকী অর্ধেক N ফুল আসিবার পূর্বে প্রয়োগ করিতে হইবে।

ফসল আহরণ

ধান পাকিলে গাছ গোড়া হইতে কাস্তের সাহায্যে কাটিয়া লওয়া হয়। শুষ্ক হইলে ধান গরুর পা দ্বারা মাড়াইয়া বা কাঠের উপর পিটাইয়া খড় হইতে পৃথক করা হয়। যন্ত্রের সাহায্যেও ধান মাড়াই করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে আমন ধানের গড় ফলন একর প্রতি ২০—২৫ মণ। অনেক ক্ষেত্রে একর প্রতি ৪০—৪৫ মণ ফলনও পাওয়া যায়। রোপণ পদ্ধতিতে আউশেও একর প্রতি ৪০ মণ ফলন পাওয়া যায়। গড় ফলন ১৮—২০ মণ। বোরো ধানের গড় ফলন আমনের প্রায় সমান। ধান সাধারণতঃ খড় ও কাদা দ্বারা তৈয়ারি [illegible] গোলায় সংরক্ষিত হয়। (৮৫ নং চিত্র)

চিত্র নং ৮৫। বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত ধান সাধারণতঃ খড় ও কাদা মিশ্রণে তৈয়ারি গোলায় সংরক্ষণ করা হয়।

[Roy L. DONAHUE মহাশয়ের পুস্তক হইতে পুনর্মুদ্রিত]

জাপানী প্রথা

জাপানী প্রথায় ধান চাষ পদ্ধতিকে সারা ভারতে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই পদ্ধতিতে অধিক ফলনের জন্য সকল প্রকার উন্নত প্রথা তথা চারা তৈয়ারি হইতে ফসল আহরণ পর্যন্ত একত্র প্রয়োগের সুপারিশ করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি এই পদ্ধতিকে উন্নত প্রথায় ধান চাষ বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। এ প্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হইল :

(১) সবুজ সারের চাষ অথবা একর প্রতি দশ গাড়ী গোবর সার বা কম্পোস্ট প্রয়োগ ;

(২) পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব ও রাসায়নিক সার প্রযুক্ত বীজতলায় চারা তৈয়ারি ;

(৩) উচ্চ ফলন ক্ষমতা সম্পন্ন পুষ্ট, ভারী ও অঙ্কুরোদ্গমক্ষম বীজ স্বল্প হারে ব্যবহার ;

(৪) সারিতে রোপণ ;

(৫) হস্ত-চালিত নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে পরিচর্যা ৮৬নং চিত্র) ;

(৬) ধানের ফুল আসিবার পূর্বে যথাযথ মাত্রায় নাইট্রোজেনঘটিত সার ছড়াইয়া প্রয়োগ।

যতটা সম্ভব জমি এই পদ্ধতির আওতায় আনিবার জন্য প্রতি বৎসর সারা ভারতে বিশেষ প্রচেষ্টা চলে

পাট

(*Corchorus capsularis* and *Corchorus olitorius*)

পাট তন্তুকে অনেক সময় 'সোনালী তন্তু' নামে অভিহিত করা হয় ; কারণ উৎকৃষ্ট পাটের রঙ সোনালী। আবার ইহা রপ্তানি করিয়া ভারত যথেষ্ট বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে বলিয়াও ইহাকে সোনালী বিশেষণে ভূষিত করা হয়। কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির ফলে বেশ কয়েক কোটি বিদেশী মুদ্রা আয় হয়।

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পাটের চাষ ভারত ও পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ। ভারতে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষ হয়। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশেও পাট চাষের প্রচলন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১১ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হয়।
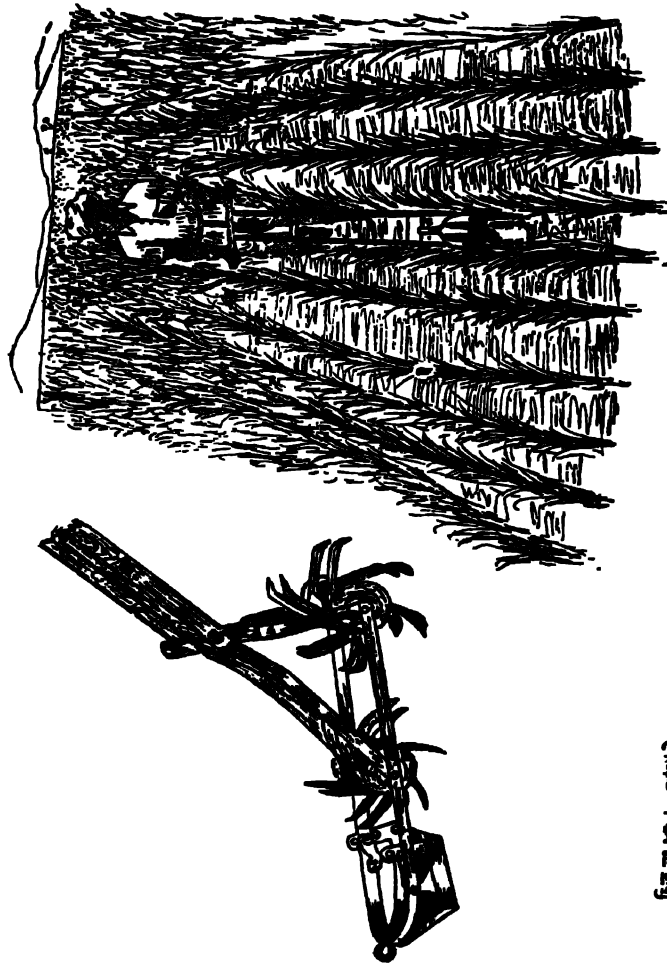
চিত্র নং ৮৩। জাপানী প্রথায় ধান চাষে ধান সারিতে রোপণ করা হয়। জমিতে উচ্চহারে সার প্রয়োগ করা হয় এবং বামে প্রদর্শিত নিড়ান যন্ত্রের সাহায্যে পরিচর্যা করা হয়।

[Roy L. DONAHUE মহাশয়ের পুস্তক হইতে পুনরঙ্কিত]

জলবায়ু

পাটের জন্ম উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু দরকার এবং সমুদ্র-সমতা হইতে ২০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ ভূমিতে জন্মায়। পাট চাষের অধিকাংশ জমি সমুদ্র-সমতায় অবস্থিত। যে সকল অঞ্চলে পাটের চাষ হয়, সে সকল অঞ্চলে বার্ষিক ৫০ হইতে ৭০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এবং বেশীর ভাগ বৃষ্টি মার্চ হইতে নভেম্বরে সংগঠিত হয়। পাঠ চাষের সময় তাপমাত্রা সাধারণতঃ ৮৩° ফা.-এর অধিক থাকে এবং শীতকালে ৬৮ হইতে ৭৫° ফা. পর্যন্ত থাকে। পাট নদী প্লাবন সহ্য করিতে পারে।

মাটি

গভীর, উর্বর, ও পলি মাটিতে পাটের চাষ হয। অবশ্য শিলাকীর্ণ ও ও ল্যাটেরাইট মাটি ছাড়া যে কোন প্রকার মোটামুটি ভাল মাটিতে পাটের চাষ করা চলে। কোন কোন জাত লবণাক্ত মাটিতেও জন্মানো যায়।

জাত

পাট দুই শ্রেণীর: (ক) তিতা পাট (*Corchorus capsularis*) ও (খ) মিঠা পাঠ (*Corchorus olitorius*)। তিতা পাটের জমির পরিমাণ মিঠা পাঠ অপেক্ষা বেশী, কারণ তিতা পাট বিভিন্ন অবস্থা সহ্য করিতে পারে ও ইহার ফলন বেশী। কিন্তু মিঠা পাটের তন্তু অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। পশ্চিম-বঙ্গে চাষের জন্য উপযোগী বিভিন্ন জাত-তিতাপাট: ডি ১৫৪, জে-আর-সি ২১২, জে-আর-সি ৩২১। মিঠা পাট: জে-আর-ও ৬৩২, জে-আর-ও ৭৫৩। পশ্চিমবঙ্গে তিতা পাট অপেক্ষা মিঠা পাটের জমির পরিমাণ বেশী।

শস্য পর্যায়

একই জমিতে বৎসরের পর বৎসর পাটের চাষ করা উচিত নয়। যে সকল জমি প্লাবিত হয় না তাহাতে পাটের সহিত শস্যপর্যায় অনুসারে ধান,

গম, বই, যব, আলু, তামাক বা ডাল শস্যের চাষ করা যায়। যে সকল নীচু জমি প্লাবিত হইয়া যায় তাহাতে পাটের সহিত পর্যায়ক্রমে কেবল ধানের চাষ করা যায়।

পরিচর্যা

যে সকল জমি প্লাবিত হয় সর্বপ্রথমে সে সকল জমি তৈয়ারি করিয়া বীজ বপন করিতে হইবে। প্রাক-মৌসুমী বৃষ্টির সুযোগ লইয়া সোজা ও আড়া-আড়িভাবে বেশ কয়েকবার লাঙ্গল চালাইয়া জমি তৈয়ারি করিতে হয়। মাটি উত্তমরূপে গুঁড়া করিতে হয় এবং আগাছা সংগ্রহ করিয়া পুড়াইয়া ফেলা উচিত। জমি তৈয়ারির সময় পলি, নদীর কাদা বা ৭৫ হইতে ১০০ মণ গোবর সার বা কম্পোস্ট মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। মার্চ হইতে জুন পর্যন্ত বীজবপন করা চলে। ছড়াইয়া বা যন্ত্রের সাহায্যে ৯ ইঞ্চি পর পর সারিতে বীজ বপন করা হয়। একর প্রতি ৯ হইতে ১০ পাউণ্ড বীজ লাগে। যন্ত্রে বপন করিলে বীজের হার কম লাগে। ছড়াইয়া বপন করিলে পরে নিড়েন দেওয়ার সময় গাছের সংখ্যা হ্রাস করা হয়। সাধারণতঃ ১ সপ্তাহ অন্তর নিড়েন দেওয়া হয়। লাইনে বপন করিলে চাকা বিদা যন্ত্র (wheel hoe) ব্যবহার করা যায় এবং তাহাতে শ্রমিক ব্যয় অনেক হ্রাস পায়। গাছের দূরত্ব ৯ ইঞ্চি পর পর সারিতে ৪ ইঞ্চি হওয়া বাঞ্ছনীয়। চারি হইতে সাড়ে চারি মাসে ফসল কাটিবার সময় হয়। মার্চে বপন করা ফসল জুলাই মাসে কাটা হয় এবং পরে বপন করা ফসল কাটা অক্টোবর পর্যন্ত চলে।

ফসল কাটার সময়ের উপর তন্তুর উৎকর্ষ নির্ভর করে। এজন্য আংশিক-ভাবে ফল ধরিবার পর পাট কাটার উত্তম সময়। কাস্তের সাহায্যে একেবারে গোড়ায় পাট কাটা হয়। যেখানে অনেক জল জমিয়া যায় মানুষ ডুব দিয়া পাট কাটে। কোন কোন অঞ্চলে পাট উপড়াইয়াও তোলা হয়।

পাটের ফলন বাড়াইতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। একর প্রতি ৬০ পাউণ্ড মিউরিএট অব পটাশ, ১২৫ পাউণ্ড সুপার ফসফেট ও ৩০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট জমি তৈয়ারির সময় প্রয়োগে উত্তম ফলন পাওয়া যায়। বপনের ৫-৬ সপ্তাহ পরে ৯০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট ছড়াইয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

তন্তু সংগ্রহ

তন্তু সংগ্রহকে চারিটি প্রক্রিয়ায় বিভক্ত করা যায়: পাট পচানো, আঁশ ছাড়ানো, আঁশ ধোওয়া ও শুকানো। পাট কাটিয়া পাতা ঝরিয়া যাওয়ার জন্য ২-৪ দিন জমিতে রাখিয়া দেওয়া হয়। পরে ছোট ছোট আঁটি (৮-৯ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট) করিয়া নদী, খাল বা পুকুরে ডুবাইয়া রাখা হয়। আঁটিগুলির খড় তালপাতা ইত্যাদি ছড়াইয়া কাঠের গুঁড়ি, পাথর, কলাগাছ প্রভৃতি চাপাইয়া পাট জলে ডুবানো হয়। পাট পচানোর জন্য স্রোতবান জল অপেক্ষ স্থির জল অপেক্ষাকৃত শ্রেয়। পাটের রঙ ও পরিচ্ছন্নতা পচাইবার জলের উপর নির্ভর করে। উষ্ণ আবহাওয়ায় ১০ দিনে এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ২৫ দিনে পচন সম্পূর্ণ হয়।

অতঃপর সযত্নে আঁশ ছাড়াইতে হইবে। কোমর জলে দাঁড়াইয়া পাটের গোড়ার দিকে একটি কাঠের হাতুড়ির সাহায্যে পিটাইয়া আঁশ আলগা করিতে হয় এবং টানিয়া ও ঝাঁকাইয়া আঁশ কাটি হইতে পৃথক করা হয়। পাট জলে উত্তমরূপে ধুইয়া বাঁশের দাঁড়ে ২-৩ দিন শুকানো হয়। সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইবার পর গাঁইট বাঁধিয়া বাজারে পাঠানো হয়।

(***Salanum tnberosum***)

আলু একটি উৎকৃষ্ট সবজি এবং ইহার ফলনও যথেষ্ট। ইহা স্টার্চে সমৃদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে একরপ্রতি গড় ফলন ১২০ হইতে ১৫০ মণ।

পরিচর্যা

বারংবার লাঙ্গল ও মই চালাইয়া প্রায় ৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া মাটি উত্তমরূপে তৈয়ারি করিতে হয়। মাটি ঝুরঝুরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। জমি তৈয়ারি করিবার সময় একর প্রতি ১০ গাড়ী গোবর সার বা কম্পোস্ট মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

আলু বপণ পদ্ধতি অঞ্চল-বিশেষে বিভিন্ন প্রকার। যে সকল অঞ্চলে

বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া আলু চাষ করা হয়, সে সকল অঞ্চলে দেশী লাঙ্গল দ্বারা নালা কাটিয়া আলু বপন করা হয়। অতঃপর মই চালাইয়া বীজ আলু মাটি দ্বারা আবৃত করা হয়। নদী উপত্যকা অঞ্চলে নালার মধ্যে সার প্রয়োগ করিয়া আলু বপন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে শেষোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বীজের দূরত্ব নালার মধ্যে ৮-৯ ইঞ্চি এবং এক নালা হইতে অপর নালার দূরত্ব ১৮ ইঞ্চি হওয়া উচিত। একর প্রতি ১০০০ হইতে ১৫০০ পাউণ্ড বীজ আলু লাগে। বপনের সময়ও অঞ্চল বিশেষে পৃথক হয় (৮৭ নং চিত্র)। পশ্চিমবঙ্গে সমতলভূমিতে সাধারণতঃ অক্টোবর নভেম্বরে আলু বপন করা হয়।

আগাছা দমন, গাছের গোড়ায় মাটি তুলিয়া দেওয়া ও সার প্রয়োগ পরবর্তী পরিচর্যার অন্তর্ভুক্ত। বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া যে সকল অঞ্চলে চাষ হয়, সাধারণতঃ বলদটানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিচর্যা করা হয়। সেচযুক্ত অঞ্চলে হস্তচালিত নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে আগাছা দমন করা হয়। একর প্রতি ৪০০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ন সালফেট, ৪০০ পাউণ্ড সুপার ফসফেট ও ২০০ পাউণ্ড মিউরিয়েট অব পটাশ প্রয়োগে উত্তম সাড়া পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে আলুর জন্য সুষম মিশ্র সার পাওয়া যায়। অনেক প্রগতিশীল কৃষক এই মিশ্র সার একর প্রতি ২০ হইতে ২৫ মণ পর্যন্ত প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই সার দুইবারে প্রয়োগ করা উচিত। বীজ বপনের পূর্বে এবং আর একবার মাটি তুলিয়া দেওয়ার পূর্বে প্রয়োগ করা উচিত।

আলুতে সেচ প্রয়োগে যথেষ্ট যত্ন লওয়া উচিত। মাটিতে আর্দ্রতা থাকিলে অঙ্কুরোদ্গমের পূর্বে সেচ প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। অন্যথা বপনের অব্যবহিত পরে একবার এবং চার-পাঁচ দিন পরে আর একবার সেচ প্রয়োগ করিতে হইবে। তৃতীয় সেচ অঙ্কুরোদ্গমের পরে প্রয়োগ করিতে হইবে এবং বৃষ্টি না হইলে অতঃপর ৮-১০ দিন অন্তর অন্তর নিয়মিত সেচ প্রয়োগ করা দরকার।

জাত

পশ্চিমবঙ্গে অল্প কয়েকটি জাতের চাষ হয়। আবহাওয়া ও মৃত্তিকার উপর জাত নির্বাচন নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত লাল গোল, ম্যাগনাম বোনাম, আপ-টু-ডেট ও রয়াল কিডনি জাতের চাষ হয়। লাল গোল জাতে ভাইরাস রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হওয়ায় সম্প্রতি এ জাতের চাষ সুপারিশ

চিত্র নং ৮৭। আলু।

উপরে : শাখা। নীচে বামে : বীজসহ ফল। জননের জন্য বীজ ব্যবহার করা হয় না।
নীচে ডাইনে : স্ফীতকন্দ। অজজ জননে ও খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
[MARTIN and LEONARD মহাশয়দ্বয়ের পুস্তক হইতে পুনরঙ্কিত]

করা হয় না। আলুর রোগমুক্ত সুস্থ বীজ বপন করা উচিত। এজন্য গভর্নমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট বীজেরই চাষ করা বাঞ্ছনীয়।

টোম্যাটো

(*Lycopersicum esculentum*)

টোম্যাটো খুবই পুষ্টিকর। ইহা ভিটামিন এ, বি ও সি-তে সমৃদ্ধ এবং কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায়ই খাওয়া যায়। অনেক অঞ্চলে ইহাকে বিলাতি বেগুন বলা হয়।

পরিচর্যা

৭-৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া বারংবার লাঙ্গল চালাইয়া টোম্যাটোর জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হয়। প্রায় ১০-২০ গাড়ী গোবর সার বা কম্পোস্ট একর প্রতি ছড়াইয়া জমি তৈয়ারির সময় মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। রোপণের প্রায় ৪ হইতে ৬ সপ্তাহ পূর্বে উঁচু বীজতলায় বীজ বপন করা হয়। এক একর জমির জন্য চারা তৈয়ারি করিতে ১২ হইতে ১৬ আউন্স বীজ লাগিবে। চারা তৈয়ারির জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বীজ বপন করা হয়। উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে মার্চ হইতে মে মাস হইল বীজ বপনের যথাযথ সময়। উত্তর ভারতের সমতল ভূমিতে জুন হইতে নভেম্বরে বীজ বপন করা যায়। দক্ষিণ ভারতে সারা বৎসর টোম্যাটোর চাষ করা যায়। অবশ্য জুন ও জুলাই মাসই সবচাইতে উপযোগী।

জমিতে রোপণ করিবার পূর্বে মই চালাইয়া জমি সমতল করিতে হইবে এবং উভয় দিকে ৩ ফুট দূরে দূরে রোপণের জন্য লাইন টানিতে হইবে এবং যখন মেঘলা থাকে বা অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে এরূপ সময় রোপণ করা বাঞ্ছনীয়। সেচযুক্ত অঞ্চলে ৩ ফুট অন্তর অন্তর নালা (furrows) ও ভেলী (ridges) তৈয়ারি করিতে হয় এবং ভেলীর গাত্রদেশে মাঝামাঝি স্থানে চারা রোপণ করা হয়। বেলে মাটিতে রোপণ স্থানে চারা রোপণের পূর্বে গোবর সার বা কম্পোস্ট প্রয়োগ খুবই ফলপ্রদ। মাটি আলগা করা, আগাছা দমন ও গাছের

সারিতে মাটি তুলিয়া দেওয়া পরবর্তী পরিচর্যার অন্তর্ভুক্ত। একর প্রতি ২০০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট দুইবারে ছড়াইয়া বা গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করা উচিত। প্রথমবার চারা রোপণের এক মাস পরে এবং দ্বিতীয়বার মাটি তুলিয়া দেওয়ার পূর্বে তাহা প্রয়োগ করিতে হয়।

জাত

টোম্যাটোর জাতগুলি অধিকাংশ বিদেশীয়; অবশ্য অনেক রাজ্যে ঐ সকল জাত উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে। বনি বেস্ট (Bonny Best), বেস্ট অফ অল (Best of all), বৃহৎ লাল (Large Red), মারগ্লোব (Marglobe), পণ্ডেরোসা (Ponderosa) ও অক্সহার্ট (Oxheart) হইল কয়েকটি উৎকৃষ্ট জাতের নাম।

সংক্ষিপ্তসার

ধান অর্ধ-জলজ (semi-aquatic) হইলেও আর্দ্র আবহাওয়ায় বৃষ্টির জলেও ইহার চাষ করা যায়। প্রবাহমান জলে ইহার বৃদ্ধি ভাল হয়। ধান চাষের দুইটি প্রধান ঋতু হইল এপ্রিল-মে হইতে জুলাই-আগস্ট ও জুন-জুলাই হইতে নভেম্বর-ডিসেম্বর। কখনও কখনও নভেম্বর-ডিসেম্বর হইতে মার্চ-এপ্রিলেও বোরো ধানের চাষ করা হয়। রোপণ ও বপন এ দুই পদ্ধতিতে ধানের চাষ হয়। বপন অপেক্ষা রোপণে ফলন অধিক হয় আবার বপনের মধ্যে বীজ ছড়ানো অপেক্ষা সারিতে বপনে ফলন অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী হয়। সাম্প্রতিক কালে ধানে রাসায়নিক সার প্রয়োগ যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। পূর্বে কেবলমাত্র গোবর সার প্রয়োগ করা হইত। সম্প্রতি সবুজ সারের চাষও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। নাইট্রোজেন ঘটিত সার ছাড়াও ফসফেট ও পটাশঘটিত সার প্রয়োগেও ধানে উপকার পাওয়া যায়। সার সম্পর্কে যথাযথ সুপারিশ করিবার পূর্বে অবশ্যই মৃত্তিকা পরীক্ষা করা উচিত। জাপানী প্রথায় ধানের চাষকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর বিশেষ অভিযান চালানো হয়। ধানের বহু জাত আছে।

প্রচুর বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে পাটের চাষ হয়। বীজ বপনের পূর্বে জমি উত্তমরূপে তৈয়ারি করিয়া জৈব সার প্রয়োগ করা হয়। স্থির জলে পচাইয়া আঁশ সংগ্রহ করা হয়। একর প্রতি ১২০০ হইতে ১৬০০ পাউণ্ড পর্যন্ত আঁশ উৎপন্ন হয়।

আলুর ফলন খুব বেশী। মাটি খুব ঝুরো করিয়া উত্তমরূপে সার প্রয়োগ করিয়া আলু চাষ করা হয়। একর প্রতি ১০০ হইতে ১৫০ মণ ফলন হয়।

টোম্যাটো একটি পুষ্টিকর সবজি। ৩ ফুট অন্তর অন্তর সারিতে ৩ ফুট দূরে দূরে চারা রোপণ করিতে হয়। একর প্রতি ২০০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

প্রশ্ন

(১) ধানের চাষ পদ্ধতি কোন্ কোন্ কারণের উপর নির্ভর করে?

(২) জাপানী প্রথায় ধান চাষ কি? তোমাদের অঞ্চলের চাষ পদ্ধতি হইতে ইহার পার্থক্য কি?

(৩) তোমাদের অঞ্চলে ধানে কি কি রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়? ইহাদের কি ভাবে প্রয়োগ করা হয়?

(৪) কি প্রকার মাটিতে পাটের চাষ করা হয়?

(৫) পাটের আঁশ কি ভাবে ছাড়ানো হয়?

(৬) আলু চাষে কখন সেচ প্রয়োগ করিতে হয়?

(৭) টোম্যাটো চাষের বৈশিষ্ট্য কি?

একাদশ অধ্যায়

গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব ও কয়েকটি প্রজাতির বিবরণ

গরু ও মহিষ ঘাস খায় এবং ইহাদের বলা হয় রোমন্থনকারী পশু। বহুকাল পূর্বে মধ্য এশিয়া বা আফ্রিকা ইহাদের উৎপত্তি স্থল বলিয়া মনে করা হয়। আমাদের আর্য পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের সঙ্গে ইহাদের ভারতে লইয়া আসেন।

ভারত, মালয়, ফিলিপাইন ও আফ্রিকায় যে মহিষ দেখা যায় ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় তাহাদের পাওয়া যায় না। ভারতের গরুও ইউরোপীয় গরু হইতে পৃথক। ভারতের গরুর একটি বেশ বড় ককুদ থাকে, ইহাদের গলকম্বল বেশ বড় হয় এবং গলার স্বরেরও পার্থক্য আছে। আমেরিকার মহিষগুলি আসলে বাইসন (Bison)।

গরু, মহিষ ও বাইসন সকলেই বৃহৎ রোমন্থনকারী পশু; সাধারণতঃ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পশুর শিং থাকে। ইহাদের মুখ চওড়া, আর্দ্র ও অনাবৃত; নাসারন্ধ্র পার্শ্ববর্তী, ককুদ ও গলকম্বল বৃহৎ এবং পুচ্ছ সহ একটি লম্বা লেজ থাকে। ইউরোপে ভারতীয় ককুদ বিশিষ্ট গো জাতিকে 'জেবু' (Zebu) নামে অভিহিত করা হয়। গরুর শিঙ চোঙার ন্যায়; মহিষে ইহা চ্যাপ্টা এবং প্রস্থচ্ছেদে ত্রিকোণাকার। রোমন্থনকারী পশু চিবাইয়া খায় এবং ইহাদের উপরের চোয়ালে কোন দাঁত থাকে না; পরিবর্তে শক্ত গদির মত একটি অংশ থাকে (৮৮নং চিত্র)।

পুরাকালে গো-মহিষাদি সভ্যতার একটি অঙ্গ ছিল। গৃহপালিত পশুর সংখ্যায় মানুষের সম্পদের বিচার করা হইত। গরু মানুষের মধ্যে লেনদেনের মাধ্যম ছিল; এখনও কোন কোন উপজাতিতে এরূপ প্রচলন দৃষ্ট হয়। প্রাচীন গ্রীসে ধাতব মুদ্রা প্রচলনের পর গরু যে পূর্বে লেনদেনের মাধ্যম ছিল তাহা স্মরণ রাখিবার জন্য মুদ্রার উপরে গরুর ছাপ অঙ্কন করিয়া দেওয়া হয়।

চিত্র নং ৮৮। গাভী দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।[A. C. AGGARWALA মহাশয়ের সৌজন্যে]।

ভারতের গরু ও মহিষের প্রধান প্রজাতিসমূহ হইল :

গরু

দুগ্ধবতী প্রজাতি। মণ্টগোমারি (শাহীওয়াল) ; সিন্ধি, গির।

কর্মঠ প্রজাতি। হারিয়ানা-হিসার ; ধন্নী ; ভাগনারি ; দজল ; কঙ্কি ; নাগাউরি ; অমৃতমহল ; খিলারী ; কৃষ্ণা ভ্যালী।

উভয় উদ্দেশ্যসাধক প্রজাতি। থারপার্কার ; কাংক্রেজ ; হারিয়ানা ; নেলোর (ওঙ্গোল) ; দিওনি।

মহিষ

মুরা (দিল্লী) ; জাফরাবাদি ; সুরাটি ; নীলি-রবি ; নাগপুরী।

ভারতে গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব

ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক তাহাদের জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। গো-মহিষাদি আমাদের কৃষির মেরুদণ্ড স্বরূপ। ভারতে কৃষি, বলদ ও গাভীর উপর এতই নির্ভরশীল যে খামারের কোন কাজ ইহাদের ব্যতিরেকে হওয়ার নয়। মালপত্র পরিবহণ ও কর্ষণের জন্য গরু ও মহিষ অপরিহার্য। ভারতের কোটি কোটি অধিবাসীর সর্বোৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক খাদ্য দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য গরু ও মহিষ গাভী সরবরাহ করে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবাসী গোজাতির উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছিল। 'ষাঁড় পৃথিবীকে পালন করে' এই প্রবচনের ভিতর দিয়া একটি অতি গুরুতর সত্য প্রকাশ পাইয়াছে। গাভীর গুরুত্বও কম নয় ; কারণ ইহা দুগ্ধ, ষাঁড় ও বলদ উৎপাদন করে। আধুনিক কৃষিতে যন্ত্রপাতির গুরুত্ব যতই হউক না কেন, আমাদের জাতীয় অর্থনীতি ও সমৃদ্ধিতে আগামী আরও বহু বৎসর ধরিয়া গোজাতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

ভারতে গোজাতির তিনটি শ্রেণী দেখা যায় : ককুদ বিশিষ্ট গরু বা জেবু, মহিষ ও চমরী গরু (yak)। প্রথম শ্রেণী সমতল ও অত্যল্প উচ্চ অঞ্চলে দেখা যায়। কিন্তু চমরী গরু কেবল অতি শীতপ্রধান উচ্চভূমিতে দেখা যায়।

সাম্প্রতিক (১৯৫৬) গৃহপালিত পশু গণনায় দেখা যায় ভারতে মোট ২০ কোটি ৩৬ লক্ষ গরু ও মহিষ আছে ; তন্মধ্যে ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ হইল

মহিষ ও ১৫ কোটি ৮৭ লক্ষ হইল গরু। এই সংখ্যা পৃথিবীর মোট গো-মহিষের সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। পৃথিবীর যে কোন দেশ অপেক্ষা ভারতে গরু ও মহিষ বেশী আছে, কিন্তু আমাদের এই গো-সম্পদ উন্নত নয়, ফলে ইহাদের নিকট হইতে আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যায় না। ইহা সর্বজনবিদিত যে আমাদের গো-সম্পদ ক্রম-অবনতির পথে চলিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশসমূহের গো-মহিষাদি অপেক্ষা ইহারা আকারে ছোট এবং দুধ কম দেয়। কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে একটি উত্তম গাভী হইতে দৈনিক ৮০ পাউণ্ড পর্যন্ত দুধ পাওয়া যায়। আমাদের দুগ্ধবতী গাভীর শতকরা ৯৪ ভাগেরও অধিক দিনে দুই পাউণ্ডের কম দুধ দেয়; ১ জোড়া বলদ মাত্র ১০ একর জমি চাষ করিতে পারে। উৎকৃষ্ট পশুখাদ্যের অভাব, অপরিকল্পিত জনন, চারণ ভূমির অভাব, উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের অভাব ও রোগ দমনের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার অভাব আমাদের দেশের গো-সম্পদের নিকৃষ্টতার কারণ। যদিও আমাদের দেশের গো-মহিষাদি আশানুরূপ উৎপাদনে সক্ষম, যথাযথ খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবে তাহা সম্ভব হয় না।

যেখানে দৈনিক মাথাপিছু দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য খাওয়ার পরিমাণ কানাডায় ৫৭ আউন্স, নিউজিল্যাণ্ডে ৫৬ আউন্স, সুইজারল্যাণ্ডে ৪৯ আউন্স, অষ্ট্রেলিয়ায় ৪৫ আউন্স, গ্রেট ব্রিটেনে ৪১ আউন্স, যুক্তরাষ্ট্রে ৩৫ আউন্স, সেখানে ভারতে মাত্র ৫ আউন্স খাওয়া হয়। একজন ব্যক্তির দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের দৈনিক ন্যূনতম চাহিদা হইল ১৫ আউন্স; কিন্তু ৪০ আউন্স খাইতে পারিলে ভাল।

গো-মহিষাদির কোন উন্নয়ন দ্রুত সম্ভব নয় এবং ইহাতে যথেষ্ট সময় লাগে। কিন্তু ভারতের গো-উন্নয়ন প্রচেষ্টা মোটেই সন্তোষজনক নয়। ইহার গতি এতই শ্লথ যে যেটুকু উন্নতি হইয়াছে তাহাও চোখে পড়ে না। গো-মহিষাদির শতকরা ২০ হইতে ৩০ ভাগ বংশপরিচয়হীন ও জীর্ণ, পালনের অনুপযুক্ত এবং লোকসানজনক। ইহাদের মাধ্যমে দেশের সম্পদের অপচয় হইতেছে। দেশে যে পরিমাণ ঘাস ও দানা জাতীয় পশুখাদ্য পাওয়া যায় তাহা দেশের অর্ধেকসংখ্যক পশুর পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়। পালনের অনুপযোগী পশুগুলি যে খাদ্য খায় তাহা পালনোপযোগী পশুর খাওয়া উচিত। মোট ফল হইল এই যে আমাদের গাভী, ষাঁড় ও বলদ অর্ধভুক্ত থাকে, ফলে

অপুষ্টিতে ভুগে। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য না পাওয়ার ফলে পশুদের বৃদ্ধির গতি শ্লথ হইয়া পড়ে, অন্যান্য দেশের পশু অপেক্ষা পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, দুইবার প্রসবের মধ্যবর্তী সময় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয় এবং সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

গো-মহিষাদির অধিকাংশ মালিক আধুনিক প্রথায় জনন, খাওয়ানো, যত্ন ও পরিচর্যায় ওয়াকিবহাল নয়, ফলে অর্ধভুক্ত গো-মহিষকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা হয়। এজন্য আমাদের দেশের গো-মহিষ সর্বসময় অশক্ত ও দুর্বল অবস্থায় থাকে।

গৃহপালিত পশু হইতে সর্বোচ্চ উৎপাদন লাভ করিতে হইলে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ও অভিজ্ঞতালব্ধ উপায়ে রোগ নিবারণ করিয়া স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখিতে হইবে এবং পর্যাপ্ত খাদ্য দিয়া সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে হইবে।

দুইটি প্রধান বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে :

(১) নিয়মিত যত্ন ও পরিচর্যা করিতে অপারগ হইলে এবং পশু সম্পর্কে আগ্রহান্বিত না হইলে কোন পশু পালন করা উচিত নয় ;

(২) আরামদায়ক অবস্থায় ও সুস্থ এবং সবল রাখিতে অসমর্থ হইলে কোন পশু পালন করা উচিত নয়।

গো-মহিষাদির ভারতীয় প্রজাতি (breed)

ভারতে গো-মহিষাদির সংখ্যা যেমন বেশী, ইহাদের প্রজাতিও অসংখ্য। প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে, এমন কি জেলায় পর্যন্ত ঐ জেলা বা অঞ্চলের নাম অনুসারে প্রজাতি আছে। কোন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত নয় এরূপ গোত্রহীন পশুকে বলা হয় 'দেশী'।

যদিও কোন কোন ভারতীয় প্রজাতি ইউরোপীয় প্রজাতির প্রায় সমকক্ষ, কিন্তু প্রজাতিভুক্ত অধিকাংশ পশুই আকার ও সামর্থ্যে, মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদনে নিকৃষ্ট। নিজস্ব বাসভূমির জলবায়ু, খাদ্য ও মাটি অনুসারে ভারতীয় প্রজাতিগুলির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। যদিও শাহীওয়াল ও সিন্ধি প্রজাতিভুক্ত গরুর গাত্রবর্ণ ঘন লাল, লাল বা ফিকে লাল, অধিকাংশ প্রজাতিভুক্ত গরুর গাত্রবর্ণ ধূসর সাদাটে। বন ও পার্বত্য অঞ্চলের গরুর আকার সাধারণতঃ

ছোট হয় এবং গাত্রবর্ণ সচরাচর কালো বা প্রায় কালো হইতে পিঙ্গল বর্ণ পর্যন্ত হইতে পারে। অনেক পশুর গায়ে আবার একাধিক রঙের ছোপ দেখা যায়। মহিষের গাত্রবর্ণ সাধারণতঃ কালো হয়; কোন কোনটিতে সাদার ছোপ থাকে, কোন কোনটির বর্ণ মৃগশিশুর ন্যায়।

গরুর ভারতীয় প্রজাতি

যদিও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভারতে বহু প্রজাতি আছে, তন্মধ্যে প্রধান তিনটি প্রজাতির বর্ণনা দেওয়া হইল।

শাহীওয়াল। পশ্চিম পাকিস্তানের মন্টগোমারী জেলা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইহা দেখা যায়। ইহা উত্তম দুগ্ধবতী প্রজাতি; কিন্তু ইহাদের বলদ লাঙ্গল বা গাড়ী টানার কাজের বিশেষ উপযোগী নয়। ইহাদের শিঙ ছোট, কিন্তু সুসমঞ্জস, গলা ছোট ও সরু, মুখমণ্ডল লম্বা, কপাল অপ্রশস্ত, পাগুলি হাল্কা ও সুসমঞ্জস, গলকম্বল বৃহৎ এবং লেজ অতিশয় লম্বা ও সরু। ইহা খুব শান্ত।

হিসার বা হারিয়ানা। ইহাদের দক্ষিণ পাঞ্জাবের হিসার, রোহতাক, কর্নাল ও গুরগাঁও জেলা, দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে দেখা যায়। দীর্ঘ শিঙ ও পা বিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পশু হিসার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং ঠুঁটা ও ভোঁতা শিঙবিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত ছোট পশু হারিয়ানা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ইহাদের বলদ খুবই কর্মঠ এবং লাঙ্গল ও গাড়ী টানার পক্ষে খুবই উপযোগী। অনেক হারিয়ানা গাভী প্রচুর দুধ দেয়। হারিয়ানা শ্রেণীকে উভয় উদ্দেশ্য-সাধক প্রজাতিতে উন্নত করা হইয়াছে। সুগঠিত মস্তক, প্রশস্ত কপাল, অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত ও লম্বাটে মুখমণ্ডল, মাঝারি আকারের কর্ণ, লম্বা ও সোজা পা, লম্বা ও চওড়া পৃষ্ঠদেশ, উঁচু নিতম্ব, গোলাকার পাঁজরা, সংক্ষিপ্ত উদর এ প্রজাতির বৈশিষ্ট্য। ইহার গাভীগুলি সহজেই ভীত বা উত্তেজিত হইয়া পড়ে।

সিন্ধি। ইহা ভারতের বিশিষ্ট দুগ্ধবতী প্রজাতি। ইহার আদি বাসস্থান সিন্ধের (পশ্চিম পাকিস্তান) করাচি জেলা, কিন্তু ভারতে এ প্রজাতির বহু উৎকৃষ্ট পশু দেখা যায়। ইহার গাভীগুলি বাধ্য ও শান্ত। সিন্ধি বলদ কাজে

চটপটে না হইলেও অলস নয় এবং স্থিরভাবে কাজ করে। ইহাদের মস্তক ছোট, কপাল চওড়া, চক্ষু সুগঠিত, মুখ চওড়া এবং গলা অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব। ছোট ও মোটা শিঙ, প্রশস্ত ও গভীর কক্ষ, পর্যাপ্ত দূরে অবস্থিত পশ্চাৎ বাঁটদ্বয় এবং দীর্ঘ সরু লেজ এই প্রজাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহাদের গলকম্বল সাধারণত মোটা হয় এবং স্পর্শ করিলে রেশমের মত অনুভূত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

মানুষ যাহা খাইতে পারে না বা হজম করিতে পারে না, এরূপ উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ্জ খাদ্য খাইয়া গো-মহিষাদি বাঁচে। মানুষের অনুপযোগী এসকল খাদ্যকে পশুগুলি মানুষের খাদ্য, যেমন দুধ ও মাংসে রূপান্তরিত করে এবং চামড়া ও কাজের শক্তি ইহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায়।

পশুদের মধ্যে গরু ও মহিষ সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম গৃহপালিত হয়। বহু কাল পূর্বে মধ্য এশিয়া বা আফ্রিকাতে ইহারা উদ্ভূত হয় বলিয়া মনে করা হয়। আমাদের আর্য পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের মূল্যবান সম্পদ হিসাবে ইহাদের ভারতে লইয়া আসে।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং গো-মহিষ কৃষির মেরুদণ্ড স্বরূপ। বলদেরা গাড়ী ও লাঙ্গল টানে এবং গাভীরা ভারতের কোটি কোটি মানুষের দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য যোগান দেয়।

ভারতে গো-মহিষাদিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (১) ককুদ বিশিষ্ট গরু (জেবু); (২) মহিষ, সমতল ও অত্যল্প উচ্চভূমিতে ইহাদের দেখা যায়; (৩) চমরী, অতি উচ্চভূমিতে শীতপ্রধান অঞ্চলে ইহা দেখা যায়। ১৯৫৬ সালের পশুগণনায় দেখা যায় ভারতে ২০ কোটি ৩৬ লক্ষ গো-মহিষ আছে; তন্মধ্যে ১৫ কোটি ৮৭ লক্ষ হইল গরু এবং ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ হইল মহিষ। এ সংখ্যা পৃথিবীর মোট গো-মহিষের এক তৃতীয়াংশ। যে কোন দেশ অপেক্ষা ভারতে গো-মহিষ বেশী আছে; কিন্তু ইহাদের প্রতিপালন লাভজনক নয়। ইহারা দুধ দেয় খুবই কম। ইহাদের ২০ হইতে ৩০ শতাংশ বংশপরিচয় হীন, জীর্ণ ও পালনের অনুপযোগী। আমাদের বলদের কর্ম-ক্ষমতা কম। যেখানে উত্তম ইউরোপীয় গাভী দৈনিক ৮০ পাউণ্ড দুধ দেয়

সেখানে আমাদের দুগ্ধবতী গাভীর শতকরা ১৪ ভাগ দৈনিক ২ পাউণ্ডেরও কম দুধ দেয়।

যে পরিমাণ পশুখাদ্য আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় তাহা অর্ধেক সংখ্যক পশুর পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়। ফলে অপর্যাপ্ত খাদ্য, অপরিণামদর্শী জনন, নিকৃষ্ট আশ্রয় ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে আমাদের গো-সম্পদ দিনে দিনে অবনতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

ভারতে যেমন পশুর সংখ্যাও অধিক তেমনি ইহাদের প্রজাতিও অসংখ্য। অবশ্য গত ৩০ বৎসর ধরিয়া প্রধান গোষ্ঠী বা প্রজাতিগুলিকে চিনিয়া লইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। ভারতে গরুর প্রধান প্রজাতিগুলি হইল: মণ্টগোমারী (শাহীওয়াল), হিসার ও হারিয়ানা, থারপার্কার, সিন্ধি, অমৃতমহল, নেলোর (ওঙ্গোল), নাগাউরী, কাংক্রেজ, গির, কৃষ্ণা ভ্যালী, খিলারী ও দিওনি। মহিষের উল্লেখযোগ্য প্রজাতি সমূহ হইল মুরা (দিল্লী), সুরাটি, জাফরাবাদি, নালি-রবি, নাগপুরী, মেহশনা।

প্রশ্ন

১। ভারতের প্রধান প্রধান দুগ্ধবতী প্রজাতিগুলির নাম লেখ। ইউরোপীয় দুগ্ধবতী প্রজাতির সহিত ইহাদের তুলনামূলক আলোচনা কর।

২। ভারতে উভয় উদ্দেশ্যসাধক প্রজাতি বলিতে কি বুঝায়?

দ্বাদশ অধ্যায়

হাঁস-মুরগী উন্নয়ন ও কয়েকটি প্রজাতির বিবরণ

হাঁস-মুরগী পালন প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভারত ও তৎপার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এখনও বন মুরগী দেখা যায়। এই বন-মুরগী হইতে পৃথিবীর আধুনিক মুরগী প্রজাতি সমূহ উদ্ভূত হইয়াছে। এজন্য ভারত পৃথিবীর মধ্যে প্রধান হাঁস-মুরগী উৎপাদনকারী দেশ বলিলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ভারতে প্রায় ৯ কোটি ৫ লক্ষ গৃহপালিত হাঁস-মুরগী আছে। ডিম, মাংস, পালক, খেলাধূলা (মোরগের লড়াই) প্রভৃতির জন্য এবং অনেক সময় শখ করিয়া মুরগী পোষা হয়।

ভারতের অসংখ্য গ্রামে এই মুরগী-শিল্প ছড়াইয়া আছে। এক একটি পরিবার সাধারণতঃ ৪ হইতে ২০টি মুরগী পালন করিয়া থাকে। মুরগীর সংখ্যা কম হওয়ায়, ইহা হইতে সর্বোচ্চ উৎপাদন পাওয়ার জন্য যতটা নজর দেওয়া দরকার ততটা দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রায় ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে পৃথিবীর হাঁস-মুরগী বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক হাঁস-মুরগী পালন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলিতেছে। হাঁস-মুরগী পালন যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করিয়াছে; সেখানে এক ব্যক্তি ১০০ হইতে ১ লক্ষেরও অধিক সংখ্যক মুরগী পুষিয়া থাকে। আরও অনেক দেশে এ শিল্প দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

সর্বোচ্চ লাভ করিবার জন্য সকল মুরগী উৎপাদক দেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা হয়। ভারতে যদি হাঁস-মুরগী পালনকে কৃষিতে যথাযোগ্য স্থান দিতে হয়, তবে দলে পাখীর সংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নত প্রজাতির সাহায্যে প্রজনন, সুষম খাদ্য প্রদান, সুষ্ঠু পালন ব্যবস্থার প্রচলন, শিকারী প্রাণী ও রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস ও উন্নততর বিপণনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

হাঁস-মুরগী উন্নয়ন

ভারতে মনুষ্য খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি একটি জরুরী সমস্যা ; আবার প্রোটিন, ধাতব পদার্থ ও ভিটামিন যোগ করিয়া সেই খাদ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধিও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। হাঁস-মুরগীর মাংস ও ডিমে ঐ সকল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান থাকে। ভারতের সৌভাগ্য এই যে এদেশে এরূপ প্রচুর পদার্থ পাওয়া যায় যাহা মানুষ খায় না, কিন্তু হাঁস-মুরগীকে খাওয়ানো যায়। হাঁস-মুরগী এসকল খাদ্যকে মনুষ্য উপযোগী খাদ্য, যেমন ডিম ও মাংসে পরিণত করে।

কেহ যদি হাঁস-মুরগী পালনকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিতে চান, সাফল্য লাভ করিতে হইলে তাঁহার নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক।

১) হাঁস-মুরগী পালনে স্বাভাবিক প্রবণতা ও ইচ্ছা।

২) বৎসরে প্রতিদিন কঠিন শ্রমে আগ্রহ।

৩) হাঁস-মুরগীর জন্য গৃহ ও সরঞ্জাম তৈয়ারি ও মেরামতে পটুত্ব।

৪) পরিকল্পনা, ক্রয় ও বিপণনে যথেষ্ট ব্যবসা-বুদ্ধি।

৫) হাঁস-মুরগী উন্নয়নে আধুনিক অগ্রগতির সহিত তাল রাখিতে পারা।

৭) সকল প্রকার ক্ষুদ্র কাজেও নিয়মিত নজর রাখা।

হাঁস-মুরগী পালনের সমস্যা

নূতন ব্যবসা হিসাবে হাঁস-মুরগী পালনকে গ্রহণ করিবার পূর্বে ব্যবসা হেতু যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে সেগুলি বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ হইল :

১) ৫০ হইতে ৫০০০ পাখীর দল পালনে অনেক সময় মূলধনের অভাব দেখা দেয়।

২) আধুনিক মুরগী পালন পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য অনেক সময় পাওয়া যায় না।

৩) প্রজননের জন্য পাখীর স্বল্পতা এবং ডিম ফুটাইবার সীমিত ব্যবস্থার দরুন একই সঙ্গে সকল বয়সের মুরগী শাবক পালন করিতে হয়।

৪) প্রাপ্ত বয়স্ক পাখীর সহিত বা কাছাকাছি শাবক পালন হেতু মৃত্যুহার বৃদ্ধি।

৫) ন্যায়সংগত মূল্যে হাঁস-মুরগীর সুষম খাদ্যের অভাব।

৬) অনেক পাখী পালক ব্যয় হ্রাস ও লাভ বৃদ্ধির জন্য পাখীকে কম খাওয়ায়, কিন্তু ফল হয় ব্যয় বৃদ্ধি ও লভ্যাংশ হ্রাস।

৭) শিকারী পশু হেতু গ্রামে প্রায় অর্ধেক পাখী মারা যাইতে পারে।

৮) কোন কোন রোগ প্রতিরোধকল্পে সময়মত টিকা প্রদান এবং কোন কোন কীটশত্রু ও রোগ দমন হেতু স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন অনেক সময় সম্ভব হয় না।

৯) অনেক সময় চাহিদা ও যোগানের অবস্থা পর্যবেক্ষণ না করিয়াই বিপণন করা হয়।

সমস্যার সমাধান

ভারতে হাঁস-মুরগী পালনে সফলতা লাভে বহু অন্তরায় থাকিলেও, নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করিয়া অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়:

(১) হাঁস-মুরগী পালনের সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া তদনুসারে পাখীর সংখ্যা সীমিত করা উচিত;

(২) হাঁস-মুরগী পালন সম্পর্কে কয়েকটি আধুনিক পুস্তক ক্রয় করা উচিত এবং নিকটস্থ হাঁস-মুরগী উন্নয়ন আধিকারিকের পরামর্শ গ্রহণ করা

(৩) প্রজননের জন্য পাখীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত এবং ডিম ফুটাইবার যন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া বৎসরে একবার বা দুইবার ডিম ফুটানো উচিত;

(৪) হাঁস-মুরগীর পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য সংগ্রহ করা উচিত;

(৫) যাহাতে সর্বোচ্চ লাভ হয়, সেজন্য হাঁস-মুরগীকে অধিকতর সুষম খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করা উচিত।

ভারতে মাথাপিছু বৎসরে মাত্র ৮টি ডিম খাওয়া হয়; কিন্তু অনেক দেশে মাথাপিছু দিনে প্রায় একটি ডিম খাওয়া হয়। গ্রামের লোকের পক্ষে বাজার হইতে ক্রয় করিয়া প্রতিদিন একটি ডিম খাওয়া হয়ত সম্ভব

নয়, কিন্তু হাঁস-মুরগী পালন করিয়া গ্রামবাসী নিজের চাহিদা নিজেই পুরণ করিতে পারে। ফাটা, পাতলা খোসা-বিশিষ্ট বা পাখীর মল লাগা ডিম যেগুলি বাজারে ক্রেতারা পছন্দ করে না সেগুলি নিজে খাইয়া অপেক্ষাকৃত ভাল ডিমগুলি বাজারে বিক্রয় করিতে পারে।

ভারতে অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণী অপেক্ষা হাঁস-মুরগী পালনের কয়েকটি সুবিধা হইল :

(১) জমি কম লাগে ;

(২) মূলধন কম হইলেও চলে ;

(৩) তিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে আয় হইতে আরম্ভ করে ;

(৪) পরিবারের লোকজন তাহাদের অবসর সময়ে খাটিতে পারে ;

(৫) কাঁচা খাদ্যকে মানুষের উপযোগী পুষ্টিকর খাদ্যে পরিণত করিতে হাঁস-মুরগী অতি সুদক্ষ ;

(৬) ভাত-প্রধান খাদ্যকে সুষম করিতে ডিম অতি আদর্শ খাদ্য ;

(৭) ভারতে প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য পদার্থ ও খাদ্য উপজাত আছে যেগুলি হাঁস-মুরগীর খাদ্য তৈয়ারিতে ব্যবহার করা যায় ;

(৮) ভারতে এখন প্রজননের জন্য উন্নত হাঁস-মুরগী পাওয়া যায় ;

(৯) ভারতে হাঁস-মুরগীর ডিম ও মাংসের বাজার দর লাভজনকভাবে হাঁস-মুরগী পালনের পক্ষে সন্তোষজনক।

প্রজাতি ও প্রজনন

(*Gallus domesticus*)

হোয়াইট লেগহর্ন (White Leghorn), রোড আইল্যাণ্ড রেড (Rhode Island Red) ও ব্ল্যাক মিনর্কা (Black Minorca) প্রজাতিগুলির ডিম উৎপাদন সন্তোষজনক এবং ভারতের সকল খামারে ইহারা সুপ্রতিষ্ঠিত (৮৯ নং চিত্র)। দেশী মুরগী উন্নয়নেও ইহাদের ব্যবহার করা হয়। উন্নত প্রজাতির অমিশ্রিত (pure-bred) মোরগ দ্বারা প্রজনন করা উচিত ; ফলে
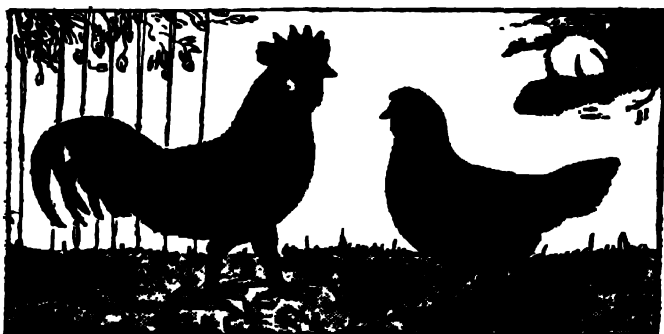
চিত্র নং ৮৯। ডিম উৎপাদক জনপ্রিয় মুরগী প্রজাতি। উপরে : হোয়াইট লেগহর্ণ, মধ্যে রোড আইল্যাণ্ড রেড ; নীচে : ব্ল্যাক মিনর্কা (EARL N. MOORE মহাশয়ের সৌজন্যে)।

ডিমের আকার ও ডিম উৎপাদনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দেশী মুরগী বৎসরে ৫৫টি ডিম দেয়; কিন্তু উন্নত প্রজাতি প্রায় তিনগুণ ডিম দেয় ও ডিমের আকারও দ্বিগুণ হয়।

মুরগী শিল্পের অপর একটি দিক যথা মাংসল মুরগী উৎপাদনে ভারতে এ যাবৎ যথেষ্ট নজর দেওয়া হয় নি; কিন্তু ভবিষ্যতে ইহার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। অপরাপর মুরগী উৎপাদক দেশের ধারা যদি এদেশেও চালু হয় তবে মাংসল শাবক (broilers) উৎপাদন মুরগী শিল্পে অদূর ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিবে। ৮ হইতে ১২ সপ্তাহ বয়সের ২.৫ হইতে ৩.৫ পাউণ্ড ওজন-বিশিষ্ট শাবক বাজারে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করা যায়। নিউ হ্যাম্পশায়ার (New Hampshire), হোয়াইট রক (White Rock) ও হোয়াইট কর্নিশ (White Cornish) এজন্য বিশেষ উপযোগী (৯০ নং চিত্র)। এ সকল প্রজাতির সংকর ও অন্যান্য প্রজাতিও ব্যবহৃত হয় (৯১ নং চিত্র)।

অন্য যে কোন গৃহপালিত প্রাণী অপেক্ষা মাংসল মুরগী শাবক মানুষের অনুপযোগী খাদ্যকে অতি দক্ষতার সহিত মানুষের উপযোগী প্রোটিনে সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্যে পরিণত করে। অন্য কথায় বলা যায়, ১ পাউণ্ড মাংস উৎপাদন করিতে মুরগী অন্য প্রাণী হইতে অপেক্ষাকৃত কম খাদ্য গ্রহণ করে।

হাঁস

(*Anas species*)

মুরগীর পরেই হাঁস-মুরগী শিল্পে হাঁসের স্থান। কেরালা, অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, মাদ্রাজ ও পশ্চিম বঙ্গে হাঁস পালন ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। ভারতের অধিকাংশ হাঁসই ডিম-উৎপাদক শ্রেণীর এবং ইণ্ডিয়ান রানার (Indian Runner) প্রজাতির বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অপর একটি উৎকৃষ্ট ডিম উৎপাদক প্রজাতি হইল খাকি ক্যাম্পবেল (Khaki Campbell); কিন্তু ইহাদের সংখ্যা খুবই কম। কয়েক মাস ডিম দেওয়ার পর ইহাদের মাংসের জন্য বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়।

বড় বড় হাঁস খামারে কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটানো হয়। শাবকের
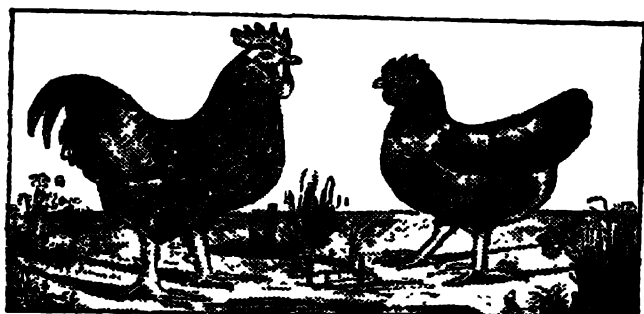
চিত্র নং ১০। মাংস উৎপাদক উৎকৃষ্ট মুরগী প্রজাতি। [উপরে : নিউ হ্যাম্পশায়ার ; মধ্যে : হোয়াইট রক ; নিচে : হোয়াইট কর্নিশ [EARL N. MOORE মহাশয়ের সৌজন্যে]।
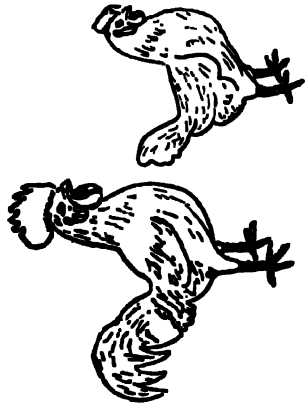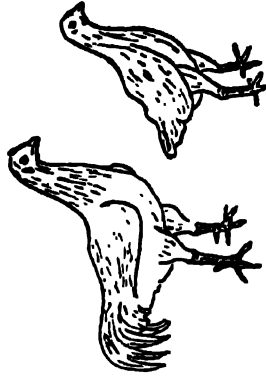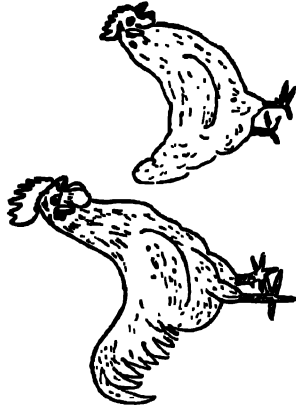
চিত্র নং ৯১। বিভিন্ন শ্রেণীর মুরগী : (ক) ডিম উৎপাদক শ্রেণী উভয় উদ্দেশ্য সাধক শ্রেণী ; (গ) মাংস উৎপাদক শ্রেণী ও (ঘ) মুরগার লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে পালিত শ্রেণী NAIDU মহাশয়ের পুস্তক হইতে পুনরঙ্কিত]।

পাখা গঠিত হইলে তাহারা পুকুর, লেক বা নদীতে চড়িবার উপযুক্ত হয় এবং ঘাস, শামুক, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি খায়। দিনে দুইবার চূর্ণ খাদ্য দিলে শাবকের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং ডিম পাড়িবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

সংক্ষিপ্তসার

যে বন-মুরগী হইতে আধুনিক মুরগী প্রজাতির উদ্ভব ঘটিয়াছে, ভারত ও তৎপার্শ্ববর্তী দেশসমূহ তাহার আদি বাসভূমি। ভারত পৃথিবীর হাঁস-মুরগী উৎপাদক প্রধান দেশগুলির অন্যতম। পৃথিবীর মোট হাঁস-মুরগীর শতকরা ১০ ভাগ এদেশে আছে। গ্রামীন অর্থনীতিতে হাঁস-মুরগী শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধুনিক হাঁস-মুরগী পদ্ধতি আরোপ করা হয় না।

হোয়াইট লেগহর্ন ও রোড আইল্যাণ্ড রেড প্রভৃতি মুরগীর আধুনিক উন্নত প্রজাতি সমূহ বৎসরে ১৫০ হইতে ২৫০ ডিম পাড়ে যদি পর্যাপ্ত খাদ্য দেওয়া হয় এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। দেশী মুরগী বৎসরে গড়ে মাত্র ৫৩টি ডিম দেয়। উন্নত প্রজাতির ডিমের আকারও দেশী মুরগীর ডিম অপেক্ষা দ্বিগুণ। উন্নত প্রজাতি সমূহের সাহায্যে ভারতে দেশী মুরগীর উন্নয়ন দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে ভারতে হাঁস-মুরগী পালন প্রচলিত আছে; কিন্তু ভবিষ্যতে আধুনিক পালন পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। ভারতে হাঁস-মুরগী পালনে কতকগুলি সুবিধা আছে: যেমন জমি কম লাগে; মূলধন কম লাগে; তিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে আয় হইতে আরম্ভ করে; অবসর সময় লাভ-জনক উপায়ে ব্যয় করা যায়; ভাত-প্রধান খাদ্য সুষম করিতে ডিম অতি আদর্শ উপাদান; ১ পাউণ্ড মাংস উৎপাদন করিতে অন্য যে কোন প্রাণী অপেক্ষা কম খাদ্য গ্রহণ করে; প্রজননের জন্য উন্নত পাখীর অভাব নাই; প্রচুর বর্জ্য পদার্থ মুরগীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় এবং ডিম ও মাংসের বাজার দর হাঁস-মুরগী পালনকে লাভজনক করিবার পক্ষে সন্তোষজনক।

প্রশ্ন

১। হাঁস-মুরগী পালনে সাফল্য লাভ করিতে হইলে যে ৭টি ব্যক্তিগত গুণের দরকার তাহাদের উল্লেখ কর।

২। ৯টি কারণের উল্লেখ কর যাহাদের জন্য হাঁস-মুরগী পালন ভারতীয় অবস্থায় উপযোগী বলিয়া মনে করা হয়।

৩। মুরগীর দুইটি উল্লেখযোগ্য ডিম-উৎপাদক প্রজাতি এবং দুইটি মাংসল প্রজাতির নাম লেখ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পশুখাদ্য ফসল

লাভজনকভাবে দুধ, মাখন, ঘি, মাংস ইত্যাদি উৎপাদন করিতে হইলে গৃহপালিত পশুকে সুস্থ ও পুষ্ট রাখা দরকার এবং সেজন্য তাহাদিগকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া আবশ্যক।

পশু খাদ্যের মধ্যে পড়ে সারবান খাদ্য—ইহা প্রোটিন্ ও স্নেহ পদার্থ যোগায়; তণ্ডুল জাতীয় খাদ্য—ইহা প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট যোগায়। ইহা ছাড়া গো-মহিষ প্রচুর পরিমাণে ঘাস জাতীয় খাদ্য, যেমন কাঁচা বা শুষ্ক ঘাস, খড়, ফসলের শুষ্ক ডাঁটা খাইয়া থাকে।

সাধারণ ফসল, সেচযুক্ত ঘাস, সেচযুক্ত শিম্বিগোত্রীয় ফসল ও সাধারণ ঘাসই হইল প্রধান পশুখাদ্য ফসল।

পশুখাদ্য হিসাবে সাধারণ ফসল

ধান, গম, যব, যই, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, মারুয়া প্রভৃতি সাধারণতঃ মানুষের তণ্ডুল খাদ্যের জন্য চাষ করা হয়। এসকল ফসলের উপজাত খড় পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং গ্রামাঞ্চলে ইহাই পশুর প্রধান খাদ্য। কিন্তু ইহার পুষ্টিকারিতা কম। কখনও কখনও কেবলমাত্র পশুখাদ্যের উদ্দেশ্যেই এ সকল ফসলের চাষ করা হয়। সে ক্ষেত্রে ফুল বা দানা গঠিত হইবার পূর্বাবস্থায় কাটিয়া পশুকে খাওয়ানো হয় এবং ইহা যথেষ্ট পুষ্টিকর। অন্য সময় ফসল পাকিবার পর খড় কাটিয়া শুকাইয়া রাখা হয় এবং গ্রীষ্মকালে যখন পশুখাদ্যের অভাব দেখা দেয় তখন ঐ খড় খাওয়ানো হয়। পাকা ফসলের খড়ের পুষ্টিকারিতা কম।

কেবল পশুখাদ্যের জন্য এ সকল ফসলের চাষ করিলে বীজ অপেক্ষাকৃত ঘন করিয়া বপন করা হয় যাহাতে উদ্ভিদের কাণ্ড সরু ও লম্বা হয় এবং পশু

সহজে চিবাইতে পারে। সেচ প্রয়োগে অথবা বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া এ সকল ফসলের চাষ করা হয়।

সেচযুক্ত ঘাস

পশু খামারগুলিতে অনেক সময় সেচ প্রয়োগ করিয়া ঘাস ও শিম্বিগোত্রীয় উদ্ভিদের চাষ করা হয়।

গিনি ঘাস, প্যারা ঘাঁস ও ন্যাপিয়ার ঘাস প্রচুর বৃষ্টি বা সেচ ও পর্যাপ্ত সার সহ্য করিতে পারে। সাধারণতঃ গোশালাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে এ সকল ঘাসের চাষ করা হয় যাহাতে গোশালার ধোয়ানো জল এ সকল ঘাসের জমিতে নালা কাটিয়া লইয়া যাওয়া যায়। ফলে এ সকল ঘাসের ফলন প্রচুর বৃদ্ধি পায় এবং উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর কাঁচা পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এ জাতীয় আরও পুষ্টিকর পশুখাদ্য ফসল আছে: যেমন, সুদান ঘাস, অঞ্জন ইত্যাদি।

গিনি ঘাস

(*Panicum maximum*)

জলসেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর দোয়াঁশ মাটি গিনি ঘাসের পক্ষে উপযোগী। ২ বা ৩ বার লাঙ্গল চালাইয়া এবং একর প্রতি ১০ হইতে ১৫ গাড়ী গোবরসার বা কম্পোস্ট প্রয়োগ করিয়া জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং ৩ ফুট দূরে দূরে সারি করিবা ভেলী প্রস্তুত করিতে হয়। পুরাতন ঝাড় হইতে উদ্ভূত শিশুশাখা বা বিয়ান মাতৃউদ্ভিদ হইতে পৃথক করিয়া ভেলীতে রোপণ করিতে হয়। গাছের উত্তম বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত সপ্তাহে একবার এবং অতঃপর দুই সপ্তাহ অন্তর অন্তর সেচ প্রয়োগ করিতে হয়। রোপণের তিন মাস পরে প্রথমবার ঘাস কাটিতে হয়। অতঃপর ছয় হইতে আট সপ্তাহ পর পর ঘাস কাটিতে হয়। উচ্চ ফলন পাইতে হইলে প্রতি বৎসর গাছের ঝাড়-গুলি পাতলা করিয়া দিতে হয়। এক একর জমি হইতে বৎসরে ৩০,০০০ হইতে ৬০,০০০ পাউণ্ড কাঁচা গিনি ঘাস পাওয়া যাইতে পারে। শহরের

নর্দমার জল সেচ করিয়া চাষ করিলে ফলন আরও অনেক বেশী পাওয়া যায়। ফুল আসিবার পুর্বে কাটা কাঁচা গিনি ঘাস গরুর অতি প্রিয় খাদ্য। বয়স বাড়িলে এই ঘাস শক্ত হইয়া যায় এবং গরু পছন্দ করে না।

প্যারা ঘাস

(*Brachiaria mutica*)

সেচযুক্ত ঘাসের মধ্যে প্যারা ঘাস অন্যান্য ঘাস অপেক্ষা অধিকতর প্লাবন সহ্য করিতে পারে। জমি তৈয়ারি করিবার পদ্ধতি গিনি ঘাসের মত, অবশ্য ভেলীগুলি দুই ফুট অন্তর অন্তর তৈয়ারি করিতে হয়। বৎসরে আট বা ততোধিকবার ঘাস কাটিতে হয় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় এক একর জমি হইতে ৬০,০০০ হইতে ৮০,০০০ পাউণ্ড কাঁচা ঘাস পাওয়া যায়। শুষ্ক ঋতুতে দুই সপ্তাহ অন্তর সেচ প্রয়োগ করিতে হয়।

বোম্বাই-এর নিকটে অবস্থিত আরে দুগ্ধ উপনিবেশে গোশালা ধৌত জল সেচ করিয়া একর প্রতি ১০০,০০০ হইতে ১৫০,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত কাঁচা ঘাস পাওয়া গিয়াছে। শহরের নর্দমার জল সেচ করিয়াও অনুরূপ উচ্চ ফলন পাওয়া গিয়াছে। বয়স বেশী হইলে ঘাস শক্ত হইয়া যায় এবং গরু অপছন্দ করে।

ন্যাপিয়ার ঘাস

(*Pennisetum pupurelum*)

ন্যাপিয়ার ঘাসের চাষ পদ্ধতিও গিনি ঘাস ও প্যারা ঘাসের ন্যায়। ইহা ১০ হইতে ১২ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। একর প্রতি বৎসরে ৬০,০০০ হইতে ৮০,০০০ পাউণ্ড ঘাস উৎপন্ন হয়। বয়স বেশী হইলে এই ঘাস শক্ত হইয়া যায় এবং অল্প বয়স্ক কোমল ঘাসই গো-মহিষ পছন্দ করে। (৯২ নং চিত্র)

সুদান ঘাস

(*Sorghum vulgare*, variety *sudanense*)

সুদান ঘাস জোয়ারের অতি নিকট-আত্মীয় এবং কেবল পশুখাদ্যের জন্য চাষ করা হয়। অতি উর্বর ও উত্তম নিকাশন ব্যবস্থাযুক্ত এঁটেল ও দোআঁশ
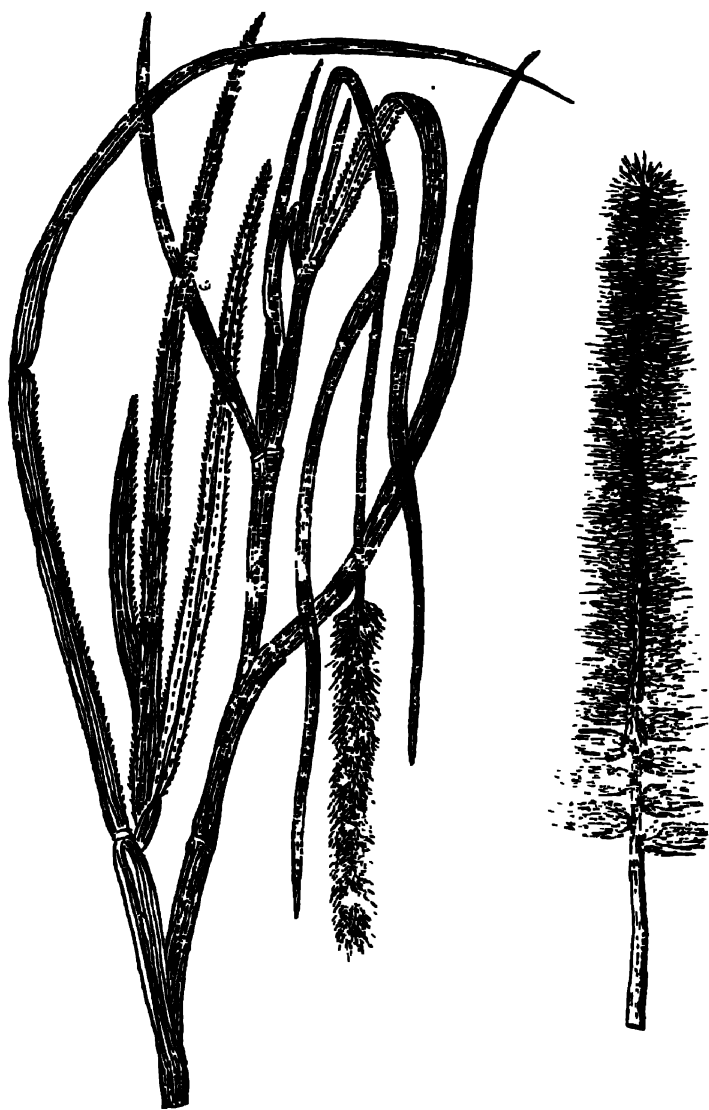
চিত্র নং ৯২। স্তাপিয়ার ঘাস। সেচযুক্ত অঞ্চলে চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী

[*USDA Year-Book, 1948* হইতে পুনরঙ্কিত]।

চিত্র নং ১৩। সুদান ঘাস। উর্বর ও উত্তম নিকাশন ব্যবস্থাযুক্ত জমির পক্ষে বিশেষ উপযোগী
[*USDA Year.Book 1948* হইতে পুনরঙ্কিত]।

মাটিতেই ইহা ভাল জন্মায়। ইহা বীজ হইতে জন্মায়। পর্যাপ্ত সেচ ও সার প্রয়োগ করিলে বৎসরে একর প্রতি ৫০,০০০ হইতে ৬০,০০০ পাউণ্ড কাঁচা ঘাস পাওয়া যাইতে পারে। ইহার কাণ্ড কোমল থাকা অবস্থায় কাটিয়া পশুকে খাওয়াইতে হয়; বয়স বেশী হইলে ইহা শক্ত হইয়া যায় এবং পশু পছন্দ করে না (৯৩ নং চিত্র)।

অঞ্জন

(*Cenchrus ciliaris*)

মাদ্রাজ রাজ্যের কোয়েম্বাটুর জেলার স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত মোটা লাল মাটিতে অঞ্জনের চাষ হয়। উত্তর ভারতের পলি মাটিতে যে অঞ্জনের চাষ হয় তাহাও একই গোষ্ঠীভুক্ত এবং সুপ্রসিদ্ধ হারিয়ানা প্রজাতির ইহা প্রধান খাদ্য।

সেচ প্রয়োগে ইহার চাষ করিলে বীজতলায় চারা তৈয়ারি করা হয় এবং ১৮ হইতে ২৪ ইঞ্চি দূরে দূরে ভেলীতে ১২ ইঞ্চি অন্তর রোপণ করিতে হয়। এই ঘাসের কাণ্ড সরু ও কোমল এবং গরু খুব পছন্দ করে। সেচ প্রয়োগে যথাযথভাবে চাষ করিলে বৎসরে একর প্রতি ১০০,০০০ পাউণ্ড কাঁচা ঘাস পাওয়া যায়। এ ঘাস খুবই পুষ্টিকর ও পশুর পক্ষে সুস্বাদু।

সেচযুক্ত শিম্বিগোত্রীয় ফসল

লুসার্ন (lucerne), বারসিম (berseem), পারসিয়ান ক্লোভার (Persian clover), হোয়াইট ক্লোভার (white clover), গুয়ার (guar) ও কুলতি কলাই (horse gram) প্রভৃতি উন্নত সেচযুক্ত শিম্বিগোত্রীয় ফসলও উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য।

লুসার্ন

(*Medicago sativa*)

লুসার্ন পৃথিবীর যে কোন পশুখাদ্য ফসল অপেক্ষা পুষ্টিকর। ইহা বহুবর্ষজীবী। ইহার মূল মাটির ভিতরে বহুদূর প্রবেশ করে। ইহার কাণ্ড কোমল, প্রচুর শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয় এবং ইহা পত্রবহুল (৯৪ নং চিত্র)। দ্রুত অঙ্কুরোদ্গমের জন্য বীজ আঁচড়াইয়া বপন করা উচিত।
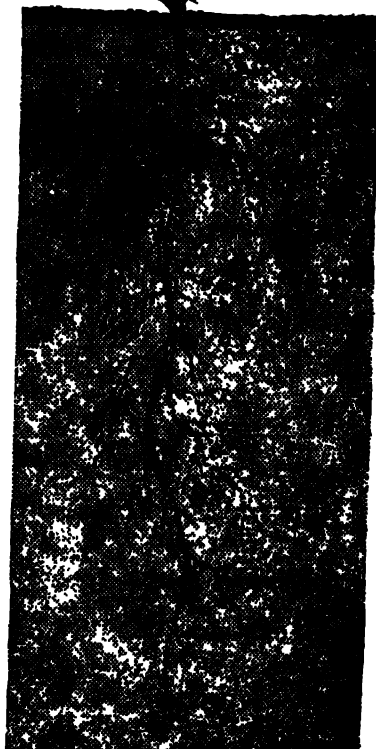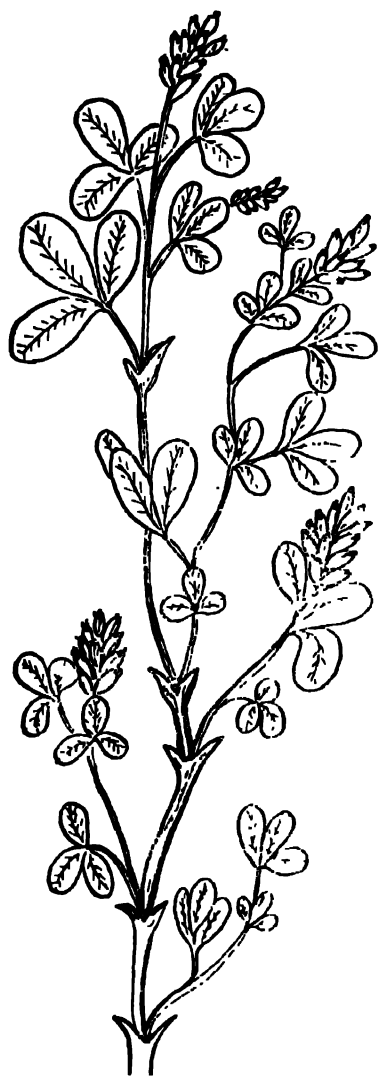
চিত্র নং ৯৪। লুসার্ন পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট পশু খাদ্য।

বামে: পুষ্প মুকুল ও পত্র সহ শাখা। ডাইনে: মূল ও কাণ্ড সহ সম্পূর্ণ লুসার্ন উদ্ভিদ। মূলে যে ছোট ছোট অঙ্কুর দেখা যাইতেছে তাহাতে নাইট্রোজেন বর্দ্ধনকারী ব্যাকটিরিয়া থাকে।

[EVANS হইতে পুনরঙ্কিত।]

লুসার্ন ৩২° ফা. হইতে ১১৫° ফা. পর্যন্ত বিভিন্ন তাপমাত্রা সহ্য করিতে পারে এবং বিভিন্ন মাটিতে জন্মায়। তবে উত্তম জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা যুক্ত গভীর দোয়াঁশ মাটি সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা ছড়াইয়া বপন করা যায়, কিন্তু সেচ প্রয়োগে চাষ করিলে সারিতে ভেলী করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। উত্তর ভারতে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে একর প্রতি ১০ পাউণ্ড বীজ বপন করা হয়। বপনের অব্যবহিত পরেই প্রথম সেচ প্রয়োগ করা হয় এবং অতঃপর ১৫ হইতে ২০ দিন পর পর সেচ প্রয়োগ করা দরকার। শীতকালে আরও বেশী দিন অন্তর সেচ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বপনের তিন মাস পরে প্রথম ফসল কাটা যায়; অতঃপর সেচ ও সার প্রয়োগ অনুসারে এক মাস অন্তরও ফসল কাটা যায়। পশুকে টাটকা খাওয়াইতে হইলে ফুল আসিবার সময় ফসল কাটিতে হয়। শুকাইয়া রাখিলে ইহা অতি উত্তম শুষ্ক পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বৎসরে একর প্রতি ২০,০০০ হইতে ৩০,০০০ পাউণ্ড প্রোটিন সমৃদ্ধ কাঁচা পশুখাদ্য পাওয়া যায়।

বারসিম

(*Trifolium alexandrinm*)

ইহা বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহাও সেচ ও সার প্রয়োগে চাষ করা হয় এবং লুসার্ণের ন্যায় উচ্চ ফলন পাওয়া যায়। বারসিম আর্দ্র ও ক্ষারধর্মী মাটি সহ্য করিতে পারে। একর প্রতি ১৫ হইতে ২০ পাউণ্ড বীজ লাগে। ভূমি সংরক্ষণে ইহা মাটি ধরিয়া রাখিতে সক্ষম এবং একই সঙ্গে উৎকৃষ্ট পশুখাদ্যও বটে। ধানের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে বারসিমের চাষ করা যায়।

পারসিয়ান ক্লোভার

(*Trifolium resupinatum*)

ইহা অনেকটা বারসিমের ন্যায়, তবে ইহার কাণ্ড ফাঁপা, ফলে ইহা পড়িয়া যাইবার আশংকা থাকে।

হোয়াইট ক্লোভার

(*Melilotus alba*)

পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে ইহার চাষ হয়।

গুয়ার

(*Cyamopsis psoraloides*)

গুজরাট, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে ইহার চাষ হয়।

কুলত্তি কলাই

(*Dolichos biflorus*)

উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত উভয় অংশেই ইহার চাষ হয়। একর প্রতি ২৫ পাউণ্ড বীজ ঘন করিয়া বপন করা হয়। বপনের ৩০ হইতে ৪৫ দিন পরে পশুর জন্য ফসল কাটা যায়। ইহার বীজও প্রোটিন সমৃদ্ধ সারবান খাদ্য হিসাবে পশুকে খাওয়ানো হয়।

গোচারণভূমি

উপকারী গরু ও মহিষ যেমন কর্মঠ বলদ ও দুগ্ধবতী গাভীকে সাধারণত গোশালাতেই খাওয়ানো হয়। কিন্তু অন্যান্য গরু ও মহিষ, ছাগল ও ভেড়া সাধারণত গোচারণভূমি ও জঙ্গলের ঘাস, আগাছা বা গাছের পাতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। আমাদের দেশে শেষোক্ত শ্রেণীর পশুর সংখ্যাই বেশী।

কিন্তু এদেশে গোচারণভূমির যথাযথ যত্ন লওয়া হয় না। যে সকল জমি বা বনে ফসল ফলাইবার কোন সম্ভাবনা নাই এবং সামান্য ঘাস মাত্র জন্মায়, সে সকল জমি বা বনকেই সাধারণত গোচারণভূমি হিসাবে গণ্য করা হয়। এগুলি সাধারণত সামান্য উদ্ভিজ্জ আবরণযুক্ত পতিত জমি। যেখানে মোটামুটি আবরণ আছে সে আবরণও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট শক্ত ঘাস ও বিস্বাদু গুল্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানুষই গোচারণভূমির এই অবনতির কারণ। অত্যধিক সংখ্যক পশু চারণ এবং অতীতকালে দীর্ঘকাল ধরিয়া ধারাবাহিকভাবে চারণের ফলে গোচারণভূমিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। গৃহপালিত পশুর উন্নয়ন করিতে হইলে পশুর মালিককে গোচারণভূমি রক্ষা ও উন্নয়নের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে (৯৫ নং চিত্র)।

আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট প্রজাতিগুলির জন্য চারণভূমির ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সকল গোচারণভূমি আছে সেগুলিকে যথাযথ পরিচালনায় উন্নত করা যায়। অবশ্য অত্যধিক সংখ্যক পশু চড়াইলে কিছুতেই গোচারণভূমিকে উন্নত করা যাইবে না। অর্থাৎ অনুপযোগী ও নিকৃষ্ট পশুর জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। যথাযথ পরিচালনায় বর্তমানে যে সকল গোচারণভূমি আছে সেগুলিকে আমাদের উন্নত পশুগুলির উপযোগী চারণভূমিতে পরিণত করা যায়। অনেক চারণভূমি অতিরিক্ত গোচারণহেতু এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে সেগুলিতে পুনরায় উৎকৃষ্ট ঘাসের চাষ করিতে হইবে।

ভারতের গোচারণভূমিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; উপকূল অঞ্চলের গোচারণভূমি, সমতলভূমির গোচারণভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলের গোচারণভূমি।

উপকূল অঞ্চলের গোচারণভূমি

উপকূল অঞ্চলে বৎসরে কয়েক মাস প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এ সময় ঘাস দ্রুত বাড়ে এবং প্রচুর সরস ঘাসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঐ সময় জমিতে অত্যধিক জল দাঁড়াইয়া থাকে বলিয়া গরু চরিতে পারে না বা মানুষ ঘাস কাটিতে পারে না। বৃষ্টি যখন থামে তখন ঘাস মোটা ও লম্বা হয় এবং পাকিয়া যায়। এই ঘাস কাটিয়া নিকৃষ্ট শুষ্ক ঘাস হিসাবে সংরক্ষণ করা যায়।

সমতলভূমির গোচারণভূমি

সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে কয়েকশত ফুট হইতে কয়েক হাজার ফুট পর্যন্ত উচ্চভূমিতে স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে সমতলভূমির গোচারণভূমিগুলি অবস্থিত। ২৫ হইতে
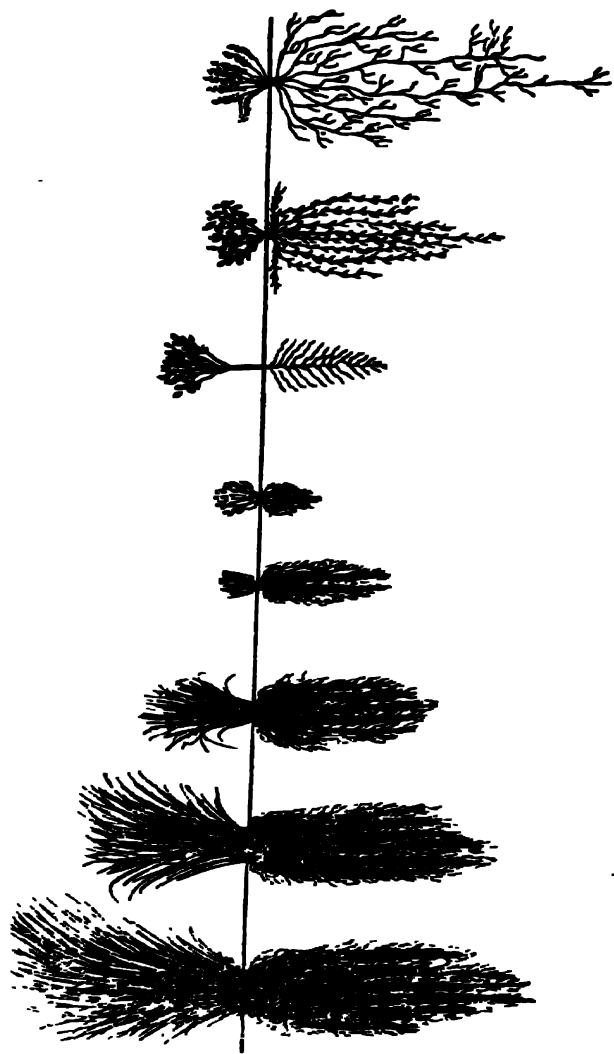
চিত্র নং ১৫। যে জমিতে পূর্বে লম্বা ঘাস জন্মাইত অতিরিক্ত গোচারণের ফলে সে জমিতে এখন ছোট ঘাস, আগাছা ও গুল্ম ছাড়া আর কিছু জন্মায় না] [ARAKERI মহাশয়ের পুস্তক হইতে পুনরঙ্কিত।]

৪০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ঘাসের আশানুরূপ বৃদ্ধি হয়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় এ সকল অঞ্চল হইতে প্রচুর ঘাস পাওয়া যাইতে পারে।

স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলের অনেক গোচারণভূমি বহু বৎসর ধরিয়া অত্যধিক গোচারণের ফলে এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে ভূমির উদ্ভিজ্জ আবরণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কেবল কিছু নিকৃষ্ট ঘাস মাত্র রহিয়াছে। অত্যধিক গোচারণহেতু এ সকল অঞ্চলে ভূমিক্ষয় ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ গোচারণভূমি এ শ্রেণীর অন্তর্গত।

পার্বত্য অঞ্চলের গোচারণভূমি

উত্তর ভারতে হিমালয়ের পাদদেশে এক প্রকার গোচারণভূমি দেখা যায়। গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতির ভ্রমণশীল দল যাহারা শীতকালে উচ্চভূমি হইতে নিম্ন অঞ্চলে নামিয়া আসে এবং গ্রীষ্মকালে পুনরায় উচ্চভূমিতে ফিরিয়া যায় তাহারাই ঐ সকল গোচারণভূমিতে চড়িয়া থাকে। পশুর দলের যাতায়াতের পথে গোচারণভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভূমিক্ষয়ের কবলে পড়ে।

গোচারণভূমি ব্যবস্থাপনা

গোচারণভূমিকে উত্তম অবস্থায় রাখিতে হইলে ভূমির ঘাস উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে গোচারণ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

গোচারণভূমিতে বৎসরে কয়েক মাস মাত্র গোচারণ চলিতে দেওয়া যায়; সেহেতু অবিচ্ছিন্নভাবে গোচারণ গোচারণভূমির উদ্ভিজ্জ আবরণ বজায় রাখার পরিপন্থী। গোচারণভূমিতে পর্যায়ক্রমে গোচারণ ও ইহাকে বিশ্রাম দিতে হইবে। যে সময় ঘাস বাড়ে ও বীজ ধারণ করে সে সময়েই গোচারণ-ভূমিকে বিশ্রাম দিতে হইবে। গোচারণভূমিকে বিশ্রাম দিলে, উৎপন্ন ঘাসের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

আমাদের দেশের গোচারণ ভূমির উর্বরতা বজায় বা পুনরুদ্ধার করিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি সুপারিশ করা হইতেছে হয়।

কেবল ঘাস কাটিবার জন্য

জঙ্গল বা ব্যক্তিগত মালিকানায় এ সকল গোচারণভূমিতে কখনও গরু চরিতে দেওয়া হয় না। কেবল ঘাস কাটিতে দেওয়া হয়।

ঘাস কাটিবার পর গোচারণ

অনেক অঞ্চলে ঘাস কাটিয়া লইয়া যাইবার পর পুনরায় যে ঘাস বৃদ্ধি পায় তাহাতে গোচারণ করিতে দেওয়া হয়।

পর্যায়ক্রমে গোচারণ

পর্যায়ক্রম গোচারণে ভূমির একটি অংশে গোচারণ করিতে দেওয়া হয় এবং অন্যান্য অংশকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। এই ভাবে সুবিধাজনকভাবে গোচারণ ভূমিকে কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করা হয়। একটি খণ্ড স্বাভাবিকভাবে বীজ ধারণের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় এবং এজন্য ঘাস না পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়। বীজ স্বাভাবিকভাবে মাটিতে ঝরিয়া পড়িবার পর ঘাস শুষ্ক করিয়া সংরক্ষণের জন্য কাটা হয় বা গোচারণ করিতে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে ঘাস পাকিবার পর শুষ্ক করিয়া সংরক্ষণের জন্য কাটা হয়। তৃতীয় খণ্ডে সীমিত সংখ্যক গো মহিষ চরিতে দেওয়া হয়। এই খণ্ডে গোচারণ যথাযথ সম্পূর্ণ হইলে পশুগুলিকে অন্য একটি খণ্ডে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই খণ্ডকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য ঘাসের উত্তম বৃদ্ধি হয়। গোচারণ ভূমির সকল খণ্ডগুলি যাহাতে একে একে সকল প্রকার ব্যবস্থার সম্মুখীন হয় সেজন্য বীজ ধারণ, শুষ্ক ঘাস বা গোচারণের জন্য সংরক্ষিত খণ্ডগুলিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়।

গোচারণভূমিকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করিবার জন্য সাধারণত কোন প্রাকৃতিক গঠন অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণ করা হয় অথবা কোন সজীব বেড়া যেমন সিসাল বা ঐ জাতীয় উদ্ভিদের সাহায্যে বেড়া বা কাটা তারের বেড়া দিয়া সীমানা চিহ্নিত করা হয়।

সমতলভূমিতে বর্ষা আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহ পর হইতেই গোচারণ শুরু

করা চলে। উপরোক্ত সময়ের মধ্যেই ঘাসের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি হয় এবং গোচারণে কোন ক্ষতি হয় না। গ্রীষ্ম কাল সুরু হওয়া পর্যন্ত গোচারণ চলিতে পারে। গ্রীষ্মকালে গোচারণ বন্ধ করিতে হইবে এবং অপর একটি খণ্ড হইতে কাটিয়া আনা তাজা বা শুষ্ক ঘাস পশুকে খাওয়াইতে হইবে।

গোচারণ ভূমিতে সমভাবে গোচারণে উৎসাহ দেওয়াব জন্য ছায়া বৃক্ষ, লবণের পাত্র ও পানীয় জল এমন ভাবে ছড়াইয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে গরু গোচারণভূমির সর্বত্র বিচরণ করে এবং সমভাবে ঘাস খায়। লবণ ও জল এক সঙ্গে দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

সংক্ষিপ্তসার

সাধারণ ফসল, সেচযুক্ত ঘাস, সেচযুক্ত শিম্বিগোত্রীয় ফসল ও সাধারণ ঘাসই হইল প্রধান পশুখাদ্য। মানুষের খাদ্য হিসাবে উৎপন্ন শস্যের উপজাত খড় পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শুষ্ক পশুখাদ্যের একটি বৃহৎ অংশ যদিও খড়, কিন্তু ইহা তেমন পুষ্টিকর নয়।

গিনি ঘাস, প্যারাঘাস, ন্যাপিয়ারঘাস ও সুদানঘাস সেচ প্রয়োগে চাষ করিবার উপযোগী। গোশালা ধৌত জল বা শহরের নর্দমার জল সেচ করিলে এ সকল ঘাসের উচ্চ ফলন পাওয়া যায়। রাসায়নিক সার প্রয়োগেও ভাল ফলন পাওয়া যায়। অঞ্জন ঘাস সেচ প্রয়োগে অথবা বিনা সেচে, উভয় প্রকারে চাষ করা যায়।

লুসার্ণ, বারসিম ক্লোভার, পারসিয়ান ক্লোভার, গুয়ার, কুলতি কলাই প্রভৃতি শিম্বিগোত্রীয় ফসল চাষ করিয়া উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর পশুখাদ্য পাওয়া যায়। লুসার্ণ বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী হিসাবে চাষ করা যায়; অন্যান্য শিম্বিগোত্রীয় ফসল বর্ষজীবী হিসাবে চাষ করা হয়। সার প্রয়োগে ইহাদের ফলন প্রচুর বৃদ্ধি পায়।

যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে আমাদের দেশের অধিকাংশ গোচারণভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত সংখ্যক পশুচারণ ও ধারাবাহিক ভাবে গোচারণই ইহার কারণ।

গোচারণভূমির ঘাস উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে পশু সংখ্যা সীমিত করিয়া,

সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গোচারণ বন্ধ করিয়া এবং পর্যায়ক্রমে গোচারণের ব্যবস্থা করিয়া যথাযথ পরিচালনায় গোচারণভূমিগুলিকে উদ্ধার করা যায়।

প্রশ্নাবলী

(১) প্রধান প্রধান সেচযুক্ত ঘাস ও শিম্বিগোত্রীয় পশুখাদ্য ফসলগুলির নাম লেখ।

(২) গোচারণভূমিগুলিকে ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার ? ঐ সকল ব্যবস্থা অবলম্বনে কি ফল হইবে ?

(৩) পর্যায়ক্রমে গোচারণ কি এবং কি ভাবে ইহা করা যায় ?

(৪) কিভাবে সমভাবে গোচারণে উৎসাহ দেওয়া যায় ?

(৫) সজীব বেড়া হিসাবে কি গাছ লাগানো যায় ?

পরিশিষ্ট

পরিবর্তন তালিকা*

দৈর্ঘ্য　　　　দৈর্ঘ্যের একক

বৃটিশ একক	মেট্রিক একক	
১২ ইঞ্চি = ১ ফুট	১০ মিলিমিটার (মি.মি.)	= ১ সেন্টিমিটার (সে.মি.)
৩ ফুট = ১ গজ	১০ সেন্টিমিটার	= ১ ডেসিমিটার
২২০ গজ = ১ ফার্লং	১০ ডেসিমিটার	= ১ মিটার
৮ ফার্লং = ১ মাইল	(১ মি. = ১০০ সে.মি. = ১০০০ মি.মি.)	
	১০ মিটার	= ১ ডেকামিটার
	১০ ডেকামিটার	= ১ হেক্টোমিটার
	১০ হেক্টোমিটার	= ১ কিলোমিটার (কি.মি.)
		(১ কি.মি. = ১০০০ মি.)

পরিবর্তন তালিকা

১ ইঞ্চি	=	২৫·৪ মিলিমিটার
১ ফুট	=	৩০·৪৮ সেন্টিমিটার
১ গজ	=	০·৯১৪৪ মিটার
১ মাইল	=	১·৬০৯৩৪৪ কিলোমিটার
১ সেন্টিমিটার	=	০·৩৯৩৭০১ ইঞ্চি
১ মিটার	=	১·০৯৩৬১ গজ
১ কিলোমিটার	=	০·৬২১৩৭ মাইল

*Indian Standard Conversion Tables for Ordinary Use, IS : 1020—June, 1957. Indian Standards Institution, 19, University Road, Civil Lines, New Delhi : এই পুস্তক হইতে গৃহীত।

আয়তন — আয়তনের একক

বৃটিশ একক		মেট্রিক একক
১৪৪ বর্গ ইঞ্চি	= ১ বর্গ ফুট	১০০ বর্গ মিলিমিটার (বর্গ মি.মি.) = ১ বর্গ সেন্টিমিটার (বর্গ সে. মি.)
৯ বর্গ ফুট	= ১ বর্গ গজ	১০০ বর্গ সেন্টিমিটার = ১ বর্গ ডেসিমিটার
৪৮৪০ বর্গ গজ	= ১ একর	১০০ বর্গ ডেসিমিটার = ১ বর্গ মিটার (১ বর্গ মি. = ১০০০০ বর্গ সে.মি.)
৬৪০ একর	= ১ বর্গ মাইল	১০০ বর্গ মিটার = ১ এয়ার (are) বা ১ বর্গ ডেকামিটার
		১০০ এয়ার = ১ হেক্টেয়ার বা ১ বর্গ হেক্টোমিটার
		১০০ হেক্টেয়ার = ১ বর্গ কিলোমিটার

পরিবর্তন তালিকা

১ বর্গ ইঞ্চি	= ৬.৪৫১৬ বর্গ সেন্টিমিটার (সঠিক)
১ বর্গ ফুট	= ৯.২৯০৩ বর্গ ডেসিমিটার
১ বর্গ গজ	= ০.৮৩৬১৩ বর্গ মিটার
১ একর	= ০.৪০৪৬৮৬ হেক্টেয়ার
১ বর্গ মাইল	= ২.৫৮৯৯৯ বর্গ কিলোমিটার
১ বর্গ সেন্টিমিটার	= ০.১৫৫০০০ বর্গ ইঞ্চি
১ বর্গ মিটার	= ১.১৯৫৯৯ বর্গ গজ
১ হেক্টেয়ার	= ২.৪৭১০৫ একর
১ বর্গ কিলোমিটার	= ০.৩৮৬১০১ বর্গ মাইল

ওজন — ওজনের একক

বৃটিশ একক		মেট্রিক একক	
১৬ ড্রাম	= ১ আউন্স	১০ মিলিগ্রাম (মি. গ্রা.)	= ১ সেণ্টিগ্রাম
১৬ আউন্স	= ১ পাউণ্ড	১০ সেণ্টিগ্রাম	= ১ ডেসিগ্রাম
২৮ পাউণ্ড	= ১ কোয়ার্টার	১০ ডেসিগ্রাম	= ১ গ্রাম
			(১ গ্রা. = ১০০০ মি. গ্রা.)
৪ কোয়ার্টার	= ১ হন্দর	১০ গ্রাম	= ১ ডেকাগ্রাম
২০ হন্দর	= ১ টন	১০ ডেকাগ্রাম	= ১ হেক্টোগ্রাম
		১০ হেক্টোগ্রাম	= ১ কিলোগ্রাম
ভারতীয় একক			(১ কেজি = ১০০০ গ্রা)
৮০ তোলা	= ১ সের	১০ কিলোগ্রাম	= ১ মাইরিওগ্রাম
৪০ সের	= ১ মণ	১০ মাইরিওগ্রাম	= ১ কুইন্টাল
		১০ কুইন্টাল	= ১ মেট্রিক টন
			(১ মে. টন = ১০০০ কেজি)

পরিবর্তন তালিকা

১ গ্রাম = ০·০৩৫২৭৪০ আউন্স = ০·০৮৫৭৩৫ তোলা

১ কিলোগ্রাম = ২·২০৪৬২ পাউণ্ড = ১·০৭১৬৯ সের

১ মেট্রিক টন = ০·৯৮৪২০ টন = ২৬·৭৯২৩ মণ

১ আউন্স	= ২৮·৩৪৯৫ গ্রাম	১ তোলা	= ১১·৬৬৩৮ গ্রাম
১ পাউণ্ড	= ০·৪৫৩৫৯২৪ কিলোগ্রাম	১ সের	= ০·৯৩৩১০ কিলোগ্রাম
১ টন	= ১·০১৬০৫ মেট্রিক টন	১ মণ	= ০·৩৭৩২৪২ কুইন্টাল

৯ পাউণ্ড = ৩৫০ তোলা (সঠিক)

পরিমাণ

পরিমাণের একক

বৃটিশ একক		মেট্রিক একক	
৪ জিল্ (gill)	=১ পাইট	১০ মিলিলিটার (মি.লি.)	=১ সেন্টিলিটার
২ পাইট	=১ কোয়ার্ট (quart)	১০ সেন্টিলিটার	=১ ডেসিলিটার
		১০ ডেসিলিটার	=১ লিটার
৪ কোয়ার্ট	=১ গ্যালন (ইম্পিরিয়েল)		=১০০০ মি.লি.
		১০ লিটার	=১ ডেকালিটার
		১০ ডেকালিটার	=১ হেক্টোলিটার
		১০ হেক্টোলিটার	=১ কিলোলিটার

পরিবর্তন তালিকা

১ পাইট	=০.৫৬৮২৪ লিটার
১ কোয়ার্ট	=১.১৩৬৪৯ লিটার
১ গ্যালন (ইম্পিরিয়েল)	=৪.৫৪৫৯৬ লিটার
১ লিটার	=১.৭৫৯৮০ পাইট
১ লিটার	=৮.৮৭৯৯০ কোয়ার্ট
১ লিটার	=০.২১৯৯৭৬ গ্যালন (ইম্পিরিয়েল)

মন্তব্য—বৃটিশ ইম্পিরিয়েল গ্যালন ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে স্বীকৃত গ্যালনও ভারতে ব্যবহৃত হয়। গ্যালন (যুক্তরাষ্ট্র) হইতে লিটার ও ইম্পিরিয়েল গ্যালনের পরিবর্তন তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১ গ্যালন (যুক্তরাষ্ট্র)	=৩.৭৮৫৩৩ লিটার
	=০.৮৩২৬৮ গ্যালন (ইম্পিরিয়েল)

থার্মোমিটারের মাপ

ফারেনহাইট ডিগ্রি হইতে সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রিতে পরিবর্তন*

ফারেনহাইট	সেণ্টিগ্রেড
১	- ১৭'২
২	— ১৬'৭
৩	— ১৬'১
৪	— ১৫'৬
৫	— ১৫'০
৬	— ১৪'৪
৭	— ১৩'৯
৮	— ১৩'৩
৯	-- ১২'৮
১০	— ১২'২
২০	- ৬'৭
৩০	— ১'১
৪০	+ ৪'৪
৫০	+ ১০ ০
৬০	+ ১৫'৬
৭০	+ ২১'১
৮০	+ ২৬ ৭
৯০	+ ৩২'২
১০০	+ ৩৭ ৮
২০০	+ ৯৩'৩
৩০০	+ ১৪৮'৯
৪০০	+ ২০৪'৪
	+ ২৬০'০

* ফারেনহাইট ডিগ্রি হইতে সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রিতে পরিবর্তন করিতে হইলে ফারেনহাইট ডিগ্রি হইতে ৩২ বাদ দিয়ে $\frac{5}{9}$ দিয়া গুণ করিতে হইবে। উদাহরণ, °C=$\frac{5}{9}$ (°F — ৩২)। যখন F=৫০, F — ৩২=১৮, $\frac{5}{9}$ × ১৮=১০°C

সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রি হইতে ফারেনহাইট ডিগ্রিতে পরিবর্তন*

সেণ্টিগ্রেড	ফারেনহাইট
০	৩২·০
১	৩৩·৮
২	৩৫·৬
৩	৩৭·৪
৪	৩৯·২
৫	৪১·০
৬	৪২·৮
৭	৪৪·৬
৮	৪৬·৪
৯	৪৮·২
১০	৫০·০
২০	৬৮·০
৩০	৮৬·০
০	১০৪·০
৫০	১২২·০
৬০	১৪০·০
৭০	১৫৮·০
৮০	১৭৬·০
৯০	১৯৪·০
১০০	২১২·০
২০০	৩৯২·০
৩০০	৫৭২·০
৪০০	৭৫২·০
৫০০	৯৩২·০

*সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রি হইতে ফারেনহাইট ডিগ্রিতে পরিবর্তন করিতে হইলে সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রিকে $\frac{৯}{৫}$ দিয়া গুণ করিয়া ৩২ যোগ দিতে হইবে। উদাহরণ,

$°F=\frac{৯}{৫}°C+৩২$। যখন $C=৫০$, $\frac{৯}{৫}\times৫০=৯০+৩২=১২২·০°F$